শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম

ক্ষুদিরাম দাস

সমর্পিত

স্বর্গীয়া পত্নী - শোভনা দাস (কাজল)

সূচীপত্র

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সামাজিক ভিত্তিভূমি	৫
কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রূপ ও স্বরূপ	২৬
দেবমানব শ্রীচৈতন্য	৫৪
রাজনীতি, সমাজ ও শ্রীচৈতন্য	৬১
মহাপ্রভুর বাউল-ব্যক্তিত্ব ও নামপ্রীতি-সংগতি	৬৯
ঐক্য ও সংহতির সাধক শ্রীচৈতন্য	৮২
গৌর-কৃষ্ণ-উপাসনায় নবদ্বীপ-বৃন্দাবন	৮৭
চৈতন্যাবির্ভাবে ও রবীন্দ্রাবির্ভাবে যুগধর্ম প্রসঙ্গ	১০৪

শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি - পুরাতন নবদ্বীপ বা নদীয়া ১১৭

রসশাস্ত্র - বৈষ্ণব ও লৌকিক ১২৯

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সামাজিক ভিত্তিভূমি

গতিশীল মানবসমাজের ইতিবৃত্তে ধর্মীয় সংস্কারের রূপান্তর ঐ সমাজের স্বরূপ অধ্যয়নের অন্যতম উপাদান। এই উপাদান রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের উপাদানের চেয়ে কম বিস্ময়কর নয়, কারণ, মানুষের অন্তর্জীবনের রহস্যই তার ধর্মভাবনার ভিত্তি এবং তার বহিরঙ্গ কর্মপ্রয়াস এবং অন্তরঙ্গ ভাব ও চিন্তা যে পরস্পর-সাপেক্ষ সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ কোথায়? বিবিধ তত্ত্বময়ী প্রকৃতির মুখ্য কার্যই হল রূপান্তর সাধন এবং তার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অংশ জীব বা মানুষ এই পরিবর্তনের নিয়মের সবচেয়ে বেশি বশীভূত।যেমন পাশ্চাত্ত্যে তেমনি প্রাচ্যে দর্শনে ও বিজ্ঞানে মানুষের অভিব্যক্তির এই ইতিবৃত্ত নানাভাবে মনীষীরা উপলব্ধি করেছেন। কৌমর্জীবনের নিসর্গপূজা থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বিশ্ব সত্যবাদ, লীলাবাদ ও মানুষ শ্রেষ্ঠতাবাদ পর্যন্ত ধর্মানুভূতির বিবর্তন মানুষের সামগ্রিক সমাজ বিবর্তনেরই অঙ্গীভূত। বিষয়টি এইভাবে বিবেচনা করলে উন্নত জীবনাচরণ অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে ধর্মাচরণে যারা নিরত হতে চান তাঁদের অবলম্বন যোগ্য মত ও পথ সম্বন্ধে বিতর্ক ও সংশয়ের আবর্তে পড়তে হয় না। প্রগতির ধারায় যা সবচেয়ে আধুনিক তাকে স্বচ্ছন্দে বরণ ক'রে নিলে সুবুদ্ধির প্রকাশ ঘটে। সে যাই হোক, মানুষের সর্ব শেষে ধর্মীয় অনুভব যে প্রগতির সূত্রে আগত শ্রেষ্ঠ অনুভব এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ভারতের পক্ষে এ ধর্মমত কী, এ প্রশ্নের উত্তরে স্বচ্ছন্দে বলা যায় শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত অহেতুক প্রীতিভাব বা মানবীয় রাগানুগাভক্তি অনুভব এরপর এরকম সামগ্রিক ও বৈপ্লবিক নূতন অনুভব আর জন্মায়নি। এই ধর্মানুভতির বিস্তাররূপে এক বিশেষ ধরনের মানব ধর্ম হয়ত ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠালাভ করবে মনে হয়, কিন্তু এর আরও কিছু দূর ভবিষ্যতে কথা। তবে আধুনিক মানুষ সাম্যবাদ এর পটভূমি নির্মান করছে এমন বলা যেতে পারে।

একদা উত্তরভারত যঞ্জ নামে এক ধরনের সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আবর্তে আন্দোলিত হয়েছিল। প্রচলিত ভাবাদশের সঙ্গে ক্রমে আর্যীকৃত অনার্যেরাও স্বধর্ম ত্যাগ

করে, নিজেদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বর্জন করে, জটিল কর্মকান্ড ও বহু দেবতার উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তখন হোতা উদগাতা অধ্বর্যু প্রভৃতি যঞ্জকারক ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের কাল। কালক্রমে এই ধর্ম আনুষ্ঠানিক অন্তঃসারশূন্য, নিষ্ঠুর এবং স্বার্থ পরিপোষক হয়ে পড়লে এর প্রতিবাদ সঞ্চিত হ'তে হ'তে ভগবান্ বুদ্ধের নবধর্ম উপলব্ধি ও প্রচারে ব্রাহ্মণ্য দর্পের সঙ্গে অসার অনুষ্ঠানের কোলাহল নিতান্ত স্তিমিত হয়ে পড়ল। বুদ্ধের সময়ে যদ্যপি ব্রহ্ম-উপলব্ধি বা ঈশ্বর-অনুভব নিয়ে বিবিধ বিতর্ক ভারতের নানা স্থানে প্রবল হয়ে উঠেছিল (উপনিষদ তুলনীয়), তিনি মুখ্যতঃ চারিত্র্যের উপরেই ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করলেন, তা ছাড়া অতিশয় ব্যাপক ও নিতান্ত সহজ লোকধর্মস্থাপনের আর কোনও উপায় ছিল না। হিসেব করে দেখলে বলা যায়, ব্রাহ্মন্যধর্ম মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় বিশেষের ভোগ ও প্রতাপের ধর্ম ছিল, ব্রহ্ম-বিতর্কও তেমনি কতিপয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই ছিল সীমিত। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। ভগবান বুদ্ধের লক্ষ্য ছিল মহাজনতা। তিনি সাধারণ মানুষকে তাদের অবশ্যম্ভাবী দুঃখভোগ বিষয়ে অবহিত ক'রে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবার সহজ উপায় দেখিয়ে দিলেন।তাঁর ত্যাগ এবং করুণার কার্যাবলী এবং তাঁর আকর্ষনীয় ধর্মদেশনার পদ্ধতি ব্রাহ্মণেতর জনসমাজে বিমূঢ় চেতনার দ্রুত উর্জ্জীবন ঘটিয়েছিল। মুষ্ঠিপ্রমাণ পৌরোহিত্য শক্তির অমিত তেজ নূতন জন-জাগরণের মুখে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। বুদ্ধদেব অসাধ্য সাধন করেছিলেন, যে সামগ্রিক পরিবর্তন সম্ভব করেছিলেন তা মহাবৈপ্লবিক একথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে।পরিবর্তন ঘটেছিল শুধু ধর্মাচরনেই নয়, রাষ্ট্রনীতিক ও সামাজিক ব্যবহার, শিল্পে সাহিত্যে,সমগ্র জীবনচর্যায়।ভগবান্ বুদ্ধ ধর্মাচারণকে জীবনের অঙ্গীভূত করে দিয়েছিলেন। উপনিষদের দার্শনিকেরা তা পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ।এই লোকধর্ম অন্ততঃ হাজার বছর ধরে ভারতের জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল এবং তারপর তত্ত্বচিন্তা শক্তিসাধনা ও তান্ত্রিকতার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়ে মূল ভারতভূখন্ড থেকে প্রায় নির্বাসিত হলেও ভারতীয় লোকচরিত্রে মৃদুতা ও সহিষ্ণুতার একটি স্বায়ী প্রভাব রেখে গেছে। ভারতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিলোপ সম্বন্ধে নানা কারণ অনুমিত হয়ে থাকে। বলা হয়, বেদবিহিত কর্মকান্ডের এবং উপনিষদ্-বাহিত জ্ঞান কান্ডের নূতন ক'রে অভ্যুত্থান ঘটায় এরকম হয়েছিল এবং পূর্বমীমাংসক কুমারিল ও উত্তরমীমাংসক শংকর যুক্তিদ্ধারা বৌদ্ধ মতবাদ খন্ডন করাতেই বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এ খুব সমাদরযোগ্য কথা নয়। বরং একথাই মনে করা ঠিক যে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই এই মানবধর্মের বিনাশ ঘটে। মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্দ্রিক বৈভাষিক প্রভৃতি মতবাদের কূটতর্কে নিপতিত হয়ে ঐ ধর্ম যখন দর্শন মাত্র সম্বল হয়ে পড়ল এবং সহজ লোকধর্মের যোগ্য রইল না তখনই এর ধর্মীয়তা লোপ পেলে।নতুবা কুমারিল যজ্ঞাদি কর্মের পুনঃ প্রবর্তন করতে পারেননি এবং শংকরের নির্বিশেষ জ্ঞান আর মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের শূন্যতা স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ তত্ত্বের দিক থেকে বৌদ্ধ বিরোধী নয়। জনসমাজ থেকে বৌদ্ধধর্মের

ক্রমশঃ বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিকতা এবং নারীশক্তির আরাধনা দেশে পরিব্যাপ্ত হ'ল। মন্ত্রসমন্বিত নিগূঢ় ক্রিয়াকলাপ বৈদিক যুগ থেকেই কোনো কোনো সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। এ নিঃসন্দেহে আর্যদের অনার্য জীবন সংসর্গের পরিণাম। তন্ত্রগত শিব এবং শক্তির অনুসন্ধানের আগ্রহও মূলতঃ যজ্ঞকর্মপ্রবণ আর্যদের নয়। বৌদ্ধ সদাচারপালনের ধারা ক্ষীণ হয়ে এলে পর তান্ত্রিক প্রক্রিয়া আর্যাবর্তের উত্তরাংশে পরিব্যাপ্ত হয়ে সর্বত্র নিজ প্রভাব বিস্তার করলে। সাংখ্যাযোগাদি দর্শনের মত শিব-শক্তি সম্পর্কে দার্শনিক বিচারও প্রারব্ধ হ'ল। এইসব মতবাদের সঙ্গে সমান্তরাল কৃষ্ণ-বাসুদেব সম্পর্কে ভক্তি ভাবুকতার একটি ধারা উপনিষদ্ যুগ থেকে প্রারব্ধ হয়ে বৌদ্ধ যুগের মধ্য দিয়ে ক্ষীণভাবে অথচ সুদৃঢ় ভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছিল। গুপ্তযুগের পূর্বেই আর্যাবর্তে বিষ্ণু এবং গোবিন্দকৃষ্ণের আরাধনার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, কিন্তু এর প্রায় পূর্নাঙ্গ রমনীয় একটি রূপ দেখা গেল দাক্ষিণাত্যে তামিল ভাষীদের গীতে। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলাকীর্তনের মধ্যে অবতার কৃষ্ণ এবং লীলারসিক ভগবান্ কৃষ্ণের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে খ্রীষ্ঠাব্দের প্রথম কয়েক শতকের মধ্যেই ভারতবর্ষের জনসমাজ বিচিত্র ভাব ও চিন্তার স্পর্শে আন্দোলিত হয়েছে।এই সব আদর্শের মূল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় থেকে আসেনি, এসেছিল লোকায়ত অনুভব থেকে, কিন্তু পরিশেষে অভিজাত সম্প্রদায়েও এগুলি অবহেলিত রইল না। বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে এই সমন্বয়ের ও লোকধর্ম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লুকানো রয়েছে।

খ্রীষ্ট্রীয় তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম প্রভৃতি কয়েকটি শতাব্দী ভারতের রাষ্ট্রগৌরবের এবং সমৃদ্ধির কাল, যদিও একচ্ছত্র রাজমর্যাদা তখন তিরোহিত হয়েছে এবং ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী রাজাদের গৃহবিবাদ একটা নিয়মের মত চলিত হয়েছে। সারা ভারতে যেমন জনপদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে তেমনি নগরেরও, অথচ শিল্প সাহিত্য দর্শন এবং নানাবিধ লোকবিশ্বাস জনপদগুলি রেখেছে জীবন্ত ক'রে। মুষ্ঠিমেয় কিছু ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এবং সম্ভবতঃ শূদ্র সম্প্রদায়ের কিছু শিল্পী ও বাস্তু-নির্মেতা ছাড়া তখনকার অধিকাংশ মানুষই ছিল গ্রামীন। অধ্যাত্মে এবং বাস্তবে তাদের জীবন ছিল গতিশীল, দেবতা-অপদেবতার বিশ্বাস, মহাপুরুষ বা শাস্ত্রকারদের বানী এবং উচ্চতর অধ্যাত্ব বা দার্শনিক কথা তাদের জীবনে জড়িত মিশ্রিত হয়ে পড়েছিল। মোটের উপর বলা যায় বৈচিত্র্যই ছিল সে জীবনের মূল এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে নূতনকে গ্রহণ করার আগ্রহ সেই জীবনের মন্ত্র। রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিস্বার্থ তখনও প্রবল হয়ে প্রজাশোষণে লিপ্ত হয়নি। রাজ-অধিপত্য সার্বভৌম ছিল না এবং রাষ্ট্রনীতি ও সমাজমন্ত্রকে উপেক্ষা ক'রে শ্রেষ্ঠীরা অপরিমিত ধন সঞ্চয় করবেন এমন উপায় ছিল না । তবু দারিদ্র্য এবং অবহেলা যে সমাজে ছিল না এমন নয়, বৃত্তি অনুযায়ী জাতিবিভাগ এবং কৃষক, গোপ, কুম্ভকার, তন্তুবায়, তৈলিক, ক্ষোরকর্মজীবী, ধীবর প্রভৃতি শূদ্রেরা যে উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিন্দিত ও অবহেলিত হ'ত তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় সাহিত্যে।

বুদ্ধের ধর্ম হীনবৃত্ত হীনবর্ণকে যে মনুষ্যত্বের অধিকার দিয়েছিল তা ঐ ধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হয়ে পড়ল। অনেকে তান্ত্রিকতার আশ্রয়ে আত্মরক্ষা ক'রে রইলেন আর যাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুগত হলেন তাঁরা পতিত এবং নীচজাতিরূপে উচ্চবর্ণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে থাকলেন। কিন্তু বহুতর বর্ণভেদ ঘটলেও তখনও হয়ত উচ্চনীচ অসাম্য ততটা তীব্র হয়নি, অন্ততঃ অনুভূত হয়নি।অর্থাৎ হীনকর্মই নিন্দনীয় ছিল কিন্তু হীনবর্ণে জন্ম মাত্রই ঘৃণার যোগ্য ছিল না। জাতি হিসাবে ঘৃনাবুদ্ধি, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি আরও পরবর্তী কালের। মনুর ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন এবং গুপ্তযুগে নব্য ব্রাহ্মণ্যের অভ্যুদয় হবার পর থেকে বিভেদ প্রকটতর হয়েই চলে এবং প্রবল প্রতিপক্ষের কৃপাপাত্র ও ঘৃণিত হীনবর্ণ দিশাহারা হয়ে ভক্তিপথের অনুবর্তী হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং অভিজাত বৈশ্যেরা মুখ্যতঃ বিষ্ণু সূর্য , শক্তি এবং শিবের উপাসনা করতে থাকেন। উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণ মিলিয়ে যে বৃহৎ হিন্দু সমাজ তার সাধারণ সংযোগসূত্রের কাজ করতে থাকে লৌকিক অলৌকিক মিশ্রিত পুরাণকথাগুলি।

নূতন শক্তিতে বলশালী বেদ বেদান্ত বাহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একালের অসামান্য কীর্তির নিদর্শন হ'ল শংকরাচার্যের অদ্বৈত মতানুসারী বেদান্ত ব্যাখ্যান। তিনি বুদ্ধিগত বিতর্কের সাহায্যে প্রতিপন্ন করলেন যে ব্যাসের বেদান্তসূত্রে এবং মোটামুটি উপনিষদে সর্বকারণ-কারণ একক মূলসত্তার বা ব্রহ্মের কথাই বলা হয়েছে এবং তা নিরাকার নির্বিশেষ, নির্গুন, শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ মাত্র। সৃষ্টি এবং জীব যা দেখা যাচ্ছে তা আসলে ব্রহ্মস্বরূপ, রূপ রসগন্ধাদিময়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ পরমার্থতঃ নেই, মায়া বা মিথ্যাজ্ঞানের ফলেই তা সত্য ব'লে প্রতিভাত হচ্ছে, জীবও স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, মায়ার জন্য উপাধিগত হ'য়ে বিশেষ ও নানারূপ পরিগ্রহ করেছে।শ্রী শঙ্কর মানুষ মাত্রকেই ব্রহ্ম বলে প্রতিপন্ন করাতে তাত্ত্বিকভাবে তিনি সকলকে সমান অধিকার দিলেন কিন্তু শুদ্ধজ্ঞানলাভে এবং মায়াপাশছেদনে ব্রহ্মত্ব লাভ করা যাবে এই দুরূহ আদর্শ স্থাপন করায় তা আকাশের মত দূরবর্তী হয়েই রইল। আদর্শ উচ্চতম হওয়ায় তা মানুষের কোনও কাজেই লাগল না। জীবের মঙ্গলের জন্য শংকর সগুণ ব্রহ্ম স্থাপন করলেও নির্গুনের ছায়ায় তার গুরুত্ব নিতান্ত মন্দীভূত হয়ে পড়ল। মানুষের আচরণীয় সহজ পথ, জাতে অনায়াসেই ঐ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তা শংকর নির্দেশ করতে পারেন নি। নিষ্কাম কর্ম সন্ন্যাস,নিঃশেষ ত্যাগের দ্বারা গুণহীন মোক্ষপ্রাপ্তির সাধনা-এ সন্ন্যাসী ছাড়া সংসারী জীবের কাম্য হতে পারে না। বস্তুতপক্ষে শংকর বৌদ্ধতত্ত্ববাদিদের নির্গুন শূর্ণ্যতাকেই অস্তিবাদ মিশ্রিত করে উপস্থাপিত করার প্রয়াস করেছিলেন এবং লোকযাত্রাকে মানুষের মহিমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধদর্শনের যা পরিনাম হয়েছে ব্রহ্মবাদেরও তাই ঘটল। শংকরমতের এই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করবার জন্য তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে দার্শনিক রূপ দিয়ে শক্তি-সাধনার প্রবর্তন করা হ'ল।

বলা হ'ল এই শক্তিই ত্রিগুণাত্মিকা হয়ে সৃষ্টিস্থিতি লয় করছেন, এঁর পূজা করলে সর্বসিদ্ধিলাভ। জীবের যা কামনার বস্তু-শত্রুবিমর্দন, জয়লাভ, রূপ-যশ-অর্থাদি প্রাপ্তি, আর এসব ছেড়ে মুক্তি চান তাঁদের মুক্তিদান সব ইনিই ক'রে থাকেন। তান্ত্রিকেরা পূবেই বিশেষ রীতির সাধনায় শিব বা শক্তির (অর্থাৎ উমা, পার্বতী, দুর্গা)প্রীতি উৎপন্ন করে সুরাপান ও কামকেলির সঙ্গে মোক্ষ প্রাপ্তির একটা ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। নব ব্রাহ্মণ্যের পুরোধা ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণেরা একেই অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত ক'রে প্রতাপ, অর্থ, জশ, প্রতিপত্তির বনিয়াদ পাকা করতে লাগলেন। শূন্যব্রহ্মবাদের যথার্থ প্রতিবাদ কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও আবির্ভূত হতে বিলম্ব ঘটল না। বিরুদ্ধ লৌকিক মত দর্শনে কতকটা স্বীকৃত ও সুদৃঢ় হ'ল। দাক্ষিনাত্যের ভাস্কর সম্প্রদায় ও শ্রীল রামানুজ যুক্তিসহকারেই প্রমান করতে প্রয়াস করলেন যে ব্রহ্ম অদ্বৈত হ'লেও তিনি সগুণ এবং সবিশেষ। অর্থাৎ তিনিই জগৎ ও জীবে পরিণত হয়েছেন। সুতরাং দেহমন ইন্দ্রিয় নিয়ে অনুভবপরায়ণ এবং দুঃখ সুখের ভোক্তা মানুষ সত্য।আর সৃষ্টির বৈচিত্র্যও তেমনি সত্য ও যথার্থ, মায়ার বিকার নয়। এ মত হল তত্ত্বগত ভক্তির মত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির আশ্রয়ে জীবের মুক্তি হয়, এই হ'ল এর আচার্যদের বক্তব্য। বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রকাশের সঙ্গে আরও কয়েকজন তাত্ত্বিক আচার্য নানাভাবে ভক্তি সাধনার বিষয় প্রকাশ করেন। তবু এই ভক্তিধর্ম জনসাধারনের উপকারে আসেনি।কারণ, এই তত্ত্বগত ভক্তিবাদীদের অনেকেই বর্নাশ্রমধর্ম মানতেন, কর্ম ও জ্ঞান তাঁদের সাধনার বাইরে ছিল না, আর এঁদের ঈশ্বর-নারায়ন, বিষ্ণু এমনকি কৃষ্ণও ঐশ্বর্যভাবের মূর্ত্তি ছিলেন,মানুষ রূপে প্রীতি সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য আসেন নি। সুতরাং নির্বিচারে সমস্ত মানুষের জীবন চর্যার মধ্য দিয়ে অনুভূত যথার্থ ধর্ম বা লোকধর্মের আবির্ভাবের প্রয়োজন ঘটল।

সাহিত্যে দর্শনে শাস্ত্র প্রণয়নে নব ব্রাহ্মণ্যের বিজয় যাত্রার মধ্যে আকস্মিক বাধা পড়েছিল তুর্কী পাঠান মোগল অভিযানে। এক শতাব্দীর মধ্যে পেশোয়ার থেকে গৌড় নবদ্বীপ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত ইসলাম ধর্মদর্শে বিশ্বাসী শাসন কর্তৃত্বের অধীন হয়ে পড়ল। এরকম বলিষ্ঠ ভোগবাদ, এরকম সংঘবদ্ধ শক্তিমতা এবং রাজকীয় ঐশ্বর্য আড়ম্বরের সঙ্গে ভারতবাসী এর পূর্বে পরিচিত ছিল না। কিন্তু মুসলমান আক্রমণে ও আধিপত্যে জনসমাজ বিহ্বল বিভ্রান্ত হয়ে একেবারে মৃতকল্প হয়ে পড়েছিল একথা মনে করলে ভুল হবে। কারণ, রাষ্ট্রিক উত্থান-পতনের সঙ্গে জনসমাজের যোগ ভারতবর্ষে স্বল্পই ছিল। সামাজিক কতকগুলি লিখিত এবং অলিখিত নীতি বিচিত্র জনসমাজের ঐক্যবিধান করত এবং রাষ্ট্রের নির্ধারিত কর দিয়ে এবং যুদ্ধাদির সময়ে সৈন্যের কাজ নিয়ে সমাজ তার রাষ্ট্রিক কর্ত্তব্য সমাধা করত। রাজারা অর্থ দিয়ে কোনো সৈন্যবাহিনী পোষণ করতেন না, শুধু নগরেও ব্যবসায় কেন্দ্রে কিছু কিছু আরক্ষ স্থাপন করতেন আর বিভিন্ন কার্যে মুষ্টিমেয় রাজকর্মচারী নিয়োগ করতেন। দেবালয় নির্মণ ও রক্ষণ, ক্বচিৎ

রাস্তাঘাট নির্মাণ, কাব্য-সংগীত রচয়িতা এবং নট নটীদের জীবিকার ব্যবস্থাও কদাচিৎ রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলে পরিগণিত হ'ত। এ সবের বেশী কিছু অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের নিয়ত সম্পর্ক ভারতে কোনোকালেই ছিল কিনা সন্দেহ। বৈদেশিক শাসনের প্রথম অবস্থায় সেই স্বল্প সম্পর্ক টুকুও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হ'ল।রাজকর্মে বৈদেশিকরাই আসন পেলেন এবং এঁদের জন্য জায়গীরদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। কিছুকাল হিন্দু রাজাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন অপহরণের পালা চলল, বাছা বাছা দেবালয় গুলি হিন্দু রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থায় কেন্দ্র ছিল বলে সেগুলি বিচূর্নিত হ'ল, ব্রাহ্মন-সজ্জন তিরস্কৃত হলেন। দু শতাব্দীর মত সময় অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গ অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটল ঠিকই কিন্তু ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের চিহ্ন এখনই দেখা গেল না।

তুর্কি আক্রমণের পূর্ব থেকেই অনার্যমূল থেকে ও তান্ত্রিক সংসর্গ থেকে আগত দেবতা অপদেবতার পূজা নিম্নশ্রেনীর হিন্দুসমাজে স্থায়ী হয়ে পড়েছিল এবং উচ্চবর্ণও এইসব দেবতার মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে এঁদের বহুমান করতে আরম্ভ করেছিলেন। পৌরাণিক দেবতাদের প্রভাব সমাজে আর তেমন রইল না, মনসা, চণ্ডী, জিয়াসিনী, রংকিনী প্রভৃতি ভয়নিবারিনী এবং মঙ্গলদায়িনী নারীদেবতা বৃক্ষতল ও কদাচিৎ গৃহ আশ্রয় করে সমাজের মঙ্গলবিধান করতে লাগলেন। এদের নিয়ে ছড়া পাঁচালি নূতন পুরাণ মুখে মুখে রচিত ও গীত হতে থাকল।এ হ'ল দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। আজকের দিনে সমালোচিত বাঙালি জীবনে ভীরুতা এবং নানাবিধ দুর্বলতার প্রারম্ভ বোধ হয় এখন থেকেই। তবু এই যে সব দেবতারা অরণ্য থেকে জনপদে আশ্রয় লাভ করলেন এঁরা হলেন অগণিত নিম্নবর্ণের হিন্দুর নিজের ঠাকুর, তাদের কাছে যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি জাগ্রত। মানুষের যাবতীয় আশা অভিলাষের এবং সমাজ জীবন নির্বাহের বাস্তব কেন্দ্র রূপে অধিষ্ঠিত রইলেন।

ইসলাম অভিযানে আর একটি অত্যন্ত উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটল। সারা ভারত ইসলামের মরমিয়া সাধক বা সুফীদের ছোট বড় সম্প্রদায়ে ভ'রে গেল।এই সাধকদের কেউ কেউ তাঁদের বিশ্বাস মত ইস্‌লামি রাষ্ট্রের পত্তনে ও সংবর্ধনে যে সাহায্য করেন নি এমন নয়, কিন্তু অনেকেই বিরক্ত সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন। এঁরা ভাবুক ছিলেন এবং এঁদের কোনো সম্প্রদায় সংগীতে ও নৃত্যে ঈশ্বর সমীপে তাঁদের ভাববিকার সমূহ নিবেদন ক'রে তৃপ্তি পেতেন। যাঁরা ভাবের উচ্চ শীর্ষে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঈশ্বর বিরহে অশ্রু কম্প মূর্ছা প্রভৃতি বিকারের প্রকাশও দেখা যেত। এঁরা সাধনার দ্বারা অনেক অলৌকিক বিভূতিও দেখাতে পারতেন।ফলে এঁদের প্রভাবের সীমা মুসলিম সমাজ ছাড়িয়ে হিন্দু সমাজকেও স্পর্শ করেছিল এবং এক ধরনের অনুষ্ঠানশূন্য সহজ পথের ভাবসাধনা হিন্দু মুসলমানকে ক্রমশঃ কাছাকাছি এনে ফেলেছিল।

কবীরকে একালের এই সহজ ধর্ম সাধনার শ্রেষ্ঠ পথিক হিসাবে বিবেচনা করা যায়। সুফীধর্মের অভিঘাতে প্রথমে শাস্ত্র এবং আড়ম্বরময় অনুষ্ঠানের উপর হিন্দু সমাজের শ্রদ্ধা গেল কমে তারপর ভাবুকতাময় শুদ্ধা ভক্তিই যে ধর্ম সাধনার একটি উৎকৃষ্ট পথ এ সম্পর্কে বিবেকবান ব্যাক্তিদের প্রতীতি দৃঢ় হতে লাগল। ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈদেশিক রাষ্ট্রের শাসনে উচ্চ ও নিম্নবর্ণে হিন্দুর উগ্র বিভেদ পূর্বেই কিছুটা দূর হয়েছিল, এখন জীবনাচরণ ও ধর্ম সম্পর্কে নূতন চিন্তার প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। ভারতের প্রাদেশিক ভাষা এবং সাহিত্য গুলি এখন বিকাশ লাভের সুযোগ পেলে এবং তার অন্তর্নিহিত বস্তু হল এই সব নূতনতর ধর্ম প্রেরণা।

অধুনা-পূর্ব কালের ভারতবর্ষীয় সমাজের স্বরূপ বিবেচনা করতে গেলে মানুষের ধর্মীয়তার দৃষ্টি দিতেই হবে। কারণ ধর্ম অধিকাংশ মানুষের জীবনের এমনকি কোনো কোনো রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত ছিল। সমাজ-জীবনের সাধুসন্ত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাও কম ছিল না। বিশেষতঃ অলৌকিকের দিকে মানুষের আকর্ষন ছিল মজ্জাগত। চৈতন্যভাগবতে পাঠে জানা যায় শ্রীচৈতন্যে নূতন রাগাত্মিক ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হলে নকল ভাববিকার দেখিয়ে কোনো কোনো ভন্ড ব্যক্তি সমাজে যশ প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস করছেন। পদকর্তা নিজের দৈন্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন 'কপট চাতুরী চিতে জনমন ভুলাইতে লইয়ে তোমার নামখানি'। বহু পূর্বে ভগবান্ বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্ত আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য নূতন ধর্মীয় সমাজ স্থাপনের উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে ধর্মযুদ্ধাদি য়ুরোপের মত এত প্রত্যক্ষ ও প্রবল না হলেও তার নিতান্ত অভাব যে ছিল না এবং ভারতবর্ষ পরমত সহিষ্ণুতার দেশ হলেও কোনো কোনো রাষ্ট্রনেতা যে তাঁর ধর্মের অনুকূল সমাজব্যবস্থা চাইতেন ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু রাষ্ট্রের দিক থেকে যাই হোক ভারতবর্ষে বারংবার ধর্মাচরণ সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। ধর্ম আনুষ্ঠানিকই হোক আর আচরণমূলকই হোক সেকালে মানুষের কাজকর্ম নানাভাবে ধর্মীয়তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকত। দেবপূজাদির সঙ্গে অনেকের জীবিকারও সম্বন্ধ ছিল। আবার এদিকে লৌকিক দেবতা অপদেবতা যা অনার্যমূল থেকে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে বিস্তারলাভ করেছে, তারা ঐ সম্প্রদায়ের সামাজিক দেবতা বা গৃহ দেবতারূপে নিত্য ভীতিমিশ্র শ্রদ্ধার উপচার লাভ করতে লাগল। অনার্য সম্প্রদায় থেকে ধীরে ধীরে নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ে আশ্রিত এই সব মানুষের ধর্মীয় সংস্কার যে কী রকম প্রগাঢ় ছিল তার দৃষ্টান্ত আজও বিরল নয়। প্রতিকর্মে দৈবনির্ভরতা এবং অলৌকিক বিশ্বাস এদের চরিত্রগত লক্ষণ ছিল। আর রাজা জমিদার গোষ্ঠীপতি ভূমিপতিদের অনুগ্রহভিক্ষুক কর্তাভজা মানুষের বাস্তবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার হয়ত কোনো পথও ছিল না। এদের ইতিবৃত্ত পরবর্তী কালে লেখা বাঙলা মঙ্গলকাব্য গুলিতে কিছু পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে। মনসা, চণ্ডী ধর্ম ঠাকুর সম্পর্কে লেখা, মীননাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতির প্রভাবও চারিত্র্য নিয়ে লেখা,

পূজাবিধি ও কাহিনীর যে সব উপাদান আমাদের হাতে এসেছে তা থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের জীবনাচরণ ও সামাজিক ভাববিন্যাস সম্পর্কে বেশ কিছু আলোক পাওয়া যায়। এইসব ধর্ম কথা বা কাব্যকাহিনী কিছু পরবর্তী সময়ে লেখা হলেও নানা বিষয়ের কিছু পূর্বেকার বাঙালি সমাজেই পরিস্ফুট করে। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বাঙ্‌লার দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীকে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ ব'লে নির্দেশ করেছেন। আধুনিক চিন্তায় দেখা যাচ্ছে একে লৌকিক সংস্কৃতির বিস্তারের যুগ বললেই অধিকতর সমীচীন হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে শূরসেন বংশের অধিপত্যকে কেন্দ্র ক'রে ভারত পূর্বেকার ভারতীয় নব-ব্রাহ্মণ্যের অনুসরণ-প্রয়াস দেখা গেলেও তা সর্বত্র তেমন ব্যাপক হতে পারেনি। তাছাড়া ব্রাহ্মণ্যের সঙ্গে লোকধর্মের মিশ্রণই সাধারণ ভাবে একালের বৈশিষ্ট্য। জয়দেব-প্রদর্শিত ভক্তিভাবুকতায় পুরাণের লোকধর্মাশ্রিত নূতন ব্যাখ্যানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক শিবের কাহিনী ও চারিত্র্যের লৌকিক রূপান্তরও একালের বৈশিষ্ট্য। তান্ত্রিকতা গ্রস্ত বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্ম সহজিয়া মতবাদে রূপান্তরিত হয়ে দশম-একাদশ শতাব্দীতে নিম্নবর্ণের কোনো কোনো সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে এবং ক্রমে উচ্চবর্ণকেও প্রভাবিত করতে থাকে। উচ্চবর্ণের নাথ ধর্ম গ্রহণ প্রসঙ্গ ময়নামতীর গান বা গোপীচাঁদের পাঁচালিতে এবং শৈবধর্ম ত্যাগ ক'রে চন্ডী-মনসার পূজা স্বীকার মঙ্গল কাব্য গুলিতে কাহিনীরূপে স্থান লাভ করেছে। বহু পূর্বেকার মূল বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সংযোগ ঐতিহাসিক ঘটনা।তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের গঠনেও লৌকিক সংস্কৃতির দান অবশ্য স্বীকার্য।সুতরাং ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকে অতিক্রম ক'রে লোক সংস্কৃতির অভ্যুত্থানই একাদশ-দ্বাদশ প্রভৃতি শতাব্দীর বাঙ্‌লার সমাজ-পরিচয়।

এই লোকধর্মের অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত ও বলশালী কাতে তুর্কী অভিযান ও মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্টা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল। দিল্লীতে দাস-খিলজী-তুঘলক বংশের পতন-উত্থানের সঙ্গে বাঙ্‌লার ভাগ্য মাত্র কদাচিৎ যুক্ত হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঙ্‌লার শাসনকর্তা বা জায়গীরদারেরা বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীন ভাবে দেশ শাসন করতে চেয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনই থাকুন আর দিল্লীর নির্দেশ অনুসারেই রাষ্ট্র চালনা করুন, তুর্কি শাসনের প্রায় দুশ বছর যেমন ভারতে তেমনি বাঙ্‌লায় মুসলিম আধিপত্য কায়েম করার কাল। এই দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় সারা আর্যাবর্তে পূর্বেকার ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য হল। প্রথম ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালে বাঙ্‌লার আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হলে সারাদেশে একক শাসনের প্রবর্তনে প্রজারা অনিশ্চিত অবস্থা থেকে রক্ষা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অবদমিত ব্রাহ্মণ্যের আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটেনি। ইতিমধ্যে মুসলমান ফকির এবং দরবেশরা অন্ততঃ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এদের প্রভাবে অনেকে ধর্মান্তরও গ্রহণ করেছে। মুসলমান

শাসকদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার দৃষ্টান্ত সীমিত দুচারটি ক্ষেত্রে ঘটে থাকতে পারে। বিবাহ–সম্পর্কে ধর্মান্তরও যৎকিঞ্চিৎ হয়ত বা ঘটেছে। কিন্তু ধর্ম প্রবণ,অলৌকিক-বিশ্বাসী, সম্বলহীন নিগৃহীত সুতরাং দৈবনির্ভর হিন্দু সহজেই সুফী মতের অর্থাৎ বৃহত্তর ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। জীর্ণ প্রথাসম্বল ব্রাহ্মণ্যধর্ম এসময়ে জনসমাজের ধর্মপিপাসা নিবৃত্ত করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল এবং উচ্চ সমাজে আকর্ষনীয় উন্নত চরিত্রের উদ্ভবও বিরল হয়ে পড়েছিল। এরই ফলে বাঙ্‌লার নিম্নবর্ণের মানুষের এক অংশ ভয় বিঘ্নবিনাশক্ষম মঙ্গলদেবতার আশ্রয় প্রার্থনা করলে এবং অন্যেরা সহজেই মন্ত্রমুগ্ধের মত ইসলাম ধর্মের অনুগত হ'ল। এই ধর্মান্ত্রিত হওয়ার মধ্যে সহজ জীবিকা নির্বাহের প্রত্যাশাও হয়ত খানিকটা কাজ করেছে। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ডঃ কালিকা রঞ্জন কানুনগো বলছেন-"...the saints of Islam who excelled the Hindu priesthood and monks in active piety, energy and far sight , began prosely-tizing on a wide scale not so much by force, as by the fervor of their faith and their exemplary character. They lived and preached among the low-caste Hindus then as ever in the grip of superstition and social repression. The new converts in rural areas became a source of additional strength to the Muslim Government. About a century after the military and political conquest of Bengal there began the process of moral and spiritual conquest of the land through the efforts of the Muslim religious fraternities that now arose in every corner ".ইত্যাদি (History of Bengal, chap 111)

ভারতবর্ষ বহু বিচিত্র মত ও পথের দেশ। এর কারণ বহু বৈদেশিক জাতির রক্ত-সংমিশ্রন ও মত অনুপ্রবেশের ফলে এক জটিল জনসমাজের সৃষ্টি। ভাল এবং মন্দ, উন্নত এবং অবনত, হিংসা এবং করুনা, জ্ঞান ও অন্ধতা, শক্তি ও ভীতি, দেশপ্রীতি ও দেশবৈরিতার, অতিশয় ধনবান এবং নিতান্ত নিরন্নের একাধারে এরকম বৃহৎ সমাবেশ পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। প্রবল জাতি-বর্ণ বিভেদ ছাড়া, ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রতিক রাষ্ট্রনীতিক মতামতে এ দেশের মানুষ যেমন বিভিন্ন আবার তেমনি কতকগুলি ভাবাদর্শ ও সামাজিক রীতি পদ্ধতির অনুসরণে একাত্মও বটে।কালে কালে এর সমাজদেহে দেশীয় ও বৈদেশিক বহুভাবের অভ্যুদয় ও মিশ্রণ ঘটেছে এবং এক জটিল মানসিক গঠনের সৃষ্টি করেছে। ভাবিকালের সমাজবিজ্ঞানীরা এই ইতিবৃত্ত নির্ধারণের চেষ্টা করবেন। বাঙ্‌লার সেন রাজত্বে নব্য-ব্রাহ্মন্য মত এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের কালেই তান্ত্রিক ও সহজিয়া ধর্মের প্রসার দেখা যায়। লৌকিক মঙ্গলদায়ক চন্ডী-মনসার পূজাবিধি এবং ব্রত কথা সৃজনের পালাও একালেরই, না হলে পঞ্চদশ

শতাব্দীতেই কাহিনীময় এবং পৌরাণিক পেটিকায় আবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ কাব্যরচনা সম্ভবপর হতে পারে না।মুসলিম অভিযান নিঃসন্দেহে বাঙালির উচ্চস্তরকেই সবচেয়ে বেশি আহত করেছিল। কিন্তু সে আঘাতে ব্রাহ্মণ্য বিধি-নিষেধ ক্ষণকালের জন্য তিরস্কৃত হ'ল মাত্র। এর যথার্থ হীনবল হয়ে পড়ার জন্য অন্যবিধ আঘাতের প্রয়োজন ছিল। সেই কথারই এখন উত্থাপন করছি। অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অব্যবহিত পূর্বেকার চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্মীয় পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আসছি।

তুর্কির অশ্ব এবং তরবারি শতাধিক বর্ষ ধ'রে বাঙ্‌লার নগরগুলির উপর দিয়ে আস্ফালিত হয়ে শ্রান্ত হলে পর, বিদেশি শাসকবর্গ বুঝলেন যে রাজ্যশাসন করতে হলে প্রতিষ্টা সম্পন্ন হিন্দুদের সহায়তা আবশ্যক। সুতরাং তাঁরা পূর্বতন হিন্দু ভূম্যধিকারীদের বশীভূত করে স্ব স্ব অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব রক্ষা করলেন, সেই সঙ্গে তুর্কি আফগান সেনাপতিদের জায়গীর দিয়ে নূতন ভূম্যধিকারী শ্রেনীর সৃষ্টি করলেন এবং উচ্চতর হিন্দু সম্প্রদায় থেকে সুযোগ্য ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু রাজকর্মে নিযোগ করতে লাগলেন। দেখা যায়, বাঙ্‌লার রাজা বা প্রতিনিধি যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে বৃহত্তর শাসনের একটা কাঠামো রক্ষা করে দিন কাটাতেন আর গ্রামীন মানুষের সুখ দুঃখ নির্ভর করত স্থানীয় ভূম্যধিকারী এবং মীর-বক্‌শী-কাজি-কোতোয়ালের উপর।কেবল কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটলে হয়তো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়ত।

শেরশাহের সময়, বিশেষভাবে মোগল শাসন পত্তনের পর কৃষক প্রজা, শিল্পী, ব্যবসায়ী থেকে রাজকর্মচারী পর্যন্ত নগর ও গ্রামের প্রায় সমস্ত শ্রেনীর মানুষের জীবিকা ও অভাব-অভিযোগের বিচারাদির একটা মোটামুটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু তার পূর্বে অগণিত সাধারণ মানুষকে (হিন্দু বা মুসলিম) কর্তৃত্বের এবং নিম্নবর্ণকে উচ্চবর্ণের মুখাপেক্ষী হয়েই জীবনধারণ করতে হত। কিন্তু কেবল হিন্দু এবং মুসলমান রাজা-জমিদার-জায়গীরদার বা তালুক-পত্তনি-ইজারাদের ব্যাপারই নয়, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কিছু কিছু হিন্দু রাজকর্মচারীও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে নানাভাবে বিত্ত সঞ্চয় করে সমাজে প্রবল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এঁরা ছিলেন সুযোগ-সন্ধানী। অরাজকতা বা বিদ্রোহ-বিপ্লবের সময় নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি বিধিন করতে এঁরা যত্নবান হতেন ও প্রয়োজন হ'লে জায়গীরদারদের মত এক পক্ষ থেকে পক্ষান্তর অবলম্বন করতেন, গ্রাম থেকে নগরে বাসা বাঁধতেন এবং আমীর-ওমরাহদের বিলাস ব্যসনের অনুকরণ করতেন। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও ব্যক্তিস্বার্থনিষ্ট কার্যকলাপে এঁরা নগণ্য ছিলেন না। স্বচ্ছন্দে বলা যায় ঐ ভূম্যধিকারীর দল এবং এই উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে সেকালেই উচ্চ এবং মধ্যবিত্তদের একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। লিখিত ইতিহাস এদের সম্বন্ধে প্রায় নীরব থাকলেও, সাহিত্য থেকে আমরা এদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাচ্ছি, কিছু অনুমানও করে

নিতে হচ্ছে। ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থে মধ্যবাঙলার ভূমিবিত্তবান্ এরকম মাত্র কয়েকজনের উল্লেখ পাচ্ছি, কোনো না কোনো ক্রমে এঁদের সংস্রবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য অথবা তাঁর পরিকরবৃন্দ এসেছিলেন এবং বোঝা যাচ্ছে ঐ অঞ্চলেই অকথিত আরও অনেকে ছিলেন এবং সারা বাঙলায় এঁরা সংখ্যায় একেবারে নগণ্য ছিলেন না, ফলে তখনকার সমাজে এই নব-উদ্ভূত বিত্তশালীদের প্রভাব ছিল যথেষ্ঠ। উল্লিখিত এঁদের কয়েকটি নাম হ'ল-পুরন্দর খাঁ, সুবুদ্ধি রায়, শতনন্দ খাঁ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, রামচন্দ্র খাঁ, হিরন্য-গোবর্ধন। রাজা হুসেন শাহের অধীনে বহু হিন্দু কায়স্থ ব্রাহ্মণ রাজ-কর্মচারী ছিলেন এবং চরিত গ্রন্থে দেখা যায়, সনাতন এবং রূপ অর্থাৎ সাকর মল্লিক এবং দবীর খাস উচ্চপদে আধিষ্ঠিত থেকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করেছিলেন। এঁদের কোনও জ্যোষ্ঠভ্রাতা দক্ষিনবঙ্গের কোনও পরগনার চাকলাদার ছিলেন, যাঁর সম্বন্ধে রাজা হুসেন শাহ শ্রী সনাতনের কাছে অভিযোগ করে বলেছিলেন-'তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।।জীবপশু মারি সব চাকলা কৈল খাস'। এছাড়া বড় বড় ভুঁইয়া ও মুল্লুক-পতির উল্লেখও জীবনী গ্রন্থগুলিতে রয়েছে। এঁরা বিত্তবান হলেও সকলেই যে মানুষ খারাপ ছিলেন হয়ত এমন নয়। সপ্তগ্রামের ইজারাদার হিরণ্য-গোবর্ধন দুই ভ্রাতা, যাঁরা রাজসরকারে বাৎসরিক বারো লক্ষ টাকা কর দিতেন তাঁরা নদীয়ার বহু বেকার ব্যক্তির কর্মসংস্থান করে দিয়েছিলেন এবং গরীব দুঃখীর পালক ছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়দার পরিগ্রহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। সপ্ত গ্রামের ধনী বণিক উদ্ধারণ দত্তও ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু অর্থবান এবং প্রভাব প্রত্তিপত্তিশালী এমন সব ব্যক্তিও ছিলেন যাঁদের বিলাসিতা, ঐশ্বর্য প্রদর্শন এবং স্বার্থবুদ্ধি প্রনোদিত ব্যবহার সৎ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের পীড়িত করত। বস্তুত পক্ষে বিদেশী শাসনের প্রাথমিক সংঘর্ষের অবস্থা তিরোহিত হলে ক্রমশঃ এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতার্দ্দীর মধ্যেই হিন্দুরা তাদের পূর্বাবস্থা কিছুটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় এবং নবাব-পক্ষ বা রাজপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগে এক ধরণের অভিজাত শ্রেনীও গড়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ এইভাবে নূতন প্রাপ্ত ঐশ্বর্যের লীলাভূমি হয়েছিল। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে এদের চারিত্র্য এবং এদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনোভাব বিবৃত করে কয়েবারই নিম্নলিখিতরূপ উক্তি করা হয়েছে-

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে।।

* * * *

তারে বোলে সুকৃতি যে দোলা-ঘোড়া চড়ে
দশ বিশ জন যার আগে পিছে লড়ে।।

* * * *

ভালমতে বর্ণ উচ্চরিতেও সে নায়ে।
সহস্র পন্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে।।

□ * * * *

সকল নদীয়া মত্ত ধম-পুত্র রসে।

নবদ্বীপ অঞ্চলের এই অবস্থার দৃষ্টান্তে অন্যান্য স্থানের কথাও অনুমান করা যেতে পারে। গ্রামীন জন সাধারণ তো দরিদ্র ছিলই, নবদ্বীপ অঞ্চলেও যে ঐশ্বর্যের পাশেই দারিদ্র্য বর্তমান ছিল তারও পরিচয় জীবনী গ্রন্থ গুলিতে বেশ পরিস্ফুট। শ্রীচৈতন্যের পরিকরদের অধিকাংশই দরিদ্র অথচ সৎ ব্যক্তি।সুদরিদ্র ব্যক্তিরও অভাব ছিল না, কলার খোলাবেচা শ্রীধর, ভিক্ষাজীবী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। গৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ মিশ্রই অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। গৌরাঙ্গের শিক্ষা বিষয়ে শচীদেবীর সঙ্গে বিতর্কে তিনি বলছেন-'পড়িয়াও আমার ঘরেত নাহি ভাত'।কবি বৃন্দাবন দাস শচীদেবীর গৃহস্থালীর বর্ণনায় বলছেন- 'ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ'।মুরারি গুপ্তের বর্ণনা মতেও শ্রীচৈতন্য দরিদ্রগৃহে জন্মেছিলেন। লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন বিষয়ে লক্ষ্মীদেবীর পিতা বল্লভ আচার্য স্বীয় দারিদ্র্য জ্ঞাপন ক'রে বলছেন-

সবে এক বাস বলিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাই।।
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়ে।

দেখা যায়, সেকালের এইসব সাধারণ মানুষ দুর্ভিক্ষ, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ এবং নৈসর্গিক বিপর্যয়কে যেমন ভয় করত তেমনি তটস্থ থাকত ভূম্যধিকারীর উৎপাতে। রাজ-ভয়ও কম ছিল না, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়িতে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা ঘটলে কাজি বা অঞ্চলিক শাসনকর্তা তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। কিন্তু এসবকে ছাপিয়ে সমাজে যে বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠল তা হল অর্থপুষ্ট মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থোদ্ধত ভোগস্পৃহা এবং অমানবীয় আচরণ।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বাঙলার এই হ'ল এক পৃষ্ঠা অর্থসম্পদের প্রভুত্ব। এর অন্যপৃষ্ঠাও আছে। বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে তা প্রশংসনীয়, কিন্তু অন্তরঙ্গে ভয়ঙ্কর সেহেতু তা লোক কল্যাণ বিরোধী। আমরা পূর্বেই বলেছি তুর্কী আক্রমণের প্রাথমিক সংঘাতের অবস্থা অতীত হলে যেমন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা রাজ্যশাসনের কার্যে প্রবেশধিকার লাভ করতে লাগলেন, তেমনি ধীরে ধীরে নব-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিরও পুনর্জীবন ঘটতে লাগল।ভারতের তথ্য বাঙলার প্রধান নগর ও জনপদ গুলিতে সংস্কৃত শিক্ষার এবং ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত,ব্যাকরণ অলংকার কাব্যের চর্চা

নুতন ক'রে প্রারব্ধ হতে লাগল। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাগরথী-পদ্মাতীরবর্ত্তী অঞ্চল গুলিতে রাজা অথবা ভূম্যধিকারির অনুগ্রহে পুষ্ট বহু চতুষ্পাঠী গড়ে ওঠে।পূর্বাঞ্চলে জ্ঞানচর্চার পীঠভূমিই ছিল নবদ্বীপ। নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ এবং মীমাংসক ও স্মার্ত রঘুনন্দন সেকালের বহু অধ্যাপকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক একজন ছিলেন মাত্র। অদ্বৈতবাদী সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি এবং তাঁদের পিতা খ্যাতিমান বিশারদ ও সেকালকার বিশ্রুত পন্ডিত। কিন্তু লক্ষনীয় এই যে এই পান্ডিত্যের সঙ্গে দাম্ভিকতাতেও চতুষ্পাঠী গুলি পূর্ণ হয়েছিল। বিদ্যার উন্নসিকতায় পন্ডিতবর্গ নিজেদের জনসাধারণ থেকে ঊর্ধ্বলোকের জীব ব'লে মনে করতেন, এমনকি গঙ্গার ঘাটে নিজেদের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটলেও কেউ কারুর সঙ্গে সম্ভাষন না ক'রে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন। বৃন্দাবন দাস বলছেন, এঁরাও অর্থবান ব্যক্তিদের মতই বিদ্যার ঐশ্বর্যে প্রতাপবান্ ছিলেন অথচ বৃত্তি-পঞ্জী-টীকা-ভাষ্য ছাড়া আর কিছুই জানতেন না, শুষ্ক পান্ডিত্য এবং বুদ্ধির কসরত অবলম্বন করে জনসাধারণ থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রেখে জীবন কাটাতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর কৈশোরে-তারুণ্যে বিদ্যার যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতেন সে ঐ পন্ডিতদের চারিত্রের একটা অজ্ঞাত অনুকরণ হিসাবে। শ্রীগৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী পরাভব সত্য ঘটনা নাই হোক, নবদ্বীপের বিদ্যার অভিজাত্যের ঐ রকম সম্ভাব্য সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর এই নূতন সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে এই অমানবীয় বিদ্যাশক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে পূর্বে জনসমাজ পরিচিত ছিল না। নিঃসন্দেহে একে সামাজিক গ্লানি বলা চলতে পারে, আর যেহেতু জীবনাচরণে নীতিহীন অমানবীয়তাই অধর্ম, সেইহেতু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভূমিকায় এবং চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কথিত ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান নিরোধের জন্য ঈশ্বরস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবেই তত্ত্বাটিকে ঐ অবস্থায় সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে দেখা যায়। বৃন্দাবন দাস এই ভাবেই চৈতন্যাবতারের কারণ নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যে সমাজ-জীবনের এই অসহনীয় অবস্থাই অদ্বৈত আচার্যকে ঈশ্বরাবির্ভাব ঘটানোর জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত করেছিল।

আবার যদি খাঁটি ধর্মাচরণের দিক বিবেচনা করা যায় তাহলেও দেখা যায় তখনকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়েছিল যথেষ্ট। পূর্বে আমরা অনার্যমূল থেকে আগত এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশ্রিত লোক ধর্মের বা চন্ডী মনসা বাশুলী-জিয়াসিনী প্রভৃতি দেবতার কথা উল্লেখ করেছি। লৌকিক মত একটা বিধান সৃষ্টি করে ছাগ, মেষ, কুক্কুট মহিষ প্রভৃতির বলি দিয়ে নিতান্ত নিম্নবর্ণের মানুষ তাদের ধর্মপিপাসা পরিতৃপ্ত করত। এরকম নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ছাড়া এসব দেবতার নিত্যপ্রাপ্তি ছিল ভীতি-সম্ভম মিশ্রিত প্রণতি, মঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা। নৈসর্গিক দুর্বিপাক, রোগ, অকালমৃত্যু এবং শক্তিশালী মানুষের দ্বারা নিগ্রহ দুর্বল অবস্থার মানুষের ভয় উৎপাদন করত। কিন্তু দেবতা অপদেবতার পূজা মানত ভয়নিবারণ ও মঙ্গলদানের জন্য

সংঘটিত হলেও এই সব মানুষের সঙ্গে এই সব দেবতার একটা সাধারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ধরা যাক প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক এবং সে সম্পর্ক সংস্কারে দাঁড়িয়ে যায়, ফলে এদের যাবতীয় জীবনাচরণ ঐ ধর্মবোধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।অথচ বিস্ময়ের বিষয় এইযে কাল ক্রমে ঐ ধর্মের আশ্রয় থেকেও এই সব সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়। লোকধর্মের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখতে পাই এই ধর্মাচরণ নিম্নশ্রেনী থেকে ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীতে পরিগৃহীত হলে পর শিক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন উচ্চবর্নের লোকেরা পৌরাণিক কোনো না কোনো সূত্রের সঙ্গে এই সব দেবতার ইতিবৃত্ত যুক্ত করে এই দেবতা –অপদেবতাদের পূজার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যবর্তী করে মহিমা বৃদ্ধিরও প্রয়াস করেন এবং সেই ভাবে পূজাদি করে পরিতৃপ্ত হতে থাকেন।তাছাড়া মানত করে সিদ্ধিলাভ করলে অর্থ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা এই সব গ্রাম্য ও বৃক্ষ তলাশ্রয়ী দেবতাদের জন্য পাকা মন্দির মন্ডপ প্রভৃতি নির্মাণ ক'রে থাকেন। ধুমধাম সহকারে পূজা গাজন উৎসব নির্বাহ করতে থাকেন। ফলতঃ দেখা যায় যে সব দেবতা নিতান্ত সাধারণ মানুষের ছিল, তা ব্যাক্তি বিশেষের কুক্ষিগত হয়ে পড়ল এবং সাধারণ মানুষ শেষ সম্বল ধর্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ল এই হ'ল ধর্মের গ্লানি, সেই সঙ্গে সমাজেরও এই বিষয় লক্ষ্য করেই বৃন্দাবন দাস বলেছেন-"দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনও জনে" ।এ হল ভক্তিবিহীন অনুষ্ঠান, অন্যকে আহত করে এমন ঐশ্বর্য আড়ম্বর প্রকাশ করা। এই হ'ল ধর্মের গ্লানি মানুষের জীবনী থেকে ধর্মের বিকৃতি,জীবনাচরণের গ্লানির সঙ্গে একই সূত্রে এ যুক্ত। এরই ফলে যথার্থ ধর্ম দিয়ে মানুষকে রক্ষা করার জন্য শ্রীচৈতন্যের জীবনে এক আশ্চর্য লোকধর্মের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখা গেল। এ ধর্মে জাতিকুলের বিচার এবং ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের নির্দেশ নিতান্ত তিরস্কৃত হল। বৈষ্ণব সকলেই সমান কেউ উচ্চনীচ নয়। এই বিষয়টি প্রতিপন্ন করার জন্য মহাপ্রভু সমাজে নীচ এবং পতিত ব'লে ধিক্কৃত মানুষকেই ভক্তির অধিকারী বলে সবচেয়ে বেশী সমাদর দেখালেন। মুসলমান হরিদাসকে হরিভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধক বলে গণনা করলেন। কর্মসূত্রে এবং সম্ভবতঃ ধর্মসূত্রেও মুসলমান্ সমাজে আগত সুতরাং পতিত বলে গণ্য সনাতন-রূপকে বৃন্দাবনে এই নব ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে নিয়ক্ত করলেন। রায় রামানন্দ শূদ্র হলেও তাঁকে মহত্তম ব্রাহ্মণের অধিকারে অভিষিক্ত করে নীলাচলে তাঁর অন্তরঙ্গের স্থান দিলেন। এদিকে প্রেমিক শ্রীনিত্যানন্দ তাঁর নির্দেশে জাতিকুলের বিন্দুমাত্র বাছ-বিচার না করে বাঙ্লায় সকলকে এই প্রেমধর্মের অধিকার দিলেন।এতে অগণিত দীনহীন সাধারণ মানুষের মনুষ্যত্বলাভ হ'ল এবং আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হ'ল। যারা নিজের দেবতাকে একদিন হারিয়েছিল, তারা নূতন ভাবে আরও নিকটে,আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে দেবতাকে পেয়ে গেল। বিত্ত এবং বর্ণের কৌলীন্য বেশ কিছুকালের মত অর্থহীন হয়ে পড়ল। মহাপ্রভু কথিত "তৃনাদপি সুমীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" এই চরিত্র নির্দেশ সেকালের দুর্গত পতিতদের এবং সহনশীল নিম্নবর্নের মানুষকেই নির্দেশ করছে, তাদেরই যেন মর্যাদা দিয়েছে।

সমাজের এই নব অভ্যুথান শাস্ত্রসম্বল রক্ষণশীল সমাজ এবং ঐ বিত্তশালী

গোষ্ঠী কর্তৃক অভিনন্দিত হয়নি সে কথা বলাই বাহুল্য। অদ্বৈত আচার্য যখন হরিদাস ঠাকুরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এমনকি শ্রাদ্ধীয় অগ্রভাগ নিবেদন করে তাঁর মহিমা ঘোষনা করেছিলেন, তখন দৃঢ়ভক্তি সাধক বলেই তিনি প্রতিবাদে বিচলিত হননি।আবার মহাপ্রভুর শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্য কীর্তন এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দের জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রভৃতি নবদ্বীপের ব্রাহ্মন্য-শাসিত সমাজ মোটেই ভালো চোখে দেখেননি।এই সব ভাব দেখানোর বাড়াবাড়ি সহ্য করতে না পেরে তারা কাজীকে দিয়ে শাস্তিদানের আয়োজনও করেছিল। কিন্তু তখন জনজাগরণ ঘটে গেছে।মহাপ্রভুর নীলাচল আশ্রয়ের পর সহজ ভাবে ভাবুক প্রভু নিত্যানন্দ কর্তৃক ধর্ম বিস্তারের পালা। তারপর ষোড়শ শতকে একেবারে শেষের দিকে শ্রীনিবাস নরোত্তম এবং আরও বহু সাধক ও পদকর্তার প্রয়াসে এই লোকধর্মের চরম ব্যাপ্তি। ইতিমধ্যে বৃন্দাবনের রূপ সনাতন এবং বিশেষভাবে জীবগোস্বামীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্রের প্রনয়ানে ব্রাহ্মন্য শাস্ত্রের ও অমানবীয় অদ্বৈত দর্শনের কতকটা যৌক্তিক প্রতিবাদ গঠিত হয়ে রক্ষনশীলতার মর্মে আঘাত করেছে। অবশ্য একথা ঠিক যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এই সহজ লোকধর্ম নিজ শাস্ত্রের নিতান্ত অনুগত হয়ে পড়ায় গোস্বামিগণ আভিজাত্য রক্ষায় যত্নবান হওয়ার ফলে এই ধর্মের অবনতি ঘটে।কিন্তু হিসেব ক'রে দেখলে বলা যায় এ ধর্মের মৌলিক কতক গুলি বিষয় আজও প্রস্তরীভূত হয়ে পড়েনি।তা নানাভাবে লোকচিত্তে কাজ করে চলেছে। ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গান্ধীজী-রবীন্দ্রনাথের ভক্তি ও মানব সর্বতাবাদের আন্দোলনে জাত্যভিমানপুষ্ট রক্ষনশীল বিদায় নিয়েছে বলা যেতে পারে।অবশ্য এখন আবার ভিন্ন ধরণের অর্থবিদ্যাপুষ্ট মানবিকতা-বিরোধী শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, এর প্রকৃতি অর্থনীতিক-রাজনীতিক, মূলতঃ চারিত্রিকও বটে। এর সমাধানের প্রস্তুতি হয়ত সমাজের অভ্যন্তরেই চলছে, যেমন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জীবনাচরণ ও ধর্মাচরণের গ্লানি থেকে মুক্তির উপায় সমাজের অভ্যন্তরে প্রারব্ধ হয়ে নবধর্মের রূপে বিস্ফুরিত হয়েছিল।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যা ঘটেছিল তা দ্রুত এবং আকস্মিক। তবু তাঁর আবির্ভাবে যে অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক নয় তা আজকের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে অনুভূত হচ্ছে।মহাপ্রভুর পূর্বেকার সাহিত্যিক উপাদান গুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই এই নূতন লোকধর্মের আভাস দেখা যাবে। জয়দেব ভাগবতের অনুসরণ ক'রে অথচ নূতনভাবে কৃষ্ণলীলার বিন্যাস করলেন, যাকে বলা যেতে পারে মানবিক প্রীতি রসে ঈশ্বর দর্শন। দর্শন-স্মৃতির উচ্চমহলকে তিনি অবজ্ঞা করলেন। চন্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও দেখি ভূমিকায় ভাগবতের অনুসরণ ছাড়া রাধাকৃষ্ণ প্রনয়ের আরম্ভ থেকে বিকাশ পর্যন্ত একেবারে নূতনভাবে লৌকায়ত অধ্যাত্মের সংগঠন। হোক তা নানাস্থানে গ্রাম্য, তবু পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর তত্ত্বের উল্লঙ্ঘনই এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। চন্ডীদাসের অধিকতর প্রচলিত পদাবলীতে ঈশ্বরকে একেবারে

প্রেমভিক্ষুক মানুষ করে তোলা হল। বিদ্যাপতিতেও তাই। কিন্তু এ তো সাহিত্য। মানব চারিত্র্যের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট না হলে সে ধর্ম সাধারণের গ্রহণীয় হয় না। এ ব্যাপারটি সিদ্ধ হয়েছিল প্রথমতঃ সূফী মতাবলম্বী প্রেমিক সাধকদের স্মরণ নামকীর্তনাদি নৃত্যগীতে, ভাবপ্রকাশ এবং অশ্রু-কম্প-মূর্চ্ছাদি দর্শনে এবং দ্বিতীয়তঃ মাধবেন্দ্র পুরী এবং তাঁর শিষ্যবর্গের রাগাত্মিক ভক্তির প্রভাবে। মহাপ্রভুর আশ্চর্য প্রেমভক্তি প্রকাশের ভূমিকায় মাধবেন্দ্র পুরীই প্রত্যক্ষভাবে রয়েছেন। তিনিও ভক্তিধর্মে জাতিকুলাদি বিচারের উপরে ছিলেন। তাঁর শিষ্য ঈশ্বরপুরীই মহাপ্রভুকে সহজ রাগভক্তির পথে নিয়ে আসেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্‌লায় কৃষ্ণভক্তি এবং রামভক্তির সাংগঠনের সূত্রে দাক্ষিণাত্যের অ্যালবার ভক্ত সম্প্রদায়ের এমনকি তার পূর্ববর্তী প্রেমভক্তদের প্রভাবও নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। কবি জয়দেব তাঁর প্রনয় গীতি রচনায় যে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামৃত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এ তাঁদের রচনাবৈশিষ্ট্য থেকেই ধরা যায়। জয়দেব কিছুকাল নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরে কাটিয়েছিলেন শোনা যায়। সম্ভবতঃ তখন থেকেই দাক্ষিণাত্যের প্রীতিমূলক ভক্তিধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বর্তমান অন্ধ্র তামিলনাড়ু কেরল অঞ্চলে এই ধর্মের বহু সাধকদের সাধনক্ষেত্র ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি এবং নীলাচলে পৌঁছেই দাক্ষিনাত্য ভ্রমণের সংকল্প অর্থহীন নয়। তিনি বিশ্বরূপের সন্ধানে যাবেন বলে তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ স্নেহশীল পরিকরদের সম্মতি সহজে আদায় করেছিলেন। আর মনে হয়, নীলাচল অথবা বৃন্দাবন এদুয়ের কোনো একস্থানে তাঁর থাকবার সংকল্প জেনেই শচীদেবী নীলাচলকে নির্দিষ্ট করে দেন। সে যাই হোক, সহজ ধর্ম নিয়ে, দক্ষিন-দেশগুলির সঙ্গে বাঙ্‌লার একটা সম্পর্ক চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব থেকেই গড়ে উঠেছিল। চৈতন্যাবির্ভাবের সম্ভাবনায় সেকালকার রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যও বিবেচ্য। হুসেন শাহ সেকালকার শুধু শ্রেষ্ঠ প্রজানুরঞ্জক রাজাই ছিলেন না, তিনি ধার্মিক এবং হিন্দুধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুগত ধর্মের প্রতিবাদী এবং হিন্দু মুসলমানে ভেদ করে না এমন ধর্মের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। উচ্চপদে অবস্থিত সনাতন এবং রূপের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় তাঁর রাষ্ট্রে পুরন্দর খাঁ, কেশব খাঁ, মুকন্দ সরকার, গৌর মল্লিক প্রভৃতি বহু হিন্দু রাজকর্মচারী দায়িত্বশীল উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। হুসেন শাহ মহাপ্রভুর স্বেচ্ছাবিহারের আনুকূল্য করতে কোতোয়াল কাজিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।হুসেনশাহের সময় হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতিও যথেষ্ট ছিল।দেখা যায়, নবদ্বীপের কাজির সঙ্গে নবদ্বীপবাসীদের চাচা-নানা-মামা-ভাগিনা প্রভৃতি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হুসেন শাহ যে কামরূপ ও উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর সৈন্যরা যে দেবমন্দিরাদির ধ্বংস সাধন করেছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা যথার্থভাবেই রাষ্ট্রনীতিক প্রয়োজনের কথাই বলেছেন।(“ more political than religious”-History of Bengal) যাই হোক্ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে তৎকালীন বাঙ্‌লার রাষ্ট্রনীতিক অবস্থাকে

কিয়দংশে সহায়ক নিশ্চয়ই মনে করা চলে।

রাগাত্মিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে মধুর বা কান্তভাবে ভজনের শ্রেষ্ঠতা নির্দেশের কারণ হিসেবে কেউ কেউ বাঙলায় তান্ত্রিক ঐতিহ্যের নরনারী মিলিত সাধনার বিষয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মহাপ্রভু প্রদর্শিত এবং রায় রামানন্দ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত মধুর-রস পন্থার পূর্বাভাস দাক্ষিনাত্য ভক্ত-সম্প্রদায়ের, চৈতন্য-পূর্ব পদাবলীতে এমন কি ভাগবতেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া সুফী সন্ন্যাসীদের মধুরভাব আরোপ করে ঈশ্বর চিন্তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বাঙ্লায় যথেষ্ট ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম যেমন আভিজাত্য পুষ্ট ব্রাহ্মন্য ধর্মের প্রতিবাদ, তেমনি বিষয় লালসায় পূর্ণ তৎকালীন তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রতিবাদ এই বিষয়টি বুঝতে হবে।

এই নূতন সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে এই অমানবীয় বিদ্যাশক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে পূর্বে জনসমাজ পরিচিত ছিল না। নিঃসন্দেহে একে সামাজিক গ্লানি বলা চলতে পারে, আর যেহেতু জীবনাচরণে নীতিহীন অমানবীয়তাই অধর্ম, সেইহেতু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভূমিকায় এবং চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কথিত ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুন্থান নিরোধের জন্য ঈশ্বরস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবেই তত্ত্বাটিকে ঐ অবস্থায় সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে দেখা যায়। বৃন্দাবন দাস এই ভাবেই চৈতন্যাবতারের কারণ নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যে সমাজ-জীবনের এই অসহনীয় অবস্থাই অদ্বৈত আচার্যকে ঈশ্বরাবির্ভাব ঘটানোর জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত করেছিল।

আবার যদি খাঁটি ধর্মাচরণের দিক বিবেচনা করা যায় তাহলেও দেখা যায় তখনকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়েছিল যথেষ্ট। পূর্বে আমরা অনার্যমূল থেকে আগত এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশ্রিত লোক ধর্মের বা চন্ডী মনসা বাশুলী-জিয়াসিনী প্রভৃতি দেবতার কথা উল্লেখ করেছি। লৌকিক মত একটা বিধান সৃষ্টি করে ছাগ, মেষ, কুক্কুট মহিষ প্রভৃতির বলি দিয়ে নিতান্ত নিম্নবর্ণের মানুষ তাদের ধর্মপিপাসা পরিতৃপ্ত করত। এরকম নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ছাড়া এসব দেবতার নিত্যপ্রাপ্তি ছিল ভীতি-সম্ভম মিশ্রিত প্রণতি, মঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা। নৈসর্গিক দুর্বিপাক, রোগ, অকালমৃত্যু এবং শক্তিশালী মানুষের দ্বারা নিগ্রহ দুর্বল অবস্থার মানুষের ভয় উৎপাদন করত। কিন্তু দেবতা অপদেবতার পূজা মানত ভয়নিবারণ ও মঙ্গলদানের জন্য সংঘটিত হলেও এই সব মানুষের সঙ্গে এই সব দেবতার একটা সাধারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ধরা যাক প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক এবং সে সম্পর্ক সংস্কারে দাঁড়িয়ে যায়, ফলে এদের যাবতীয় জীবনাচরণ ঐ ধর্মবোধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।অথচ বিস্ময়ের বিষয় এইযে কাল ক্রমে ঐ ধর্মের

আশ্রয় থেকেও এই সব সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়। লোকধর্মের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখতে পাই এই ধর্মাচরণ নিম্নশ্রেনী থেকে ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীতে পরিগৃহীত হলে পর শিক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন উচ্চবর্নের লোকেরা পৌরাণিক কোনো না কোনো সূত্রের সঙ্গে এই সব দেবতার ইতিবৃত্ত যুক্ত করে এই দেবতা –অপদেবতাদের পূজার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যবর্তী করে মহিমা বৃদ্ধিরও প্রয়াস করেন এবং সেই ভাবে পূজাদি করে পরিতৃপ্ত হতে থাকেন।তাছাড়া মানত করে সিদ্ধিলাভ করলে অর্থ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা এই সব গ্রাম্য ও বৃক্ষ তলাশ্রয়ী দেবতাদের জন্য পাকা মন্দির মন্ডপ প্রভৃতি নির্মাণ ক'রে থাকেন। ধুমধাম সহকারে পূজা গাজন উৎসব নির্বাহ করতে থাকেন। ফলতঃ দেখা যায় যে সব দেবতা নিতান্ত সাধারণ মানুষের ছিল, তা ব্যাক্তি বিশেষের কুক্ষিগত হয়ে পড়ল এবং সাধারণ মানুষ শেষ সম্বল ধর্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ল এই হ'ল ধর্মের গ্লানি, সেই সঙ্গে সমাজেরও এই বিষয় লক্ষ্য করেই বৃন্দাবন দাস বলেছেন-"দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনও জনে" ।এ হল ভক্তিবিহীন অনুষ্ঠান, অন্যকে আহত করে এমন ঐশ্বর্য আড়ম্বর প্রকাশ করা। এই হ'ল ধর্মের গ্লানি মানুষের জীবনী থেকে ধর্মের বিকৃতি,জীবনাচরণের গ্লানির সঙ্গে একই সূত্রে এ যুক্ত। এরই ফলে যথার্থ ধর্ম দিয়ে মানুষকে রক্ষা করার জন্য শ্রীচৈতন্যের জীবনে এক আশ্চর্য লোকধর্মের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখা গেল। এ ধর্মে জাতিকুলের বিচার এবং ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের নির্দেশ নিতান্ত তিরস্কৃত হল। বৈষ্ণব সকলেই সমান কেউ উচ্চনীচ নয়। এই বিষয়টি প্রতিপন্ন করার জন্য মহাপ্রভু সমাজে নীচ এবং পতিত ব'লে ধিক্কৃত মানুষকেই ভক্তির অধিকারী বলে সবচেয়ে বেশী সমাদর দেখালেন। মুসলমান হরিদাসকে হরিভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধক বলে গণনা করলেন। কর্মসূত্রে এবং সম্ভবতঃ ধর্মসূত্রেও মুসলমান্ সমাজে আগত সুতরাং পতিত বলে গণ্য সনাতন-রূপকে বৃন্দাবনে এই নব ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে নিয়ক্ত করলেন। রায় রামানন্দ শূদ্র হলেও তাঁকে মহত্তম ব্রাহ্মণের অধিকারে অভিষিক্ত করে নীলাচলে তাঁর অন্তরঙ্গের স্থান দিলেন। এদিকে প্রেমিক শ্রীনিত্যানন্দ তাঁর নির্দেশে জাতিকুলের বিন্দুমাত্র বাছ-বিচার না করে বাঙ্লায় সকলকে এই প্রেমধর্মের অধিকার দিলেন।এতে অগণিত দীনহীন সাধারণ মানুষের মনুষ্যত্বলাভ হ'ল এবং আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হ'ল। যারা নিজের দেবতাকে একদিন হারিয়েছিল, তারা নূতন ভাবে আরও নিকটে,আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে দেবতাকে পেয়ে গেল। বিত্ত এবং বর্ণের কৌলীন্য বেশ কিছুকালের মত অর্থহীন হয়ে পড়ল। মহাপ্রভু কথিত "তৃনাদপি সুমীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" এই চরিত্র নির্দেশ সেকালের দুর্গত পতিতদের এবং সহনশীল নিম্নবর্নের মানুষকেই নির্দেশ করছে, তাদেরই যেন মর্যাদা দিয়েছে।

সমাজের এই নব অভ্যুথান শাস্ত্রসম্বল রক্ষণশীল সমাজ এবং ঐ বিত্তশালী গোষ্ঠী কর্তৃক অভিনন্দিত হয়নি সে কথা বলাই বাহুল্য। অদ্বৈত আচার্য যখন হরিদাস ঠাকুরকে

আশ্রয় দিয়েছিলেন এমনকি শ্রাদ্ধীয় অগ্রভাগ নিবেদন করে তাঁর মহিমা ঘোষনা করেছিলেন, তখন দৃঢ়ভক্তি সাধক বলেই তিনি প্রতিবাদে বিচলিত হননি।আবার মহাপ্রভুর শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্য কীর্তন এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দের জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রভৃতি নবদ্বীপের ব্রাহ্মন্য-শাসিত সমাজ মোটেই ভালো চোখে দেখেননি।এই সব ভাব দেখানোর বাড়াবাড়ি সহ্য করতে না পেরে তারা কাজীকে দিয়ে শাস্তিদানের আয়োজনও করেছিল। কিন্তু তখন জনজাগরণ ঘটে গেছে।মহাপ্রভুর নীলাচল আশ্রয়ের পর সহজ ভাবে ভাবুক প্রভু নিত্যানন্দ কর্তৃক ধর্ম বিস্তারের পালা। তারপর ষোড়শ শতকে একেবারে শেষের দিকে শ্রীনিবাস নরোত্তম এবং আরও বহু সাধক ও পদকর্তার প্রয়াসে এই লোকধর্মের চরম ব্যাপ্তি। ইতিমধ্যে বৃন্দাবনের রূপ সনাতন এবং বিশেষভাবে জীবগোস্বামীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্রের প্রনয়ানে ব্রাহ্মন্য শাস্ত্রের ও অমানবীয় অদ্বৈত দর্শনের কতকটা যৌক্তিক প্রতিবাদ গঠিত হয়ে রক্ষনশীলতার মর্মে আঘাত করেছে। অবশ্য একথা ঠিক যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এই সহজ লোকধর্ম নিজ শাস্ত্রের নিতান্ত অনুগত হয়ে পড়ায় গোস্বামিগণ আভিজাত্য রক্ষায় যত্নবান হওয়ার ফলে এই ধর্মের অবনতি ঘটে।কিন্তু হিসেব ক'রে দেখলে বলা যায় এ ধর্মের মৌলিক কতক গুলি বিষয় আজও প্রস্তরীভূত হয়ে পড়েনি।তা নানাভাবে লোকচিত্তে কাজ করে চলেছে। ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গান্ধীজী-রবীন্দ্রনাথের ভক্তি ও মানব সর্বতাবাদের আন্দোলনে জাত্যভিমানপুষ্ট রক্ষনশীল বিদায় নিয়েছে বলা যেতে পারে।অবশ্য এখন আবার ভিন্ন ধরণের অর্থবিদ্যাপুষ্ট মানবিকতা-বিরোধী শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, এর প্রকৃতি অর্থনীতিক-রাজনীতিক, মূলতঃ চারিত্রিকও বটে। এর সমাধানের প্রস্তুতি হয়ত সমাজের অভ্যন্তরেই চলছে, যেমন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জীবনাচরণ ও ধর্মাচরণের গ্লানি থেকে মুক্তির উপায় সমাজের অভ্যন্তরে প্রারব্ধ হয়ে নবধর্মের রূপে বিস্ফুরিত হয়েছিল।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যা ঘটেছিল তা দ্রুত এবং আকস্মিক। তবু তাঁর আবির্ভাবে যে অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক নয় তা আজকের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে অনুভূত হচ্ছে।মহাপ্রভুর পূর্বেকার সাহিত্যিক উপাদান গুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই এই নূতন লোকধর্মের আভাস দেখা যাবে। জয়দেব ভাগবতের অনুসরণ ক'রে অথচ নূতনভাবে কৃষ্ণলীলার বিন্যাস করলেন, যাকে বলা যেতে পারে মানবিক প্রীতি রসে ঈশ্বর দর্শন। দর্শন-স্মৃতির উচ্চমহলকে তিনি অবজ্ঞা করলেন। চন্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও দেখি ভূমিকায় ভাগবতের অনুসরণ ছাড়া রাধাকৃষ্ণ প্রনয়ের আরম্ভ থেকে বিকাশ পর্যন্ত একেবারে নূতনভাবে লৌকায়ত অধ্যাত্মের সংগঠন। হোক তা নানাস্থানে গ্রাম্য, তবু পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর তত্ত্বের উল্লঙ্ঘনই এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। চন্ডীদাসের অধিকতর প্রচলিত পদাবলীতে ঈশ্বরকে একেবারে প্রেমভিক্ষুক মানুষ করে তোলা হল। বিদ্যাপতিতেও তাই। কিন্তু এ তো সাহিত্য। মানব চারিত্র্যের

মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট না হলে সে ধর্ম সাধারণের গ্রহণীয় হয় না। এ ব্যাপারটি সিদ্ধ হয়েছিল প্রথমতঃ সূফী মতাবলম্বী প্রেমিক সাধকদের স্মরণ নামকীর্তনাদি নৃত্যগীতে, ভাবপ্রকাশ এবং অশ্রু-কম্প-মূর্চ্ছাদি দর্শনে এবং দ্বিতীয়তঃ মাধবেন্দ্র পুরী এবং তাঁর শিষ্যবর্গের রাগাত্মিক ভক্তির প্রভাবে। মহাপ্রভুর আশ্চর্য প্রেমভক্তি প্রকাশের ভূমিকায় মাধবেন্দ্র পুরীই প্রত্যক্ষভাবে রয়েছেন। তিনিও ভক্তিধর্মে জাতিকুলাদি বিচারের উপরে ছিলেন। তাঁর শিষ্য ঈশ্বরপুরীই মহাপ্রভুকে সহজ রাগভক্তির পথে নিয়ে আসেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্লায় কৃষ্ণভক্তি এবং রামভক্তির সাংগঠনের সূত্রে দাক্ষিণাত্যের অ্যালবার ভক্ত সম্প্রদায়ের এমনকি তার পূর্ববর্তী প্রেমভক্তদের প্রভাবও নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। কবি জয়দেব তাঁর প্রনয় গীতি রচনায় যে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামৃত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এ তাঁদের রচনাবৈশিষ্ট্য থেকেই ধরা যায়। জয়দেব কিছুকাল নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরে কাটিয়েছিলেন শোনা যায়। সম্ভবতঃ তখন থেকেই দাক্ষিণাত্যের প্রীতিমূলক ভক্তিধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বর্তমান অন্ধ্র তামিলনাড়ু কেরল অঞ্চলে এই ধর্মের বহু সাধকদের সাধনক্ষেত্র ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি এবং নীলাচলে পৌঁছেই দাক্ষিনাত্য ভ্রমণের সংকল্প অর্থহীন নয়। তিনি বিশ্বরূপের সন্ধানে যাবেন বলে তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ স্নেহশীল পরিকরদের সম্মতি সহজে আদায় করেছিলেন। আর মনে হয়, নীলাচল অথবা বৃন্দাবন এদুয়ের কোনো একস্থানে তাঁর থাকবার সংকল্প জেনেই শচীদেবী নীলাচলকে নির্দিষ্ট করে দেন। সে যাই হোক, সহজ ধর্ম নিয়ে, দক্ষিন-দেশগুলির সঙ্গে বাঙ্লার একটা সম্পর্ক চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব থেকেই গড়ে উঠেছিল। চৈতন্যাবির্ভাবের সম্ভাবনায় সেকালকার রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যও বিবেচ্য। হুসেন শাহ সেকালকার শুধু শ্রেষ্ঠ প্রজানুরঞ্জক রাজাই ছিলেন না, তিনি ধার্মিক এবং হিন্দুধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুগত ধর্মের প্রতিবাদী এবং হিন্দু মুসলমানে ভেদ করে না এমন ধর্মের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। উচ্চপদে অবস্থিত সনাতন এবং রূপের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় তাঁর রাষ্ট্রে পুরন্দর খাঁ, কেশব খাঁ, মুকন্দ সরকার, গৌর মল্লিক প্রভৃতি বহু হিন্দু রাজকর্মচারী দায়িত্বশীল উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। হুসেন শাহ মহাপ্রভুর স্বেচ্ছাবিহারের আনুকূল্য করতে কোতোয়াল কাজিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।হুসেনশাহের সময় হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতিও যথেষ্ট ছিল।দেখা যায়, নবদ্বীপের কাজির সঙ্গে নবদ্বীপবাসীদের চাচা-নানা-মামা-ভাগিনা প্রভৃতি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হুসেন শাহ যে কামরূপ ও উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর সৈন্যরা যে দেবমন্দিরাদির ধ্বংস সাধন করেছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা যথার্থভাবেই রাষ্ট্রনীতিক প্রয়োজনের কথাই বলেছেন।(“ more political than religious”-History of Bengal) যাই হোক্ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে তৎকালীন বাঙ্লার রাষ্ট্রনীতিক অবস্থাকে কিয়দংশে সহায়ক নিশ্চয়ই মনে করা চলে।

রাগাত্মিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে মধুর বা কান্তভাবে ভজনের শ্রেষ্ঠতা নির্দেশের কারণ হিসেবে কেউ কেউ বাঙলায় তান্ত্রিক ঐতিহ্যের নরনারী মিলিত সাধনার বিষয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মহাপ্রভু প্রদর্শিত এবং রায় রামানন্দ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত মধুর-রস পন্থার পূর্বাভাস দাক্ষিনাত্য ভক্ত-সম্প্রদায়ের, চৈতন্য-পূর্ব পদাবলীতে এমন কি ভাগবতেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া সুফী সন্ন্যাসীদের মধুরভাব আরোপ করে ঈশ্বর চিন্তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বাঙ্লায় যথেষ্ট ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম যেমন আভিজাত্য পুষ্ট ব্রাহ্মন্য ধর্মের প্রতিবাদ, তেমনি বিষয় লালসায় পূর্ণ তৎকালীন তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রতিবাদ এই বিষয়টি বুঝতে হবে।

কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রূপ ও স্বরূপ

খ্রীঃ ১২৫০ থেকে ১৩৫০ মধ্যে বহু সূফী দরবেশ ভারতে তথা বাঙলায় অনুপ্রবিষ্ট হন। সূফীরা (সূফ=কম্বল=কম্বলধারী ফকির দরবেশ) ব্যাপকভাবে ইসলামী হলেও অধ্যাত্ম-সাধনায় পৃথক পথের যাত্রী। আল্লাহের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক-মূলক ভাব-সাধনা এঁদের ধর্মের বৈশিষ্ট্য। এদিক দিয়ে ভারতীয় ভাব-সাধক, বিশেষে বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁদের সাধনার অন্তরঙ্গতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সূফীদের মধ্যেই সম্ভবত নবম-দশম শতাব্দী থেকে পারস্যে ইউসুফ ও পরকীয়া নায়িকা জুলেখার ঈশ্বরীয় ভাবমূলক প্রণয়কাহিনী গ'ড়ে ওঠে। লোকমুখ থেকে গ্রহণ ক'রে কবি ফিরদৌসী একে সাহিত্যিক রূপে প্রকাশ করেন ব'লে জনপ্রবাদ। সে যাই হোক, খ্রীঃ তেরো-চোদ্দ শতাব্দীতে সূফী আউলিয়ারা বাঙলায় অবস্থিতি করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মুখ থেকে এই কাহিনী বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ে। ইতিবৃত্তে পাই কাহিনীটিকে বাঙলা কাব্যরূপ দেন শাহ মহম্মদ সগীর। যদি তা-ই হয় তা'হলে নিগূঢ় ধর্মীয় সাধনার প্রচারধর্মী চর্যাগীতিকার পর সগীরের – এই প্রণয়কাব্য কাহিনীকেই বাঙলায় রচিত প্রথম সাহিত্যিক কাব্য বলতে হবে। নপুংসক পোতিফারের পত্নী জুলেখার সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ হবার পর বিরহের মধ্য দিয়ে উভয়ের প্রণয় কতদূর প্রগাঢ় হয়ে ওঠে এবং জুলেখার বিরহমূলক আক্ষেপ কতদূর ব্যাপক হয় তার বর্ণনা উক্ত কাব্যে পরিবেশিত হয়েছে।

ইউসুফ-জুলেখার প্রণয়কাহিনীর ইঙ্গিত ধ'রেই যে বড়ু(=অবৈধ প্রণয়ী) আখ্যায় সাধারণ্যে পরিচিত আদি চণ্ডীদাস তাঁর বিখ্যাত রাধাকৃষ্ণ প্রণয়কাহিনীর পরিকল্পনা করেন তা তাঁর 'কৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রচারিত কাহিনী-কাব্যটির অন্তর্মুখ প্রমাণ থেকে বোঝা যায়। কৃষ্ণকীর্তনের রাধাও বিবাহিতা এবং তার স্বামী অভিমন্যু (=আইহন) পোতিফারের মতই নপুংসক রূপে কল্পিত ('নপুংসক আইহনের রাণী')। কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধিকা-কৃষ্ণের ক্ষণস্থায়ী মিলন ও অপার বিরহের সঙ্গেও ইউসুফ-জুলেখা কাহিনীর মিল রয়েছে। উভয়

রচনার পিছনেই ধর্মের ছায়া লক্ষণীয়। ধর্মানুগত হওয়ার জন্যই কৃষ্ণকীর্তনকারকে সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে প্রাথমিকভাবে সামঞ্জস্য ক'রে নিয়ে কাব্যটির উপস্থাপনা করতে হয়েছে। যদিচ আদিতে ও মধ্যেও যৎকিঞ্চিৎ পৌরাণিক অনুসৃতি থাকলেও কাহিনী ও কাব্য-নির্মাণের দিক দিয়ে কৃষ্ণকীর্তন একান্তভাবে মৌলিক রচনা, কবিহৃদয়ের স্বকীয় কল্পনা থেকে উৎসারিত। এতে বৃন্দাবন, মথুরা, যমুনা, যশোদা, নন্দ, কংস প্রভৃতি ভাগবতীয় উপাদান সবই আছে , কিন্তু এর কাহিনী কবিকল্পিত একেবারে নবরীতির। এই কারণেই চন্ডীদাসকে বঙ্গীয় মৌলিক রাধাকৃষ্ণ-লীলার আদিকবি ও মুখ্য কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

'কৃষ্ণকীর্তন' নামের উক্ত রাধাকৃষ্ণের নবপ্রণয়লীলা সংবলিত কবিতা-গ্রন্থটি সুপ্রাচীন পুঁথিরূপে সহসা আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কর্তা তথা সম্পাদক ৺বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎ-বল্লভ। এর দ্বিতীয় পুঁথি পাওয়া যায় নি। হয়ত বা এ বিষয়ে তেমন কোনও উদ্‌যোগও নেওয়া হয়নি। পুঁথিটি কবির স্বহস্ত-লিখিত নয়, অনুলিপিকারের লিখিত এবং পালাগায়কের ব্যবহৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাব্যটির যে ভাষাপরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে পালাগায়কদের হাত তেমনি পড়েনি। এ ব্যাপারে পরিস্থিতি হ'ল এই যে কবিরা স্বচ্ছন্দ্যে কাব্য লিখে যান, সৃষ্টি ভালো হলে কাহিনীকাব্যকে পালাগীতের পর্যায়ে ফেলা হয়, মুলগায়েন এখনকার দিনের সিনেমার প্রযোজকদের মত নির্দেশসহ গুছিয়ে নিয়ে রাজসভায় বা সাধারণের সভায় গান ক'রে অর্থাদি লাভ করেন। কৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও প্রযুক্তির জন্য এক একটি কাহিনী বর্ণনার আগে কার কার সঙ্গে সংলাপ হচ্ছে তার নির্দেশ এবং ঘটনার নির্দেশ দিয়েছেন। মূল নির্দেশটি সংস্কৃত শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। সংলাপ কিভাবে হচ্ছে,, ক'জন পাত্র-পাত্রী রয়েছেন তা জানাতে দন্তক, চিত্রক, প্রকীর্শক, লগনী এইসব পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। আবার, কাহিনীমূলক কৃষ্ণকীর্তন গীতিনাট্যে পরিবেশিত হয়েছিল ব'লে পালাগানের নিয়ম অনুযায়ী গায়ক 'ধ্রুব' চিহ্ন লিখে গানের মধ্যেকার কোন্ কলিটি দোহারেরা ভাবের আবেদনের দিক থেকে তাঁর গানের সূত্র ধ'রে বারংবার গাইবেন ও কবি-অভিপ্রায়ের সম্পূরণ ঘটাবেন তারও নির্দেশ দিয়েছেন। এইভাবে পালাগায়কের ব্যবহার করা পুঁথি হলেও এবং গায়েনের প্রয়োজনীয় কিছু কিছু যোজনা থাকলেও কবির মূল রচনার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন যে ঘটেনি তা কাব্যটি প'ড়ে দেখলেই বোঝা যায়। আর, কাব্যটি যে একই কবির রচনা তা সুনিশ্চিতভাবে ধরা যায় যখন এক এক অধ্যায়ের কাহিনীতে পূর্ব অধ্যায়ের সূত্র টানা হয়েছে দেখা যায়। অতএব, কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের দু একটি পৃষ্ঠা মাঝে মাঝে খন্ডিত অর্থাৎ বিনষ্ট দেখা গেলেও কাব্যের মূল অবয়ব ঠিকই

আছে। মূল কবির ভাষারও ইতর-বিশেষ তেমন ঘটেনি। মনে হয় পালাগানের কাজ কবির কাব্যলেখার খুব বেশী পরেকার নয়। স্থানে স্থানে স্বল্প পরিবর্তন দেখা গেলেও আদ্যন্ত কবিভাষা ঠিকই সংরক্ষিত আছে। রাধার বিরহ-বিলাপের অংশ, যা পরে গায়কমুখে বেশি ব্যবহৃত হয়েছিল তাতেও মূল কবির ভাষার চিহ্ন অনেকটাই রক্ষিত হয়েছে এবং কাব্যটিরও প্রাচীনত্ব প্রমাণ করছে। তবে স্থানে স্থানে ভণিতা অংশে চন্ডীদাসের 'বড়ু' বিশেষণ যে পালাগায়কদের প্রযুক্ত তাতে সন্দেহ নেই। রজকিনীর সঙ্গে প্রণয়ের ব্যাপারও এই কারণে সত্য ঘটনা ব'লেই প্রমাণিত হচ্ছে। সাঁওতালী ভাষায় বড়ু শব্দের অর্থ হ'ল চপল প্রণয়ী বা অবৈধ প্রণয়ী।

ভাষাতাত্ত্বিক ও লিপিবিৎ পন্ডিতদের অনুমানে কাব্যটি যে ১৪০০ খ্রীঃ এর কাছাকাছি – কোনও সময়ে লেখা হয়েছিল, তাতে সন্দেহের কিছু মাত্র নাই। আর প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ পাওয়া যায় – তাও অমূলক মনে হয় না। মনে হয় না বিশেষভাবে এই কারণে যে বিদ্যাপতি পূর্বজীবনে অবহট্ট (=অপভ্রংশ+ক্ত) ভাষায় রাজমহিমা ও শিবপার্বতী বিষয়ে কাব্য-কবিতা লিখে পরজীবনে প্রচলিত দেশভাষাতেই রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলা নিয়ে যে গীতিকাব্য রচনা করলেন তা চন্ডীদাসের প্রভাবে এমন হওয়া খুবই সম্ভবপর। যদিও বিদ্যাপতির-কাব্যে চন্ডীদাসের মত রাধাকে প্রথমে বিরাগিণী এঁকে পরে যেভাবে গভীর অনুরাগিণী ক'রে তোলা হয়েছে তার অনুসরণ নেই,, বরং সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের রীতি অনুসারে প্রথমে পূর্বরাগ চিত্রিত ক'রে পরে বিপ্রলম্ভ ও অন্যান্য বিকাশ দেখানো হয়েছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণকীর্তনে অঙ্কিত পরকীয়া বিবাহিতা নায়িকাকে প্রথমে বিরাগিণী এবং পরে ধীরে ধীরে অনুরাগিণী ক'রে দেখানো এটাই তো বাস্তব পরিস্থিতি। অথচ কৃষ্ণকীর্তনকার রাধিকার লৌকিক পরিস্থিতির স্বাভাবিক বর্ণনা দিলেও তাঁর পূর্বজন্মের দেবীত্ব অর্থাৎ লক্ষ্মীস্বরূপতার বিষয়টি কাহিনীর ভূমিকায় তা ধরিয়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক দিক সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন দেখা যায়।

কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পূর্বেকার সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ ট্র্যাডিশান খুঁজলে দেখা যায় অব্যবহিত পূর্বেকার রচনা জয়দেবের গীতগোবিন্দে কাহিনীশূন্য রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার বর্ণনা রয়েছে। তার স্বল্প কিছু আগেকার লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতের মধ্যে দু'একটি স্থানে মাত্র আছে , দাক্ষিণাত্যের আলোয়ারদের গীতে নায়িকা এমনকি মুখ্য নায়িকাও আছে, কিন্তু রাধার নাম নেই। আর এবিষয়ে প্রধান পুরাণকীর্তি শ্রীমদ্‌ভাগবতেও রাধার নাম নেই, যদিচ গোপীসহ রসাদি লীলাবর্ণের মধ্যে প্রধানা নায়িকা হিসাবে এক

গোপীকে দেখা যায়। এইভাবে অধ্যাত্মলীলাকাব্যে রাধার উল্লেখ না থাকলেও লৌকিক প্রণয় -কাহিনীতে ও তাই নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে লেখা সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতায় রাধার উল্লেখ দেখা যায়। স্পষ্ট বুঝা যায় বিচ্ছিন্ন সংস্কৃত-প্রাকৃত কবিতাগুলি একটি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত মূল কাহিনী অনুসারেই লেখা। সে কাহিনী আদ্যন্ত সুগঠিত সাহিত্যের রূপ পায়নি , তবু লোকমুখে বিশেষভাবে শোনা যেত। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ ছিলেন এক আভীর গোপযুবক ও রাধা ছিলেন তাঁর প্রণয়িনী , কিন্তু অন্যের পূর্ব-পরিণীতা ছিলেন না। ব্রহ্মবৈবর্ত পূরাণেও যে রাধায় পরিচয় আছে তাতে রাধার পরকীয়াত্ব নেই। কৃষ্ণকীর্তনকার ঐ লৌকিক কাহিনী গ্রহণ করেছেন, পৌরাণিক কৃষ্ণের সঙ্গে তার যোগসাধন করেছেন এবং দেখিয়েছেন পূর্বপরিণীতা এক কিশোরীর সঙ্গে তার প্রণয় স্বাভাবিক কোন উপাঘটে ও পরিণামেধাকে কিভাবে বিরহ ভোগ করতে হয়। এই পরিকল্পনা আমাদের কবি ইউসুফ জুলেখার কাহিনী থেকেই গড়ে তোলেন তার পরিস্ফূট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। পরিশেষে বলতে চন্ডীদাসের এই সুবৃহৎ কাব্যের পরিকল্পনার মূলে তিনটি উপাদান কাজ করেছে – ভাগবতপুরাণ, লৌকিক আভীর গোপ-গোপী কৃষ্ণ রাধার কাহিনী এবং ইউসুফ জুলেখার কাহিনী। বাঙলার প্রথম ইউসুফ-জুলেখার কাব্য রচনা করেন শাহ মহম্মদ সগীর। তিনি চন্ডীদাসের সমকালীন হতেও বা পারেন। না হলেও কাহিনী তো সূফীদের মধ্যস্থতায় লোকমুখে প্রচলিতই ছিল।

খ্রীঃ ১৫১০ এর পর থেকে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধর্মের আন্দোলনে ভাগবতপুরাণের সঙ্গে জয়দেব বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের ভূমিকা অপরিসীম মর্যাদা লাভ করে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য এঁদের পদ আস্বাদন ক'রে তাঁর স্বকীয় কৃষ্ণবিরহে সান্ত্বনা পেতেন ব'লে চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত হয়েছে। রূপ ও সনাতন গোস্বামী চন্ডীদাস প্রদর্শিত দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন, রূপগোস্বামী তাঁর নিজ কাব্যকবিতায় এসবের অনুসরণও করেছেন। তাঁদের রাধাকৃষ্ণ –ভাবনায় পরকীয়া রতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করে তাঁরা প্রেমভাবনায় পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর উৎকর্ষের সম্ভবনা সূচিত করেছেন। একজনের পরিণীতা নারী অন্যপুরুষের প্রতি বিরাগিনী থাকতেন এই স্বাভাবিক পরিস্থিতি ধ'রে নিয়ে বহু ঘাত প্রতিঘাত চিত্রিত করার পর অর্থাৎ দানখন্ড, নৌকাখন্ড, তাম্বুলখন্ড, হারখন্ড, ভারখন্ড, যমুনাখন্ড, বংশীখন্ড প্রভৃতি ঘটনা নির্মাণের পর রাধাকে ধীরে ধীরে কিভাবে কৃষ্ণানুরাগিণী করলেন তার মৌলিক পরিকল্পনার গৌরব এই আদি চন্ডীদাসের। অথচ চন্ডীদাস তো শাস্ত্রবিরোধী ব্যাপার ঘটান নি। তিনি এইমাত্র দেখিয়েছেন যে রাধা পূর্বজন্মে নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মীই ছিলেন, কিন্তু মানুষজন্ম

পরিগ্রহ ক'রে সব ভুলে গেছেন। কৃষ্ণ তা মনে রেখেছেন এবং এগারো-বারো বৎসরের রাধাকে দেখেই চিনে ফেলেছেন নিজ পূর্বপত্নী ব'লে। কৃষ্ণও মানুষজন্ম নিয়েছেন অথচ নিজশক্তি বলে পূর্বস্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে যে পেরেছেন, লৌকিক দিক থেকে এই সামান্য অস্বাভাবিকতা কবিকে স্বীকার করতেই হয়েছে। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণকীর্তনে লৌকিকতা ও ধর্মীয় পৌরাণিকতার মিশ্রণই লক্ষণীয় হয়েছে। চৈতন্য-প্রদর্শিত নব ভাবধর্ম অনুযায়ী রাধা জন্মাবধি কৃষ্ণানুরাহিনী। কাব্যকলা হিসাবে বিরাগিণী বর্ণনার যৌক্তিকতা তাঁরা মেনে নেননি। এরই কারণে এই বড়ূ আখ্যার আদি চন্ডীদাসের দানলীলা, নৌকালীলা ও রাধাবিরহের অপূর্ব পদগুলি বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হলেও সমগ্রভাবে কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আস্বাদন বা অনুসরণ – অচল হয়ে পড়েছিল। কথা এই যে, আদি নির্মাণের সঙ্গে পরবর্তী বিকাশস্তরে আনুপূর্বিক মিল নাও থাকতে পারে। আর সেজন্য পূর্বসূরীর প্রাপ্য গৌরবের হানি ঘটার সম্ভাবনা তো হতে পারে না। যাই হোক, চন্ডীদাসের কাব্যের আস্বাদনে শ্রীচৈতন্যে তেমন কোনও বাধা করেন নি, অথচ হয়ত অতিমাত্রায় শুদ্ধতার পক্ষপাতী পরবর্তী বৈষ্ণব আচার্য্যেরা ও আধুনিক তাত্ত্বিকদের কেউ কেউ কাব্যিক প্রয়োজনে রাধার বিরাগিনী অবস্থার চিত্রণ সহ্য করতে পারলেন না। ধর্মের দিক থেকে যাই হোক, কবিকৃতি ধ'রে আদি চন্ডীদাসের দিকে দৃকপাত করলেন না, নাসিকা কুঞ্চিত ক'রেই রইলেন। বৈষ্ণব প্লাবনের পরবর্তীকালে সহজিয়া 'পিরিতি' – উপাসকের এক সম্প্রদায় এই চন্ডীদাসকে তাঁদের নিজ ধারণার সপক্ষীয় গুরু ব'লে বরণ করেছেন দেখতে পাই। অথচ চন্ডীদাস যে মানুষী কামতত্ত্ব-দেহতত্ত্বেরই শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শক ছিলেন এমন কথা তো তাঁর শত্রুও বলতে পারবে না। দেখা যায়, এঁদের মধ্যে আবির্ভূত 'পিরিতি'-সাধক কোনও কবি চন্ডীদাসের ভণিতা লাগিয়ে সহজিয়া তত্ত্বের কবিতা লিখেছেন। এর আগে অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবুকতায় সম্পূর্ণ আবিষ্ট চন্ডীদাস নামের উল্লেখ্য আর এক কবির রচনাও আমরা পেয়ে থাকি। নিজকে 'বড়ু' আখ্যার চন্ডীদাস থেকে পৃথক ব্যক্তি ব'লে পরিচায়িত করার জন্য 'দ্বিজ' ভবিতা দিয়ে পূর্বরাগ, অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের বহু প্রসিদ্ধ পদ তিনি রচনা ক'রে গেছেন দেখতে পাই। এই ভাবেই আদি চন্ডীদাসের কাহিনীমূলক নাট্যগীতিকাব্যের প্রসার রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। আদি চন্ডীদাস কেবল ছাত্রদের ও আমাদের কাব্যতাত্ত্বিক বিচারের মধ্যেই যতটা পারেন আত্মরক্ষা করছেন। যাই হোক্ এখন কাব্য-দেহের কাছাকাছি যাওয়া যাক।

কবি বড়ু চন্ডীদাস কাব্যরচনা করেছিলেন, সঙ্গীত নয়। এটি একাধারে পুরাণ ও লৌকিক কাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত কাব্য। মধ্যযুগের বহু রচনাই যেমন পালাগীতে প্রযুক্ত

হয়েছিল তেমনি কৃষ্ণকীর্তনও হয়েছিল। তার নানান্ চিহ্ন প্রাপ্ত পুঁথিটি বহন করছে। এর কবিতাগুলির ছন্দ অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির এবং আট, ছয়, দশ যতিবিভাগের বিভিন্ন চরেণ ও স্তবকে বিচিত্র। সব মিলিয়ে আমরা মনে করি, যতি-পর্ব সহ চরণবন্ধন যেমনই হোক না কেন, সমস্ত কাব্যটি চারচরণের স্তবকে বদ্ধ হয়ে ৪x৪ এর ষোল চরণের এক একটি কবিতায় পরিবেশিত হয়েছিল। এর কমবেশি যা দেখা যায় তা পালাগায়কদের সংক্ষেপ বা বিস্তার। গীতগোবিন্দের নিয়মিত আট চরণের ও চর্যাগীতির দশচরণের কাব্যবন্ধ তুলনায় বিচার্য। চরণান্ত মিল ধ'রে কবিতাগুলির স্তবক কখনও দুই চরণের কখনও চার চরণের। দুই চরণের ক্ষেত্রে অবশ্য ৮x২=১৬ চরণে কবিতার সমাপ্তি ধরতে হবে। কবিতাগুলির মধ্যে যোজিত 'ধ্রু' চিহ্নিত বহু অংশ যে পালাগায়কদের এবং ভাববিস্তার সহ শ্রোতাদের চিত্তে আবেগ-সঞ্চারের জন্য প্রযুক্ত তা কবিতা গুলির ভাব পরীক্ষণের সাহায্যেই বোঝা যায়। কবি নিশ্চয়ই একই কথার বারংবার পুনরুক্তি করেননি। এগুলি বর্জন করলেই চন্ডীদাসের কাব্যনির্মাণের ফর্ম বা রীতিটি ধরা যাবে। আর দেখা যাবে যে ঐ ধ্রু-চিহ্নিত অংশগুলি ছন্দো নির্মাণে যেমন পৃথক , তেমনি অর্থের যৌক্তিক পারম্পর্য রক্ষার প্রতি উদাসীন। এগুলি মূল কবিতার অতিরিক্ত অংশ। পালা গায়কেরাই ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করেছেন এবং গীতিনাট্যের প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কয়জনের উক্তি বা অন্য বিশেষ কিছু বোঝাতে 'প্রকীপ্লক' 'দন্ডক' 'লগনী' প্রভৃতি নির্দেশ ব্যবহার করেছেন। 'ধ্রু' চিহ্নিত কয়েকটি কবিতা পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। বোঝা যাবে যে এগুলি মূল কবিতার অতিরিক্ত যোজনা –

(ক)

হাটদান বাটদান লৈলোঁ রাজঘরে।
তেকারণে আইলোঁ মোঁএ যমুনার তীরে।।
নিতি নিতি যাহা তোহ্মে মথুরা নগরে।
সব সুবিধান দান দেহত আহ্মারে।। ১।।
দিবেহেঁ দধির দান সুনহ গোআলিনী।
কংসের বিষয়ে আহ্মে হইএ মহাদানী।। ধ্রু।।
দেহ দধি ঘৃত দান যত হএ লেখে।
পসারের দান দিআঁ যাহা একে একে।।
ইত্যাদি – দানখন্ড

এখানে চতুর্থ চরণের পর সপ্তম চরণ পাঠ করলেই অর্থসংগতি রক্ষিত হয়।

সপ্তম পঙক্তির ‘দেহ দধি ঘৃত দান’ প্রভৃতির পূর্বে ‘দধির দানে’র উল্লেখ কবিকৃত হতে পারে না।

(খ)

বদন কমল তোর যবেহেঁ দেখিলোঁ।
তবেঁ হৈতেঁ রাধা তোতে মন দিলোঁ।।
আঅর দেখেলোঁ নাসা গরুড় সমান।
গিধিনীসদৃশ তোর দেখোঁ দুই কান।। ১।।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল দেব কান।
সব কলা সংপুনী তোঁ দেহ মধু পান।। ধ্রু।।
কুরঙ্গনয়ন জিনী তোহ্মার নয়নে।
আধর বান্ধুলী গন্ড মধুক সমানে।।
মাণিক জিনিআঁ তোর দশনের পাঁতী।
কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁতী।।২।।
ইত্যাদি – দানখন্ড

পদটিতে দেখা যায়, রাধিকার সম্মুখেই কৃষ্ণ তার দেহসৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে তার চিত্তে রতিভাব ও কৃষ্ণানুরাগ জন্মানোর প্রয়াস করছেন। ১ চিহ্নিত স্তবকে কানের বর্ণনা এবং ২ চিহ্নিত স্তবকে চক্ষু ও দন্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মধ্যবর্তী ‘ধ্রু’ অংশে এই ক্রমের অসংগত ছেদ ঘটেছে। ঐ পদটিতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনার শেষে এরকম সার নিষ্কর্ষ গ্রথিত হলেই যেন শোভন ও সঙ্গত হয়। তা ছাড়া চতুর্থ চরণের ও পঞ্চম চরণের শেষে একই শব্দ (‘কান’) সুকবির নির্মাণ কিনা সন্দেহ। সুতরাং অনুমান এই যে গায়ক ঐ পদটির সারস্বরূপ ‘তোর রূপ যৌবনে’ ইত্যাদি গ্রথিত ক’রে ‘ধ্রু’ হিসেবে স্থাপন করেছেন।

(গ)

কোণ আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠি আয়র উঝঁট না মানিলোঁ।।
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞঁর শিআল মোর ডাহিনে জাএ।।১।।
বাঁশীত লাগিআঁ মোর কি ভৈল বড়ায়ি।
আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ।। ধ্রু।।
কথা দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।

হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী।।

ইত্যাদি – বংশীখন্ড

এই পদে ক্রমানুসারে একাধিক দুর্ণিমিত্ত বর্ণিত। "ধ্রু" চিহ্নিত অংশের ক্রমভঙ্গ কবির অভিপ্রেত হতে পারে না।

(ঘ)

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিন্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।।
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ মো সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচূর।।১।।
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান।
আপনার দৈবদোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন।। ধ্রু।।
মুন্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর।।
যবে কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআঁ মো খাইবোঁ গরলে।।২।।

ইত্যাদি – বংশীখন্ড

এখানে বিরহদুঃখে শ্রীমতী কী কী করবেন তার বিবরণ রয়েছে। সর্বত্র ভাবিকালের ক্রিয়াপদ। মধ্যবর্তী "ধ্রু" চরণদ্বয়ে ভাব ও বর্ণনাক্রমে অসঙ্গতি স্পষ্ট।

(ঘ)

সরস বসন্ত কালে।
কোকিলের কোলাহলে।
এ নআ যৌবন কাহ্নঞি প্রাণ রে।।
এবেঁ তোহ্মার বিরহে।
মোর আকুল দেহে।
আহ্মাক তেজিতেঁ তোর উচিত নহে।।১।।
নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নঞিঁ তোহ্মার মাউলানী।
তোর মোর নেহ সব দেব লোকেঁ ভালে জানী।। ধ্রু।।
আছিলোঁ মো শিশুমতী।
না বুঝিলোঁ সুরতী।
তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী।।

ইত্যাদি – রাধাবিরহ

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে উদাহৃত অংশে ধ্রুবপদের ছন্দঃ পদ্ধতি সমগ্র পদের ছন্দঃপদ্ধতি থেকে ভিন্নতর। এরকম অনেক ক্ষেত্রেই। নিম্নলিখিত দীর্ঘ ত্রিপদী অংশের "ধুর" যে পালাগায়কের গ্রথিত এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ এ কাব্যের প্রথম পাঠকেরও থাকতে পারে না।

(ঙ) মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে
ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ।
এঁবে নানা ফুলেঁ মোঞঁ সেজা বিধাইআঁ
কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ রাএ।। ১।।
আল হের (বড়ায়ি)।
কাহ্নাঞিঁ মোরে আনিআঁ দে।
আল পরাণের বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ মোকে আনিআঁ দে।। ধ্রু।।
বিরহসাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি
এহাত কেমনে হয়িব পার।
ইত্যাদি – রাধাবিরহ

আবার যে পদে "ধ্রু" যোজিত হয়েছে সেখানে চারটির বেশি স্তবক কদাচিৎ থাকলে বেশি একটি দুটি স্তবক প্রক্ষিপ্ত ব'লে আমাদের ধারণা। ভাবসঙ্গতি বিচার ক'রে এই ধারণায় আসতে হয়। যেমন ধরা যাক রাধাবিরহের নিম্নলিখিত পদটি –

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
সে দিগে কি বসন্ত না জানী।। আল।। - ইত্যাদি

এতে স্তবক সংখ্যা ৫, অথচ "ধু" রয়েছে। আমাদের ধারণায় এর চতুর্থ স্তবক অর্থাৎ "পীন কঠিন উচ তনে" প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত। দেখতে হবে, সমস্ত পদটিতে যে ধরণের বিরহব্যাকুলতা প্রকাশিত তাতে দেহরতি-অভিলাষের কোনও স্থান নেই। সাধারণভাবে 'রাধাবিরহ' অংশেই দেহবাসনার অবকাশ অতি স্বল্প। কৃষ্ণকীর্তনে "আল রাধা" "আল বড়ায়ি গো" "হে হে লহে লহে" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতোচিত পাদপূরণের অংশ বা আখর যেমন গায়কের তেমনি ঐ সব অংশও গায়কের। বলা যেতে পারে "ধ্রু" এক একটি "ধ্রু" অংশ এক একটি পদের আবেগমন্ডিত ভাবসার নির্দেশ। এরকম সারাংশ

গ্রন্থন কবিকৃত না হওয়াই সম্ভব।

ডঃ . তারাপদ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির 'তোলাপাঠ' এবং সম্পাদকধৃত পাঠের আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে তোলাপাঠ এবং কাটা ও লেখাগুলি সর্বত্র মূল পাঠ থেকে উন্নত হয়নি। আবার সম্পাদক বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সমুচিত বিবেচনা করে যে পাঠ নিজ কল্পনা অনুযায়ী বিহিত করেছেন তাও সর্বত্র সুসংগত নয়। লিপিকার লিখিত মূল পুঁথির পাঠ সংশোধন করে অন্য বিশ্বাসযোগ্য পুঁথি ধরে কেউ প্রাপ্ত পুঁথির সংস্কারে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন নানা কারনেই এমন কথা ভাবা যায় না, ডঃ. মুখোপাধ্যায়ের এ সিদ্ধান্ত সমীচিন। কিন্তু আমাদের অনুমান আসলে যা ঘটেছিল তা হচ্ছে এই। ষোড়শ শতাব্দীর কোনো ব্যক্তি যিনি ঐ পুঁথির অধিকারী ছিলেন তিনি উল্লেখযোগ্য কোনো গায়কের পালাগান শুনে এমনকি হয়ত তাঁর পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে ঐ সংশোধনগুলি করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ভালোপাঠ মন্দপাঠের বিচার না ক'রে যা শুনেছেন তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কিন্তু কৃ-কীর পুঁথি যে একাধিক ব্যক্তির ব্যবহৃত তারও প্রমাণ তিন সংখ্যাচিহ্ন লিখতে গিয়ে ভালো হাতের তিন এবং কুন্ডলী পাকানো তিনের চিহ্ন। বিকৃত তিন চিহ্নটি যিনি লিখেছেন নিশ্চয়ই তাঁর হাত কাঁপত। সম্পাদক বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পদগুলির গীতরীতিকে ঝুমুর ব'লে অভিহিত করেছেন। কিন্তু রাগের নির্দেশ থাকায় বুঝা যায় গীতসমূহ বিচিত্র সুরেই গাওয়া হ'ত। আরও বুঝা যায় যে কীর্তন তখনও সমাজে প্রচলিত হয়নি। শ্রীচৈতন্যকে সংকীর্তন প্রবর্তক ব'লে অভিহিত করা মনে হয় যথাযথই হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহু রাগরাগিণীর উল্লেখ থেকে এও বুঝা যায় যে নিতান্ত অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য কৃষ্ণকীর্তন নির্মিত বা গীত হয়নি। এতগুলি রাগ-রাগিণীর প্রযুক্তি কোনো রাজসভায় উৎসাহ ছাড়া সম্ভবও মনে হয় না। এই সব দিক বিচার ক'রে কৃ-কী যে আকারে আমরা পেয়েছি তাতে এটিকে বিশেষভাবে পরিশীলিত পালাবদ্ধ গীত হিসাবেই গ্রহণ করতে হয়। এই গীত প্রচলনের কতপূর্বে বড়ু চন্ডীদাস কাব্যখানি লিখেছিলেন তা বলা দুষ্কর হ'লেও অন্ততঃ অর্ধ শতাব্দী থেকে পূর্ণ এক শতাব্দী স্বচ্ছন্দে ধরা যায় এবং একথাও বলা যায় যে এই গ্রন্থের ভাষায় দু একটি ক্ষেত্রে বিভক্তি-প্রত্যয়ে যে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনতা কোনো ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষ্য করেছেন তা পালাগায়কদের হওয়াই স্বাভাবিক।

বড়ু চন্ডীদাস তাঁর সুবৃহৎ কাব্যের কবিতাগুলিতে সর্বত্র ষোল চরণই যে ব্যবহার করেছিলেন এমন সন্দেহই প্রামাণিক। দুচরণের আট স্তবকে অথবা চারচরণের চার

স্তবকে এগুলির বিভাজন। এর মধ্যে আবার অধিকাংশ চার স্তবকের ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যায় চিহ্নিত। এই চার স্তবকের বিভাগ যে পরবর্তীকালে সংগীতের স্থায়ী, অন্তরা, আভোগ এবং সঞ্চারী ক্রমে বিন্যস্ত হয়েছিল এরকম ভাবাও অসংগত নয়। পূর্বেই বলেছি যেগুলি স্তবকে বিভাগ করা যায়নি সেগুলিতে প্রায়শঃ 'ধ্রু' চিহ্নিত অতিরিক্ত অংশ বসানো হয়নি। এমনও হতে পারে মুলগায়েন ঐ ধ্রু-হীন কবিতাগুলির সুরে আবৃত্তি করতেন মাত্র, যেমন হয়ে থাকে পাঁচালিতে। ষোল চরণের প্রতি কবির পক্ষপাতের দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করা যেতে পারে অন্ততঃ দানখন্ড, নৌকাখন্ড এবং বংশীখন্ডের গীতগুলি থেকে। বড়ু চন্ডীদাসের কাব্যের এইগুলিই সর্বাধিক গীত অংশের অন্যতম। খন্ডিত কয়েক টি পদ বাদে দানখন্ডে পদের সংখ্যা ১০৮। এর মধ্যে চার স্তবকে (ষোলচরণে) বাঁধা পদের সংখ্যা ৮৩। বাকি পঁচিশটি পদের মধ্যে চারটি পদ তিন স্তবকের, বাকি চারের অধিক স্তবকের – প্রায়শই ধ্রু চিহ্নহীন, অথবা একাধিক ধ্রু চিহ্ন যুক্ত। নৌকাখন্ডের পদসংখ্যা তিরিশ, এর মধ্যে কুড়িটি চার স্তবকের। বংশীখন্ডের একচল্লিশ, খাঁটি চার স্তবকের পদ একত্রিশটি। স্তবক সংখ্যা তিনেও ধ্রু চিহ্ন দেওয়া রয়েছে কিন্তু এরকম ব্যতিক্রমের সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প। এতে মনে হয় 'ধ্রু' চিহ্নিত চরণদ্বয় গায়কের যোজনা, কৃ-কী-র কবি কদাচিৎ ষোলর অধিক বা স্বল্প চরণে পদবিন্যাস করলেও গায়ক তা পুরোপুরি গীতে আবদ্ধ করেন নি। ঐ সব পদের গীতপ্রযুক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও। আমরা গায়কের ব্যবহৃত পুঁথি পেয়েছি ব'লেই কৃ-কী-র পাঠ বিষয়ে নানাবিধ সমস্যার উদয় স্বাভাবিক হয়েছে। তবু একথাও স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে মোটামুটি সমগ্র কাব্য একই কবির রচনা, কারণ, বর্ণিত বিষয় ও কাব্যার্থের সঙ্গে ভাষার, বস্তু সমাহরণের ও অলংকরণের আদ্যন্ত সংগতি রয়েছে এবং পরপর খন্ডগুলিতে পূর্বপূর্ব খন্ডের বিষয়বস্তুর উল্লেখও করা হয়েছে।

বড়ু চন্ডীদাস যদি গীতকার না হন, কবিতাকার হন, তাহলে তাঁর কাব্যচ্ছন্দের নির্মাণের স্বরূপ কী? এ বিষয়ে দেখা যায়। কৃষ্ণ-কীর্তনের আখ্যানবাহিত কবিতা সমষ্টি সর্বত্র অক্ষরমাত্রিক ছন্দে গ্রথিত হয়েছে। বাঙলা এই ছন্দের স্বরূপ হ'ল হ্রস্ব দীর্ঘ সমস্ত অক্ষর নির্বিচারে একমাত্রার। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর অক্ষরমাত্রিকে এবিষয়ে যথাযথতা সমুদ্ভূত হয়নি। সেই বড়জোর দু শতাব্দী হ'ল অপভ্রংশের মাত্রামূলক বিভিন্ন সংখ্যার মাত্রাসমন্বিত চরণের অপভ্রংশ ছন্দ থেকে ধীরে ধীরে অক্ষর-মাত্রিকতার ধীরে ধীরে প্রকাশ ঘটছে। তাছাড়া শব্দাদির উচ্চারণেও পরিবর্তন ঘটছে। তখন আমরা উচ্চারণ করছি এক, কিন্তু লিখছি ভিন্ন। অর্থাৎ এক অক্ষর উচ্চারণের জন্য কখনো দু' অক্ষর লিখতে হচ্ছে, কখনও বা লিখছি এক অক্ষর, কিন্তু উচ্চারণ করছি দু মাত্রার। আ, ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরগুলি একমাত্রায় উচ্চারিত হবে অক্ষরবৃত্তে এই নিয়ম হ'লেও পূর্বস্মৃতিবশে

কখনো কখনো সেগুলির দীর্ঘ উচ্চারণ গ্রথিত করছি। বড়ু চন্ডীদাসে এরকম বিশৃঙ্খলা অল্পবিস্তর দেখা যাচ্ছে, পরবর্তী মধ্যযুগের কাব্যেও কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা রয়েছেই, ভারতচন্দ্রের সময় থেকে কমে গিয়ে অধুনা লুপ্তপ্রায় হয়েছে। মনে রাখতে হবে তখনকার উচ্চারণে তদ্ভব শব্দের অন্ত্যস্বর ধ্বনি উচ্চারণে রক্ষিত ছিল। এসব বিচার করেও কৃষ্ণকীর্তনকারকে অক্ষরমাত্রিক বাঙলা ছন্দের অত্যন্ত শক্তিশালী রচয়িতা ব'লে মনে করতে হবে। আর দেখতে হবে কাব্যরচনা করতে করতে কবি ক্রমশঃ নৈপুণ্য অর্জন করেছেন, তাঁর হাত খুলে গেছে। বংশীখন্ডে বা রাধাবিরহে দীর্ঘস্বরের যুগ্মধ্বনির মাত্রাবৃত্তরীতির উচ্চারণ নেই বললেই চলে।

চর্যাপদের পর কৃষ্ণকীর্তনে এসে আমরা বিস্ময়কর অক্ষরমাত্রিক রীতিই দেখছি না, চরণ স্তবক বিন্যাসের বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করছি। অপভ্রংশ পর্যায় থেকে নেমে বাঙলা পর্যায়ে আসার মধ্যে ভাষার শ্বাসাঘাত এবং বিরামযতির প্রাধান্য ঘটতে থাকে, এরই ফলে লৌকিক সাধারণ বাক্য-উচ্চারণ-রীতি অনুসারে অক্ষরমূল্য এবং যতিপাত ছন্দেরও অবলম্বণ হয়। বস্তুতঃ অক্ষরমাত্রিক ছন্দোরীতি যেমন গদ্য-উচ্চারণের নিকটবর্তী এমন মাত্রাবৃত্ত নয়। বলা যেতে পারে, মাত্রামূলক কৃত্রিম রীতিকে বর্জন ক'রে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বাঙ্‌লা উচ্চারণ ছন্দে তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরই প্রায় পূর্ণবিকশিত রূপ পাচ্ছি বড়ু চন্ডীদাসের বিস্তৃত কাব্যে। তাম্বুলখন্ডেই দেখতে পাই চোদ্দ-অক্ষর চোদ্দ-মাত্রার (উচ্চারণের লিখনে ব্যতিক্রম ধর্তব্যের মধ্যে নয়) খাঁটি পয়ার অথবা ৬+৬+৮ এর ত্রিপদী এবং ৮+৮+১০ এর দীর্ঘ ত্রিপদী ছাড়া দশ মাত্রার চরণ, মিলবিন্যাস, ১০+১০+১৪ স্তবকের তিনচরণের মধ্যগত মিলবিন্যাস, ৮ এর সঙ্গে ১৪ এর মিল প্রভৃতি বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে। যেমন,

(ক) তোর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনি।১৪
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী।। ১০
দারুণ কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে। ১৪
আতিশয় মোর মন হানে।। ১০

(খ) দূতী আপরাধ কৈল। ৮
আহ্মারে কেহ্নে না বুইল। ৮
দূতী মারিআঁ কমণ কাজ সাধিল।। ১৪
রাম কাজে হনুমন্তা। ৮
তেহেন আহ্মার দূতা। ৮
ভাঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতেঁ শকতা।। ১৪

কাব্যটির প্রারম্ভ থেকেই এগার মাত্রার (একাবলী ছন্দের) চরণ পাচ্ছি। রাধাবিরহের প্রথম কবিতা ৮+৮+১০ মাত্রার স্তবক যুক্ত। ঐ আট-মাত্রার চরণ কিন্তু দীর্ঘত্রিপদীর কোনও পর্ব নয়। দ্বিতীয় চরণে আবশ্যিক অর্থ সমাপ্তি বা ছেদ। আবার কয়েকটি গীতে মিল-বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। 'আজি সপন বড়ায়ি' পদে প্রথম-তৃতীয় এবং দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণের মিল। 'সরস বসন্ত কালে' পদের স্তবক ৮+৮+১৪ চরণে, এ তিনটিতেই এক জাতীয় মিল। নিশি আন্ধিয়ারী প্রভৃতি ত্রিপদীতে ৮+৮+১৪ অক্ষর-মাত্রাও দেখা যাচ্ছে। 'আয়াসে কাহ্নের উরে' পদটির ৮+৮+১০ এর চরণবন্ধে তৃতীয় চরণের মিল পরবর্তী স্তবকার্ধের তৃতীয় চরণের সঙ্গে, যেমন-

আয়াসে কাহ্নের উরে
শুতিলোঁ দিআঁ পিয়রে
দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে।
কাহ্নেঞির দরশন
যেহেন ভৈল সপন
যাগিএাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে।। ইত্যাদি।

কৃষ্ণকীর্তনে যেমন লিখিত দুটি হরফকে ক্বচিৎ এক অক্ষর-একমাত্রা ব'লে গ্রহণ করতে হয় তেমনি একাক্ষরকে দু'মাত্রার ব'লেও গ্রহণ করতে হয়। শব্দ-মধ্যে অথবা শব্দান্তে অধিক স্বরধ্বনি ও দ্ব্যক্ষরের আবির্ভাবের ফলে কবি নিজের সুবিধামত সেরকম অক্ষরকে কখনো দুই কখনো বা এক অক্ষর রূপে গ্রহণ করেছেন। আবার দেখা যায়, দীর্ঘস্বরযুক্ত মৌলিক অক্ষর (এবং যৌগিকও) কখনো কখনো ছন্দো রক্ষার্থে কবি দু'মাত্রার গণ্য করেছেন। এরকম ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে ব'লে, মনে হয়, অপভ্রংশের মাত্রামূলক ছন্দোরীতির প্রভাব কবি তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এরকম মাত্রাবৃত্ত প্রভবের একটি ভালো দৃষ্টান্ত হল দানখন্ডের 'নীল জলদসম কুন্তলভারা' প্রভৃতি পদটি। এখানে 'নী' 'কুন্' 'ভা' 'রা' দীর্ঘ। কিন্তু মাত্রাবৃত্তের আভাস ঐ প্রথম দুই চরণ পর্যন্ত। তৃতীয় চরণেই 'শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুর' এর 'কা' যদ্যপি দু'মাত্রার, 'সিন্' এক মাত্রার। এর পর 'ললাটে তিলক যেহ্ন নবশশিকলা। কুন্তল-খন্ডিত চারু শ্রবণ যুগলা'।। প্রভৃতি চরণ অক্ষরবৃত্তেই গঠিত।

কবিতাটিতে সংস্কৃত শ্লোকেরও বাক্যরীতির অনুসরণ রয়েছে ব'লে মাত্রাবৃত্তের সহজ প্রভাব কিনা তা চিন্তনীয়। তবে কবি যে মৌলিক আ-ঈ অক্ষরকে ছন্দোরক্ষার্থে দু'মাত্রার ব'লেও স্থাপন করেছেন তার পরিচয় যথেষ্ট; যেমন, কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে

এর প্রথমাক্ষর দীর্ঘ। তেমনি, 'কোণ আশুভ খনে পা অ বাঢ়ায়িলো' 'শুন কলসী লই সখী আগে জাএ' প্রভৃতিরও যেমন 'দেব অসুর নরগণে' অথবা 'পীন কঠিন উচতনে প্রভৃতির দশমাত্রা রক্ষার্থে 'দে' এবং 'পী' দীর্ঘ। ছন্দোরক্ষার্থে বড়ুচন্ডীদাস যে যৌগিক অক্ষরকে কখনো দুই কখনো একমাত্রার নির্ণয় করেছেন তা নিম্নলিখিতরূপ দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যায়-

আহ্মার বোল / সাবধান হয়।
বাহির চন্দ্র / কিরণে সো অ।।
কি সুতির আহ্মে / চন্দ্র কিরণে।
আধিকে বড়ায়ি / দহে মদনে।।

প্রভৃতি 'একাবলী' ছন্দের দ্বিতীয় চরণের 'চন্দ্র' তিন মাত্রার। অথচ তৃতীয় চরণের চন্দ্র দু'মাত্রার। ছন্দোরক্ষণের জন্য আজও অক্ষরমাত্রিকে যৌগিক অক্ষর ক্বচিৎ দু'মাত্রার ব'লে কবি গ্রহণ করলেও এর ব্যতিক্রম এত সীমিত যে একে ছন্দের ত্রুটি বলাই সমীচীন। অধুনা, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের ছন্দঃসৌকর্ষ এবং কবিভাষার রূপ পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ফলে এরকম ব্যতিক্রম প্রায় দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে। অনুরূপভাবে বলা যায়, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যৌগিক অক্ষরকে একমাত্রার ব'লে গণনার ক্বচিৎ দৃষ্টান্ত (যা ষোড়শ শতাব্দীতেও ছিল) আজ আর নেই। কৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন পদের ছন্দের স্বরূপ বিচারে পালাগায়েনের যোজনা এবং 'ছাড়' অংশগুলির কথাও বিবেচনা করতে হবে।

মোটের উপর এ বিষয় স্পষ্ট যে ৬, ৮, ১০, ১২ (৪+৮) মাত্রার পর্বের বিভিন্ন রীতির চরণ ও মিলবিন্যাসে বড়ুচন্ডীদাস আজ থেকে ছ'শ বছর আগে যে ছন্দঃসিদ্ধি প্রদর্শন করেছেন তা বিস্ময়কর। এই ছন্দোভঙ্গি এবং রূপনির্মাণের অন্যবহু নিদর্শন রয়েছে যা কবিকৃতির দিক থেকে খুব বড় কবি হিসেবেই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছে।

কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রূপকর্মের মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হ'ল কবির এক বিশেষ ধরণের বাগভঙ্গি যা কৃষ্ণ-রাধা-বড়াইয়ের সংলাপের মধ্য দিয়ে আদ্যন্ত উজ্জ্বল এবং বক্র স্মিতহাসি বিস্তার ক'রে রেখেছে। কবি আশ্চর্য অভিনিবেশ সহকারে সেকালকার নরনারীর জীবনচর্যা, প্রণয়রীতি এবং দ্বান্দ্বিক বাক্‌পদ্ধতি অধ্যয়ণ করেছিলেন এবং

সেগুলির গ্রন্থনে নিজ কল্পনাকেও নিয়োগ করেছিলেন, যার ফলে কাব্যটি দীর্ঘ হলেও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণকীর্তনের প্রণয়ভাবুকতায় সূক্ষ্ম অথবা স্থূল এ নিয়ে মতদ্বৈধ যদিবা থাকে এর সংলাপগ্রন্থন চাতুর্য রসিকের উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। সমস্ত কাব্যটি যে মোটামুটি একই কবির রচনা তা এই বিশেষ বাক্‌রীতি থেকেও উপলব্ধি করা যায়। কবির এই বৈদগ্ধ্য উপেক্ষা করে ড. বিমানবিহারী মজুমদার এতে "কথা কাটাকাটির" আতিশয্য এবং নিরর্থকতা দোষ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু সহানুভূতি এবং কাব্যরসিকতার সঙ্গে এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই তিনি দেখতেন যে ঐ কথা কাটাকাটিতেই যথার্থ কাব্যিকতা ঘটছে এবং কৃষ্ণকীর্তনের চরিত্রনির্মাণ এবং ঘটনাসংস্থান কল্পনা থেকে এর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য কম মনোহারী নয়। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি সহানুভূতির সঙ্গেও যাঁরা বিচার করেন এমন অনেকেই এর ভাষাভঙ্গিতে গ্রাম্যতা দোষ লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের চোখে বর্তমানের এবং বৈষ্ণব যুগের তৎসম শব্দযুক্ত এবং পরিশীলিত বাক্যবিন্যাসের অঞ্জন অনুলিপ্ত থাকায় চতুর্দশ শতাব্দীর তদ্ভবশব্দবহুল স্বাভাবিক বাক্‌রীতি তাঁদের কাছে গ্রাম্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে। বড়ু চন্ডীদাস পশ্চিম রাঢ়ের কবি ছিলেন ব'লে এবং সহজ লোকোক্তিকে কাব্যের বাহন করার সংগতি অনুভব করেছিলেন ব'লে তাঁর ভাষা গ্রাম্য ব'লে অনুভূত হওয়ার অবকাশ ঘটেছে। কাব্যনির্মাণে এই কবি বাস্তবতায় নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাই তাঁর বর্ণনায় ও ভাষণ-যোজনে প্রত্যাশিত আবরণ বা মন্ডনকলা নেই, এ রুচি-বিকার নয়, সমস্ত কাব্য এই রীতিতেই নির্মিত। সন্দেহ নেই, বর্ণনীয় বিষয় অনাবৃত ভাষায় রচিত হ'লে অনেক ক্ষেত্রে গ্রামতা দোষ এসে যায় এবং যাকে আমরা কুরুচি বা অশ্লীলতা ব'লে থাকি তা এই আবরণহীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্ণনীয় বিষয় একেবারে এক হলেও এই কারণেই এক কবির রচনা অশ্লীল এবং অপর কবির রচনা রসোত্তীর্ণ ব'লে গৃহীত হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনে সম্ভোগশৃঙ্গারের সব কথাই বলা হয়েছে অথচ লৌকিক ভাষায় স্পষ্ট ক'রে তা বলা হয়নি। কবির মিতভাষণ এবং ভাষণকৌশ্লই বর্ণনীয় বিষয়কে রসোত্তীর্ণ করেছে। দৃষ্টান্ত দিয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা –

মধ্যরাতে কত মুগ্ধ হৃদয় স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি,
তখন শুনেছি বহু চাটু কথা।

চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগশৃঙ্গারানুভবের বর্ণনাও লক্ষ্য করা যেতে পারে –

কহিলাম, "লহ লহ, যাহা কিছু আছে
সব লহ জীবনবল্লভ!" দুই বাহু
দিলাম বাড়ায়ে। চন্দ্র অস্ত গেল যেন,

অন্ধকার ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত্য
দেশকাল দুঃখসুখ জীবনমরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

বড়ুচন্ডীদাসের এই আবরণ কৌশল আয়ত্ত ছিল না। তখনকার কাব্য ঐতিহ্যেও এর অবকাশ ছিল স্বল্প। কবির বৃত্তগত পরিকল্পনাও বিভিন্ন ছিল। সম্ভোগশৃঙ্গার থেকে বিপ্রলম্ভে তিনি তাঁর কাব্যকে উত্তীর্ণ করতে চেয়েছিলেন। সর্বোপরি ধর্মচেতনা বিষয়বস্তুর মূলে কাজ ক'রে থাকবে, যার জন্যে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার "শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাং"-কে অথবা জয়দেবের মানবর্ণনায় "স্ফূরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মনিমঞ্জরী" প্রভৃতিকে বৈষ্ণবগণ রাগভক্তির সম্যৎকর্ষ ব'লে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। শ্রীচৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে সম্ভোগ, মান ও খন্ডিতার বর্ণনায় বাহ্যতঃ স্থূল রতিপ্রসঙ্গের অভাব নেই। কিন্তু বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে ছন্দ এবং ভাষার মন্ডনে তা সমাবৃত। সুতরাং কৃষ্ণকীর্তনের তদ্ভবশব্দময় স্পষ্টোক্তিপূর্ণ লোকভাষাই কৃষ্ণকীর্তনের গুণদোষের কারণ। অপরপক্ষে এই লোকভাষা যে সংলাপের মধ্য দিয়ে কতদূর বক্রোক্তির রমণীয়তা সঞ্চার করতে সক্ষম তা বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে নিম্নলিখিত দু'একটি অংশ দৃষ্টে বোঝা যাবেঃ

(ক) আধিক পীড়য়ে যবে ভুখিল ভষলে।
তভোঁ নাহিঁ পাত্র মধু কমলমুকুলে।।
বড়ার বহু আরী আহ্মে বড়ার ঝী।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী।।
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতে না পারে।
(দানখন্ড, রাধার উক্তি)

(খ) 'তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর।
প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর'।।
'যার প্রাণ ফুটে বিকে ধরিতেঁ না পারে।
গলাত পাথর বান্ধি দহে পসী মরে'।।
'তোহ্মে গাঙ্গ বারাণসী সরুপেঁসি জাণ।
তোহ্মে মোর সব তীথ তোহ্মে পুণ্যস্থান'।
'এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুন দেবরাজ'।
'হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী।

মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী'।।
'এ বোল বুলিতে তোর মনে বড় সুখ।
পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক।।
'ভাল বোল বুলিলি তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী।
আহ্মার মনের কথা কহিলেঁ আপুনী'।।
বিরহে পুড়িআ কাহ্ন হাকল বিকল।
জরুআ দেখিআ যেহ্ন রচুক আম্বল।।(উভয়ের বাদানুবাদ)

(গ) 'তোহ্মার যৌবন রাধা কৃপণের ধন।
পোটলি বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন।।
আম্বু জাম্বু মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।
নহুলী যৌবন রাখিবি কত ভাল।।

* * * * *

তোহ্মার যৌবন রাধে পাণির ফোটা।
চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে ঘোঁটা।। (কৃষ্ণের উক্তি)

(ঘ) তাবত রস নাহি ডালিম ডাকরে।
ভালমতেঁ যাবত নাকি পাকএ ভিতরে।।
বোল এক বোলোঁ তোকে শুনহ অবধু ।
জুড়ায়িলেঁ সোয়াদ লাগে তপত দুধ।।
তপত দুধ কাহ্নাঞিঁ নালে না পীএ।
ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞি দুঈ হাথে না খাইএ।।
(রাধার উক্তি)

(ঙ) 'কাহ্নাঞি' দেখিআঁ বড়ায়ি তোকে লাগে ডর।
মাগুকিলে মারোঁ আজি যবে করে বল'।।
'এথাঁসি সুন্দরী রাধা কর কাঠদাপ।
তথাঁ গেলেঁ হইবে যেহ্ন বাদিআর সাপ'।। (বড়াই ও রাধা)

উদ্ধৃত অংশগুলি কেবল দানখন্ড থেকে। কিন্তু এরকম প্রায় সর্বত্রই। বচনের সরস বক্রতা চন্ডীদাসের কবিপ্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং কাব্যের আদ্যন্ত এই বচনচাতুর্য রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু কবি যথেষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ হয়েও যে কাব্যটিতে তদ্ভব লৌকিক বাঙলার মর্যাদা রক্ষা করেছেন, এই তাঁর বিশেষ গৌরব। এছাড়া বড়ু চন্ডীদাস খাঁটি বাঙলায় বহু ইডিয়ম এবং প্রবচন সদৃশ

বচনের সন্নিবেশ তাঁর গ্রন্থে করেছেন। এ অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। এগুলিও লৌকিক সমাজের সঙ্গে কবির সুগভীর পরিচয় জ্ঞাপন করে এবং দেখা যায় এর কতকগুলি আজও ভাষাভঙ্গীতে রক্ষিত হয়েছে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারেঃ বাপেত নাহি লাজ; দেহত কাহ্নাঞি না বসে কি পীত; যে থানে শুঁচী না জাএ। বাটিআ বহাএ; পাটাবুকী তিরী; উলটি থা দিলেঁ পিঠী; কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মেএঁ পাএ; লাজ না বাসসি; পোএর মুখে পরবত টলে; লাভে কিল বাড়ি খাই বান্ধিল জাই; তিন লোক খাআঁ বোলে; দহে পৈসী মরী; কাহাক দেখাহ এ কাঠদাপে। বান্ধিতে না পারে তোহ্মার বাপে।। গোআল জাতি আতি পন্তিআঁ। পুরুষে আধিক তিরী আন্তিআঁ।। এভোঁ নাহি ঘুচে তো মুখে দুধবাস।। মুখত বজর বসে; তোর কি বাড়িতে আছোঁ তোর কিবা ভাত খাওঁ; তিরীকলা মোর থানে না পাত তোঁ রাহী; কচাল না পাত তোহ্মে শুনহ মুরারী; বোলে চালে হইআঁ যাবি পার; ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলে না পালাএ; অনল বুলাওঁ গাএ। মাঝ পান্তরে বাট কাঢ়ায়িআঁ খেড় আগুনী এক করিআঁ বড়ায়ি গেলী এক ভিতে।। পাঞ্জর বেধিল ঘুনে; ইত্যাদি।

এগুলি কেবল তাম্বুলখন্ড ও দানখন্ড থেকে। কৃষ্ণকীর্তনের প্রতি বিরূপ সমালোচক দেখবেন, ভাষার এত আয়োজন যে কাব্যের আছে তার কবিকে মহাকবি বললে অত্যুক্তি হয় না।

সমগ্র কৃষ্ণকীর্তন যে মূলতঃ একই কবির রচনা তার প্রমাণ, প্রথমতঃ পরবর্তী খন্ডগুলিতে পূর্ব পূর্ব খন্ডের ঘটনার উল্লেখ। দ্বিতীয়তঃ ভাষাভঙ্গির একরূপতা এবং কিছু কিছু বর্ণনীয় বিষয়েরও (ক্বচিৎ স্বল্প ভিন্ন ভাবে) পুনরনুসরণ। তাম্বুলখন্ডের 'কদমের তলে বসী' প্রভৃতি পদে ভাবী ঘটনার একটা সাধারণ পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে রাধাকৃষ্ণ প্রণয়ের প্রারম্ভ ও বিকাশ আদ্যন্তগ্রথিত একটি সূত্র ধরেই নির্মিত হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি, 'রাধাবিরহ' অধ্যায়ের শেষে আরও অনেকটা অংশই গ্রন্থের অঙ্গীভূত ছিল। প্রচলিত চন্ডীদাস-পদাবলীর আক্ষেপানুরাগ, মান প্রভৃতি পর্ষদের বহু পদ হয়ত এর অঙ্গীভূত ছিল। তাছাড়া এমনও হওয়া সম্ভব যে বড়ু চন্ডীদাসের মূল রচনার বহুপদ এই পুঁথির অঙ্গীভূত হয়নি। ফলতঃ চন্ডীদাস-পদাবলীর পূর্বরাগের কিছু পদও অনায়াসেই কৃষ্ণকীর্তনের অঙ্গীভূত হতে বাধা নেই। লক্ষণীয় বিষয় এই যে বংশীরব শ্রবণে শ্রীমতীর উৎকণ্ঠা এবং পূর্বরাগ উৎপাদনে মুরলীর কৃতিত্বের বিষয়ে বড়ু চন্ডীদাসই অগ্রগণ্য এবং বিশেষ স্মরণীয় কবি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসসাহিত্যে 'গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর কৃষ্ণ' যে প্রাধান্যাবাভ করেছেন সে বিষয়ে কৃষ্ণকীর্তনের ঐতিহ্য বহুলপরিমাণে কাজ করেছে একথা মনে করতেই হয়। কৃষ্ণকীর্তনের কবির প্রকাশভঙ্গিমার সঙ্গে চন্ডীদাস-পদাবলীর বহুপদের ভাষা ও প্রকাশরীতি বিষয়ে সাদৃশ্য কোনো কোনো মনস্বী লক্ষ্য করেছেন। সেগুলি পুনর্বিবেচনা ক'রে দেখলে মোটামুটি (অর্থাৎ চন্ডীদাস-নামাঙ্কিত কিছু পদ ছাড়া) দুই চন্ডীদাসকে

এক ব'লেই প্রতীতি হবে। সহজিয়া রতির বা কিশোরী-ভজনের 'চন্ডীদাস' ছাড়া, আরও দুজন চন্ডীদাসের অস্তিত্ব যদি মেনে নিতেই হয়, অর্থাৎ চৈতন্য-পূর্ববর্তী ঐ বড়ু চন্ডীদাস ছাড়া মহাপ্রভু প্রদর্শিত নবভাববৈচিত্র্যে রঞ্জিত পদের চন্ডীদাস ব'লে একজন কবি রয়েছেন এমন যথার্থ ধারণায় আসা ছাড়া যদি গত্যন্তর নাও থাকে, তবু একথা খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে করতে হয় যে ঐ চন্ডীদাসের নামাঙ্কিত পদে বড়ু চন্ডীদাসের বংশীখন্ড এবং রাধাবিরহের বহুপদ মিশ্রিত হয়ে পড়েছে। তালশিক্ষার পুঁথিতে প্রাপ্ত কৃষ্ণকীর্তনের পদগুলির মধ্যে (কৃ-কী "পরিশিষ্ট" দ্রঃ) কয়েকটি পদ কৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া প্রচলিত পদাবলীতে চন্ডীদাসের নামে গ্রথিত 'এক কাল হৈল মোর যমুনার জল' ইত্যাদি সুকবিত্বময় পদটি বড়ু চন্ডীদাসের ভণিতাতেই রয়েছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় খুব সঙ্গতভাবেই অনুমান করেছেন যে মহাপ্রভুর প্রিয় 'হা হা প্রাণপ্রিয় সখি' পদটি এবং অন্যান্য পদের মধ্যে 'কালা গরলের জ্বালা' এবং 'কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী' পদ দুটি বড়ুর। আমরা আরও দু-চারটি সম্ভাব্য পদের হয়ত বা হদিস দিতে পারি। দেখতে হবে বড়ু চন্ডীদাসের ভণিতাংশ কেবলমাত্র আত্মপরিচয়জ্ঞাপক। দ্বিজ বা দীন এক্ষেত্রে বর্ণিতভাবের উপর মন্তব্য করেছেন। বড়ুর ভণিতার কোনও মন্তব্য নেই। সুতরাং মন্তব্যযুক্ত ভণিতার পদ বড়ু চন্ডীদাসের হতে পারে না। কিন্তু সে কথাও কি নিশ্চিত-ভাবে বলা যায়? বিদ্যাপতির কিছু অসম্পূর্ণ বা খন্ডিতভাবে প্রাপ্ত পদের পূর্ণতা সাধন ক'রে গোবিন্দদাস নিজ ভণিতা যোজনা করেছিলেন, যেমন 'বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব, গোবিন্দদাস রস পুর'। বড়ুই চন্ডীদাসের ক্ষেত্রেও যদি তা-ই হয়ে থাকে? দ্বিজ বিশেষণধারী ব্যক্তি যদি বড়ু চন্ডীদাসের রস পূর্ণ ক'রে নিজ ভণিতা দিয়ে থাকেন? উল্লিখিত 'কালার লাগিয়া হাম' প্রভৃতি নিঃসন্দেহে বড়ু চন্ডীদাসের হলে 'দ্বিজ' শুধু মনোরম ভণিতা দিয়েই পদটিকে আত্মসাৎ করেছেন বলতে হয়। যাই হোক, বড়ু চন্ডীদাসের বংশীখন্ড এবং রাধাবিরহের ভাব ও ভঙ্গি চন্ডীদাস নামাঙ্কিত যেসব পদে নিঃসন্দেহে প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলিকে প্রভাবজাত বা অনুসরণ না ব'লে আমরা বরঞ্চ বড়ু চন্ডীদাসেরই এমন মনে করতে পারি।

"চন্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রচলনের বিষয় মনে রেখেও একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে পরবর্তী কবিসম্প্রদায়ের উপর এর প্রভাব অব্যাহত ছিল। শুধু প্রচলিত চন্ডীদাস-পদাবলীর পূর্বরাগ এবং আক্ষেপানুরাগের পর্যায়েই নয়, পরন্তু বড়াই-ঘটিত দানলীলার অনুসরণেও। দানলীলা-নৌকালীলা, বড়ু চন্ডীদাসের কাব্য-চাতুর্যের অপূর্ব নিদর্শন। পূর্বেকার কোনো কবিই এরকম সুসংগ্রথিত দান-নৌকালীলার বর্ণনা করেননি। জ্ঞানদাসাদি চৈতন্য-পরবর্তী বহু কবি এই দুটি পালার পদ লিখেছেন। আসলে চৈতন্য-পরবর্তী যুগে শ্রীরাধার বিরাগাদির চিত্র অপ্রসিদ্ধ হয়ে পড়লেও প্রণয়-লীলা বৈচিত্র্যের জন্য কৃষ্ণকীর্তনের রমণীয়তা অনুসৃত না হয়ে পারেনি।

কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখ্য সবচেয়ে অদ্ভূত এবং কারও কারও কাছে নিতান্ত প্রতিবাদযোগ্য বিষয় হ'ল রাধাকৃষ্ণের মাতুলানী-ভাগিনেয় সম্পর্ক উল্লঙ্ঘন, কৃষ্ণরাধার প্রণয়ের প্রারম্ভে রাধার তীব্র বিরাগ এবং প্রণয়ে দেহরতি বিষয়ে কৃষ্ণের অতি প্রবল পক্ষপাত। এরই জন্য কৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণকে কেউ কেউ 'গোঁয়ার গোবিন্দ' বলে অভিহিত করেছেন এবং কৃষ্ণকীর্তনকে অশ্লীল এবং কুরুচিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার বলছেন (ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী গ্রন্থ দ্রঃ) –

"অতিবড় লম্পটও প্রেম করিবার পূর্বে নায়িকাকে অপদস্থ করিয়া
ত্যাগ করিব, এ পরিকল্পনা করে না। ... কাব্যের নায়কের সংকল্প
এই যে, সে চুরি, রাহাজানি, ধর্ষণ, বলাৎকার প্রভৃতি করিয়া
অবশেষে নায়িকাকে ত্যাগ করিয়া লোকসমাজে তাহাকে উপহাস্য
করিয়া তুলিবে। ঠিক এই পরিকল্পনা অনুসারেই সে কাজ করিয়াছে।
যেমন নায়কের ভালবাসা, তেমনি নায়িকার প্রেমের আতশয্য! .....
এই ধরণের মারধর করিয়া ভয় দেখাইয়া প্রেম করার কথা
আর কোনো কাব্যে নাই। .... কবির কৃষ্ণ কামুক,
লম্পট, মিথ্যাবাদী, অতিশয় দাম্ভিক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। .....
... যাহার প্রণয় চাওয়া হইতেছে তাহাকে পামরী ও ছিনারী
বলা এইরূপ মহাকবির মহাকাব্যেই সম্ভব!" – ইত্যাদি।

ড. মজুমদারের মত বৈষ্ণব ঐতিহাসিকের এরকম মন্তব্য বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে বহিরঙ্গ দৃষ্টির দ্বারা চালিত হয়েছেন। সহানুভূতির সঙ্গে আদ্যন্ত মিলিয়ে পাঠ করলেই তিনি দেখতেন যে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেলেও সমস্ত কাব্যটি একটি বিশেষ পরিকল্পনার উপর নির্মিত। এই পরিকল্পনা মূলতঃ ধর্মীয়, তবে কাব্যরসিকতাও গ্রন্থের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। মূল ভাব ধর্মীয় না হ'লে জন্মখন্ডে পুরাণ অনুসারে কৃষ্ণের জন্ম বিবৃত করার প্রয়োজন হ'ত না এবং রাধাকে লক্ষ্মীর অবতার ব'লে চিহ্নিত করারও আবশ্যকতা থাকত না। বড়ু চন্ডীদাসের মতে নারায়ণ কংসনিধন ক'রে ভূভার হরণের জন্যই কৃষ্ণাবতার গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর সতত মিলিত অবস্থান সেইহেতু লক্ষ্মীকেও অবতীর্ণ হতে হ'ল রাধারূপে। এতদূর পর্যন্ত বড়ু চন্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব ভক্তিভাবুকতার অনুসরণ করেছেন। কিন্তু –

কাহ্নাঞির সম্ভোগ-কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে।

আল রাধা পৃথিবীতে কর আবতার।

ইত্যাদি ভূমিকার পর গৌণ মধুর রসলীলাকে মুখ্যভাবে বর্ণনা করায় তিনি পরবর্তী নব বৈষ্ণবভাবুকতার পথও প্রস্তুত করে দিয়েছেন। সুতরাং বলা যায় যে কৃষ্ণকীর্তন দুই বৈষ্ণবীয়তার মধ্যে সেতুবন্ধন করেছে। রসাত্মক লীলাবর্ণন যখন কবির উদ্দেশ্য তখন ধর্মকে ত্যাগ না করে লৌকিক কাব্যসঙ্গতিও কবিকে রক্ষা করতে হবে। এ কাজটি কবির পক্ষে দুরূহ ছিল সন্দেহ নাই। তাঁর পূর্বে রাধাসহ কৃষ্ণের মিলন বিরহলীলার যুক্তিসঙ্গত ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় কুত্রাপি ছিল না। গাথা সপ্তশতী বা ধ্বন্যালোকের দু একটি শ্লোকে, কৃষ্ণকর্ণামৃতের সন্ধিগ্ধ দুটি শ্লোকে এবং গীতগোবিন্দের সংক্ষিপ্ত রাস-মান-বিরহ-অভিসার-মিলন বর্ণনায় যা পাওয়া গিয়েছিল তা কবিকে প্রবল প্রেরণা দিলেও তাঁর প্রয়োজন সম্পূর্ণ নির্বাহ করতে পারেনি। রাধা রায়াণ অর্থাৎ অভিমন্যুর পত্নী এই তথ্যটি যদি তিনি ব্রহ্মবৈবর্ত থেকে পেয়েই থাকেন, যেমন, কৃষ্ণকীর্তনে বলা হয়েছে –

দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী।।

তবু তাঁর দিক থেকে বাস্তব কাব্যসঙ্গতি এবং আধ্যাত্মিকতা দুই কূল রক্ষা ক'রে কিভাবে পরনারীর সঙ্গে মিলন সম্ভব যে বিষয়ে ঘটনার যৌক্তিকতা রক্ষা করাই সমস্যার ব্যাপার হয়েছিল। স্বনির্বাচিত পথ বেছে নিয়ে সে সংকট উত্তীর্ণ হবার যে প্রয়াস তিনি করলেন তাই হ'ল কৃষ্ণকীর্তন কাব্য।

কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পরিকল্পনাটি আয়ত্ত করতে গেলেই দেখা যায়, নারায়ণ-কৃষ্ণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিত লক্ষ্মীই যে রাধারূপে জন্মেছেন এবং দৈববশে পরনারী হয়ে গেছেন কৃষ্ণ তা জানেন। অন্ততঃ কৈশোরে পদার্পণ করতেই চিত্তে প্রেমাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্মী-রাধার কথা তাঁর মনে হয়েছে। নপুংসক অভিমন্যুর স্ত্রীরূপে লক্ষ্মী বর্তমানে বাস করছেন এও তাঁর জানা। অথচ রাধা তাঁর স্বরূপ জানেন না বা কৃষ্ণকেও জানেন না। তিনি নিতান্তই সংসার বাসনায় আবদ্ধ শৃঙ্খলা, তার নিজের কাছে তিনি 'বড়ায় বৌহারী, বড়ার ঝি'। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর লৌকিক সম্পর্ক মাতুলানী ভাগিনেয়। এরকম ক্ষেত্রে লীলাবর্ণনায় কাব্যের দিক থেকে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এইজন্যই কবিকে রাধার বিরাগিনী অবস্থা এবং কৃষ্ণের সম্ভোগেচ্ছার প্রাবল্য এবং বলপ্রদর্শন প্রভৃতি বর্ণনা করতে হয়েছে। কৃষ্ণ দেখছেন এ তাঁরই স্বকীয়া এবং চিরন্তনী, দৈবী মায়ায় বিমূঢ় হয়ে পরসংসর্গে যাপন করছেন, যা কৃষ্ণের নিতান্ত অসহনীয়। সুতরাং ঐ অবস্থা থেকে শ্রীমতীকে প্রবুদ্ধ করার বাসনায় এবং প্রয়োজনীয়তাবোধে তাঁকে বলপ্রদর্শন করতে হয়েছে এবং পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে যে তিনিই রাম, তিনিই দশাবতার। এক্ষেত্রে পরবর্তী বৈষ্ণব প্রেমভক্তির লীলাপ্রকাশ সম্ভবপর নয়। পরবর্তী বৈষ্ণব কল্পনায় এই বাস্তব দিকটি অস্বীকৃত হয়েছে রাধা পরকীয়া হ'লেও জন্ম থেকেই কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা। এমন অলৌকিক ভাবনা অবলম্বণ

ক'রে পূর্বরাগ মানাদি গ্রথিত করা হয়েছে। কাব্য রচনা করতে গিয়ে বড়ু চন্ডীদাসকে অধ্যাত্মের সঙ্গে বাস্তবের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়েছে। পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্যদর্শনে রাধা (এবং গোপীরা) পরকীয়া হয়ে কিভাবে উপপতি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতেন এই সমস্যার সমাধানে যোগমায়ায় কল্পনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে –

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।।

কৃ-কীতে অলৌকিকতার অবকাশ না রেখে কাব্যোচিত বাস্তব পরিস্থিতি গড়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে। এইজন্য রাধাকে অলংকারভূষিতা ধনী কন্যা ক'রেও দধিদুগ্ধপসারিণী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণকে কখনো দানী সাজিয়ে কখনো নৌকার কান্ডারী সাজিয়ে উপস্থাপিত করতে হয়েছে এবং মিলন-সমস্যার-সমাধান কল্পে বড়াইয়ের দৌত্য নির্মাণ করতে হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে, লৌকিক সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ করতে গিয়ে একেবারে মাতুলানী ভাগিনেয় সম্পর্ক তো কবি ছিল না করলেই পারতেন। আমাদের মনে হয় এক্ষেত্রে কবির গত্যন্তর ছিল না, তিনি ব্রহ্মবৈবর্তে লোক-প্রচলিত কাহিনীতে এ বিষয়টি পেয়ে থাকবেন।

দানখন্ডে কৃষ্ণ পুনঃপুনঃ রাধিকাকে পূর্ব পূর্ব জন্মের সম্পর্কের কথা স্মরণ করিতে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু 'মুগধী গোআলী' তা বিশ্বাস করেন নি। ইহজন্মের সম্পর্ককেই সর্বস্ব ব'লে ধরে আছেন।

দানখন্ড স্মরণীয় –

পুরুব কালতে তো পতি চক্রপানি
তো এবঁ পাসরিলি কেহ্নে।
তোহ্মার কারণে আহ্মে আবতার কৈল
দিআঁ যাহ আলিঙ্গন দানে

* * * * *

কভোঁ রাধা নাহিঁ বোলোঁ মোএঁ পাপবানী।
তোহ্মে নারী মোর নহ আইহনের রাণী।।
এ বোল তোহ্মার কাহ্নাঞি সহিতেঁ না পারী।

কোণ কালত কাহ্নাঞি আহ্মে তোর নারী।।
রামায়ণ কথা রাধা কহিল তোহ্মারে।
তভোঁহো মুগধী রাধা না চিহ্ন আহ্মারে।।
কত মিছা বোলহ সুন্দরী বনমালী।
তোর বোলে ভান্ডায়িলি নহে চন্দ্রাবলী।।

* * * * *

ছাওয়াল না দেখিহ মোরে রাধা জানওঁ রতি সকল।

* * * * *

তবেসিঁ ধরমের ভয় রাধাল আল যদি মোএঁ হরোঁ পরনারী।
অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী
পুরুব জরমে কাহ্নাঞি আছিলোঁ বা তোর নারী।
ইহ জরমে কে বা পাতিআএ অপণে বুঝহ মুরারী।।
ইত্যাদি।

কৃষ্ণ কর্তৃক সম্ভোগরতির যাবতীয় উপচার প্রয়োগের মূলেও রাধিকাকে স্বাভিমুখী করার প্রয়াসই লক্ষিত হয়। দানখন্ড-নৌকাখন্ডে কৃষ্ণের এ বিষয়ে উদ্যম এবং প্রাথমিক সাফল্যের পর রাধাবিরহ অংশে কৃষ্ণের ছদ্মবৈরাগ্য এ দুইকে মিলিয়ে দেখে তবেই এ গ্রন্থের রাধাকৃষ্ণ প্রণয় স্মপর্কে মন্তব্য করা সমীচীন। কৃষ্ণ নিজ শক্তিকে অর্থাৎ লক্ষ্মী-রাধাকে চিনতে পারার পর যে বলপ্রয়োগ করেছেন তাতে দাম্পত্যপ্রেমের নীতি লঙ্ঘিত হয়নি, কারণ, "উপপন্না হি দারেষু প্রভূতা সর্বতোমুখী"।

বিমানবাবু ঐতিহাসিক এবং ভক্ত মানুষ হয়েও কৃষ্ণকীর্তনের অধ্যাত্ম এবং লৌকিক পরিস্থিতির মিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অবহিত হতে পারেননি। তিনি ছোটখাটো কয়েকটি অসংগতিও তুলে ধরেতে চেয়েছেন। যেমন রাধার বয়স রাধার মুখেই কখনো এগারো কখনো বারো বলা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে 'দধি বিঁকে জাইএ বড়ায়িও বারহ বৎসর'; রাধিকা বার বৎসরের হলেও তার পূর্ণযৌবনাবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং তার মুখে বয়ঃপ্রাপ্তা রমণীর ভাষা বসানো হয়েছে; দানখন্ডে কৃষ্ণরাধার দৈহিক মিলন সংসাধিত হলেও নৌকাখন্ডে রাধাকে বলতে দেখা যাচ্ছে যে 'প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভান্ডার' – ইত্যাদি। বিমানবাবু দৃষ্ট এই সব অসংগতির কিছু কিছু যৌক্তিক জবাব যে না দেওয়া যায় এমন নয়। বলা যায়, গীতগোবিন্দের নান্দীশ্লোকে এবং ব্রহ্মবৌবর্তে নন্দের নির্দেশে শিশুকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ক'রে রাধার গৃহাভিমুখে যাত্রা এবং অরণ্যান্তরালে

উভয়ের মিলন কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয়? কিন্তু যেমন অধ্যাত্ম, তেমনি কাব্য যুক্তির সংগতিকে পরিহার করেই চলে। তা ছাড়া ছোটখাট অসংগতি যদি থাকেই তাতে রসিকের রসাস্বাদনের ব্যাঘাত হয় না। বিমানবাবু এ কাব্যের কৃষ্ণচরিত্রে আর একটি প্রবল দোষ লক্ষ্য করেছেন, কৃষ্ণ শুধু কামুক লম্পটই নয়, সে অপহারক, দস্যু, কারণ, দানখন্ডের শেষে সম্ভোগান্তে সে রাধিকার আভরণ কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি কৃষ্ণকীর্তনকার এর যুক্তি দিয়েছেন – 'কাঢ়ী লৈল আভরণ পুন রতী আশে'। এতে কৃষ্ণের দস্যুস্বভাব প্রতিপন্ন হয় না। এই কার্যের স্বপক্ষে বোধ হয় অন্য যুক্তিও আছে। স্বদারার অঙ্গে অন্যপ্রদত্ত অলংকার অসহনীয়, শ্রীরাধার আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে সংসারে আসক্তির একটা অংশ হ'ল অলংকারে আসক্তি আর সংসারাসক্তি মোচন করাই কৃষ্ণের অভিপ্রায়; প্রিয়ার আভরণ নিজ সমীপে রক্ষা করা রতিভাববর্ধনের অঙ্গ বিশেষ – ইত্যাদি। কবি বিদ্যাপতিও আভরণ হরণ বর্ণনা করেছেন–

ন হর ন হর হরি হৃদয়ক হার।
দুহু কুল অপযশ পহিল পসার।।

নানাবিধ বিরূপ আলোচনার মুখেও কিন্তু বিমানবাবু একটি খুব যথার্থ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। তা এই যে, "কাহিনী হিসাবে বইখানি দুর্বল হইলেও কথা কাটাকাটিতে ইহার জুড়ি নাই"। এটি নিন্দাচ্ছলে স্তুতিই হয়েছে। বাস্তবিক কৃষ্ণকীর্তনের সংঘাতময় সংলাপে যে চাতুর্য রক্ষিত হয়েছে তা পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যেও বিরল। প্রতিপদে বক্রোক্তিপূর্ণ এরকম রসালাপের একত্র সমাহার সংস্কৃত বাক্যাদিতেও নেই। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

বিমানবাবুর আর একটি অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিয়ে আমরা এ প্রবন্ধের সমাপ্তির অভিমুখীন হচ্ছি। "আদিরসের ছরাছড়ি থাকায় কাব্যখানি প্রায় Pronoqraphy র পর্যায়ে পড়িয়াছে এবং সেইজন্য একশ্রেণীর পাঠকের নিকট খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে"।

বুঝতে কষ্ট হয় না যে সমালোচক এই ধর্মীয় কাব্যটির উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাই এই মন্তব্য। নতুবা দেবতা মানুষ-নির্বিশেষে সম্ভোগ শৃঙ্গারের বর্ণনার যে ভারতীয় ঐতিহ্য তার অতিরিক্ত এমন কিছু এতে নেই। আর প্রবীণেরাই কাব্যটির সমাদর করেছেন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনকারকে তাঁর বর্ণনীয় সম্ভীগরতির পূর্ণাঙ্গতা সৌষ্ঠব বরদধনের জন্য ব্যাপকভাবে ভারতীয় কামশাস্ত্রের সহায়তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাম্বুলাদি সহ দূতী প্রেরণ, নায়িকার সম্মুখে পুনঃপুনঃ নায়িকার রূপবর্ণন। বিদগ্ধতাময় চাটুবাক্য প্রয়োগ। আলিঙ্গন, কেশগ্রহণ,

নখক্ষতাদি উৎপাদন প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে মনে হয় কবি তাঁর কামশাস্ত্র অধ্যয়ণকে কাজে লাগিয়েছেন। দামোদর গুপ্তের কুট্টনীমত কাব্যে শৃঙ্গারোপচার প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে –

অবিনয় এব বিভূষণমশ্লীলাচরণমেব বহু মানঃ।
নিঃশঙ্কতৈব সৌষ্ঠবমনবস্থিতিরেব গৌরবাধানম্।।
কেশগ্রহণমনুগ্রহঃ উপকারস্তাড়নং মুদে দংশঃ।
নখবিলিখনভ্যুদয়ো দৃঢ়দেহ নিপীড়নং সমুৎকর্ষঃ।।
ইত্যাদি

এই কুট্টনীমত কাব্য যে সম্ভোগ-শৃঙ্গার বর্ণনায় চন্ডীদাসের অন্যতম আদর্শস্থানীয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বড়াইয়ের রূপ ও চারিত্র্যের নির্মাণে কুট্টনীমতের দূতী 'বিকরালা'র অনুসরণ। কুট্টনীমতমে বিকরালাকে দেখছি –

অথ বিরলোন্নতদশনাং নিম্নহনং স্থূলচিপিট নাসাগ্রাম্।
উল্বণচুচুকলক্ষিত শুষ্ককুচস্থান শিথিলকৃত্তিতনুম।।
গম্ভীরারক্তদৃশং নির্ভূষণলম্বকর্ণপালীংচ।
কতিপয় পান্ডুর চিকুরাং প্রকটশিরাসন্ততায়গ্রীবাম্।।
সিতধৌতবসনযুগলাং বিবিধৌষধিমণিসনাথগলসূত্রাম্।।
ইত্যাদি।

চন্ডীদাস এর সার গ্রহণ ক'রে বড়াইয়ের বর্ণনা দিয়েছেন –

শেত চামর সম কেশে
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে।।
ভ্রুহি চূণরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুঈ আঁখি।।
মাহাপুট নাশা দন্তহীনে।
উন্নত গন্ড কপোল খীনে।।
ওঠ আধর উঠুক জিনী।।
কাঠী সম বাহুযুগলে।
নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে।।

দৌত্যকার্য্যে বড়াইয়ের দক্ষতা কৃষ্ণকীর্তনের পাঠকের সুবিদিত। প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীতেও

মান, খন্ডিতা, প্রিয়সমাগম উৎকণ্ঠা, মিলন প্রভৃতির বর্ণনায় বাৎস্যায়নাদির অনুসরণ যথেষ্ট করা হয়েছে। কৃষ্ণকীর্তনে অধ্যাত্ম এবং বাস্তবকে একসূত্রে বাঁধতে গিয়ে কবিকে লোকপ্রচলিত কাহিনীর পুনর্বিন্যাস করতে হয়েছে। নানা স্থান থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে। গীতগোবিন্দ এবং বিদ্যাপতির পদও অধ্যাত্ম ও কাব্যের পরিণয়বন্ধন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্ণাঙ্গতা ঐগুলির মধ্যে নেই। অন্যপূর্বা রমণী কিভাবে স্বামীসঙ্গ এবং পূর্বপ্রণয় ফিরে পেয়েছিলেন তার বিশ্বাসযোগ্য এবং পূর্ণাঙ্গ পরিচয় গীতগোবিন্দ এবং বিদ্যাপতির পদ বহন করে না। বিদ্যাপতি তাম্বুলাদিসহ দূতী-প্রেরণ, রাধিকার কোপ, দানলীলার আভাসমাত্র দু-চার পঙক্তিতে দিয়েছেন। বাস্তব সম্ভাব্যতার বিবেচনা পাঠকের কল্পনার উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বড়ু চন্ডীদাস পরস্পর বিরুদ্ধ লোককাহিনী ও পৌরাণিক উপাদানের উপর নিজ কল্পনা উদ্ভাবিত ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে সুসমঞ্জস ও বিশ্বাসযোগ্য রাধাকৃষ্ণ প্রণয়কাহিনী গ্রন্থন করেছেন। সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্য তিনি কেবল জয়দেবেরই কয়েকটি গীতের অনুবাদ করেননি, অন্য বহু সংস্কৃত কবি থেকে ঋণ নিয়েছেন। এই গ্রহণের চিহ্ন শ্রীরাধার রূপবর্ণনায় বিশেষভাবে প্রকটিত।

ললিত আলকপাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকাকূল রহে বনসাঝে।।
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপ করে নীল উতপল।।

প্রভৃতি এবং ‘লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল’ প্রভৃতি অনিবার্যভাবে সংস্কৃত থেকে সংগৃহীত।

এই সব দিক বিবেচনা ক’রে কৃষ্ণকীর্তনকে নিছক গ্রাম্য কবির রচনা বলা যায় না, Pastoral poem বা Ballad ও বলা চলে না। নাট্য মিশ্র-গীত এই কাব্যের ভাবরূপ হলেও এর চরণবিন্যাস, সুনিরূপিত শ্লোকছন্দ অর্থ দুই ও চার পঙক্তির নিয়মিত গ্রন্থন লক্ষ্য ক’রে একে কিছুটা artificial Ballad ব’লে বরং মনে করা যেতে পারে।

এ হেন বিস্তৃত লীলাবর্ণন এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে ও কাব্যাংশে অসাধারণ গ্রন্থ পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলীকে প্রভাবিত না ক’রেই পারে নি। রাধার মুগ্ধাবস্থা পরবর্তী রস-দর্শনে পরিত্যক্ত হ’লেও কৃষ্ণের মুরলীর গৌরব এবং রাধার বিরহাবস্থা শুধু অনুসৃত নয়, অনুকৃতও হয়েছে। আমরা সন্দেহ করেছি এই খন্ডিত গ্রন্থে আমরা কবি লিখিত রাধা বিরহের মাত্র আধখানা অংশ পেয়েছি। সুতরাং মহাপ্রভু যে এই চন্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনই আস্বাদন করতেন সে বিষয়ে সন্দেহ করা ভ্রমাত্মক। যাঁরা এই কাব্যে গ্রাম্যতা এবং কুরুচি দেখেছেন যাঁরা তাঁদের স্বকীয় ভ্রমের উপর ভিত্তি

ক'রে মনে করেছেন মহাপ্রভু এরকম কাব্য আস্বাদন করতে পারেন না, তাঁরা শুধু এই কাব্যের উপরই অবিচার করেন নি, মহাপ্রভুর সর্বাত্মরুচির উপরেও নিজ বিচারের সংকীর্ণ মানদন্ড প্রয়োগ করেছেন।

শেষ কথায় আদি বা 'বড়ু' চন্ডীদাসের বাসভূমি। সহজিয়া 'পিরিতি'-রসিক তৃতীয় চন্ডীদাস লিখিত "শালতোড়া গ্রাম, অতি পীঠস্থান, নিতার আলয় যেথা" প্রভৃতি পদে শালতোড়া গ্রামে চন্ডীদাসের বাসস্থান ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে এবং চন্ডীদাস বাসুলীর কৃপায় কিভাবে পিরিতি-রসিক হয়েছিলেন তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পদটি পড়ার বেশ কিছুকাল পরে কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে অনুসন্ধানের জন্য শালতোড়া যাই। বাঁকুড়া জেলার উত্তরাঞ্চলে 'গঙ্গাজলঘাটি' থানার কিছু আগে ঐ শালতোড়া গ্রাম। তখনকার দিনে গ্রামটি শিখরভুমের জমিদারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকা সড়ক থেকে মাইলখানেক দক্ষিণে গ্রাম, ব্রাহ্মণ, রজক, কুম্ভকার ও কৃষিজীবীদের বাস। গ্রামের মাঝখান দিয়ে একটি 'তোড়' বা জলপ্রবাহ দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রসারিত, তার দু'পাশে মানুষের বসতি। বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে সেই বালুময় প্রবাহটিই পথের কাজ করে। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটি তেঁতুল গাছের নিচে বাঁধানো বেদীতে অতি প্রাচীন সুতরাং ক্ষটিত বহু প্রস্তরমূর্তি রক্ষিত রয়েছে দেখি। বাসুলীর কথা জিজ্ঞাসা করতেই গ্রামের লোক মনসাঠাকুরের একটি চালাঘর দেখিয়ে দিল। ভিতরে ঢুকে আরও অবাক হই। পাথরে খোদাই বেশ কয়েকটি চমৎকার ছোট ছোট মূর্তি রয়েছে। সেগুলি জৈন-বৌদ্ধ পুরুষাকৃতি তান্ত্রিক দেবতা বা তীর্থংকরদের মূর্তী বলেই মনে হ'ল। মূর্তিগুলির অবয়ব নির্মাণ ও পালিশের কাজ প্রথম শ্রেণীর। এর পরেই আমাদের দেখানো হ'ল ছোট পিতলের সিংহাসনে উপবিষ্ট বাসুলী মূর্তি। মাথা নেই, চার হাত ও দুই পায়ের ভঙ্গি উপবেশনের, একেবারে সরস্বতীর ভঙ্গি। সরস্বতী মূলে তান্ত্রিক দেবতা, আর 'বাগীশ্বরী' শব্দ থেকেই বাসলী (পরে বাসুলী) শব্দের উদ্ভব। সুতরাং গ্রামটি যে বেশ প্রাচীন এবং চন্ডীদাসের বাসস্থান হতে পারে এমন দৃঢ় ধারণা হ'ল। বিশেষে এই তথ্যটাও মিলিয়ে নেওয়া গেল যে কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথি বাঁকুড়ার রাধানগর গ্রাম থেকেই ৺বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভ আবিষ্কার করেছিলেন। শালতোড়া গ্রামে রজক (= রঞ্জক) বৃত্তির বেশ কয়েকঘর বসতিও দেখা গেল। আর শোনা গেল যে তাঁদের একজনের গৃহে বহু প্রাচীন পুঁথি ছিল আর তার ভিতরে কী বস্তু ছিল তা না জেনে পবিত্র বস্তু মনে ক'রে বহুদিন রক্ষা করার পর সম্প্রতি দামোদরের জলে বিসর্জন করা হয়েছে। রজকেরা গ্রামের পুরানো বাসিন্দা। সুতরাং চন্ডীদাসের রজকিনী-প্রীতি অবাস্তব নাও হতে পারে।

বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামেও চন্ডীদাসের অবস্থিতি বিষয়ে প্রবাদ রয়েছে। ছাতনা শিখরভূমের

সামন্ত রাজা অর্থাৎ জমিদারের অবস্থিতির গ্রাম। তাঁর দ্বারা আহুত হয়ে ও জমিজমার দ্বারা পুরস্কৃত হয়ে চন্ডীদাস পরবর্তী জীবন ছাতনাতেই কাটিটেছিলেন এমন ওঐয়া খুবই সম্ভবপর। অন্য দুই চন্ডীদাসের মধ্যে দ্বিজ বা দীন ভণিতার চৈতন্য-পরবর্তী চন্ডীদাস, যাঁর পদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবুকতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তিনি বীরভূমের নান্নুর গ্রাম নিবাসী হতে পারেন। আর পরবর্তী সহজিয়া রসিক চন্ডীদাস বর্ধমানের গলসি গ্রামের নিকটবর্তী কোনও স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন এমন অনুমান করা যায়।

দেবমানব শ্রীচৈতন্য

মুর্খ দরিদ্র সামান্যজন সহ সমস্ত গৌড়বঙ্গের মানুষ একবার মাত্র বিপ্লবের স্বাদ অনুভব করেছিল, সে আজ থেকে প্রায় পাঁচশ' বছর আগে, এক মানব সন্তানের অন্তরে প্রসুপ্ত দেবস্বরূপের আকস্মিক প্রকাশে। এ বিপ্লব তথাকথিত রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব নয়, এক সামূহিক ভাববিপ্লব, নবচৈতন্যের স্ফূরণ, যা বহিরঙ্গ বিপ্লব থেকে ঢের বেশি মর্মস্পর্শী, যা বাঙালীর স্বপ্নে ও সাধনায় নবজন্ম ঘটিয়েছিল। এর ফলে আমাদের পুরানো ধ্যানধারণা, সেনআমল থেকে বাহিত রক্ষণশীল শাস্ত্রীয় মানসিকতা ও সামাজিক চাল-চলন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। উনিশ-বিশ শতকের সাম্প্রতিককালে পশ্চিমা শিক্ষা এবং সেইসঙ্গে রবিতুল্য মহাকবির প্রকাশেও ঘুম ভেঙেছে কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির, আপামর জনসাধারণের নয়। শুষ্ক অসাড় মানুষের অন্তঃকরণে সাড়া জাগিয়ে সেই আশ্চর্য বিপ্লব যিনি সম্ভব করেছিলেন তাঁর সন্ন্যাস-প্রাপ্ত আখ্যা শ্রীচৈতন্য, মাতৃদত্ত ডাকনাম নিমাই, লোকমুখে প্রদত্ত বিশেষণে গোরা বা গৌরাঙ্গ। প্রত্যক্ষে তাঁর শিশুরূপে আবির্ভাব ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের অর্থাৎ বাঙলা ৮৯২ সনের এই ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায়।

তখন পাঠান-শাসনের কাল। ১৪৮৬ খ্রীঃ এর মাত্র কয়েক বৎসর পরেই সুলতান-কুলতিলক হুসেন শাহ বাঙলার তখ্‌তে আসেন। পাঠান-শাসনের নীতি ছিল হিন্দু-মুসলমানে সমদৃষ্টি। বিশেষে সূফী পীর সাধকের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও লেখকের ভূমি ও বৃত্তি দান। বল্লালীর স্মৃতির অনুশাসনে চালিত ও ছত্রিশ জাতি বর্ণে বিভক্ত হিন্দু-সমাজের উপর পাঠান শাসন কোনও হস্তক্ষেপ করেনি। তবে ধর্মীয় ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত নিম্নবর্ণ হিন্দুরা যে ধর্ম ও মর্যাদার আশায় সূফীধর্ম তথা ইসলাম বরণ করতে থাকেন তাতে রাজশাসনের কিছু করার ছিল না। সেন-আমল থেকেই নবদ্বীপ ছিল পান্ডিত্যের ও টোলে শিক্ষালাভের জন্য পূর্বাঞ্চলে খ্যাত। পাঠান সুলতানদের উৎসাহদানের ফলে গৌড় বাঙলার বাইরে থেকেও পন্ডিত ও ধার্মিকেরা এসে নবদ্বীপে তথা সাধুসন্তদের পুরী শান্তিপুরে বসবাস করতে থাকেন। এইভাবে শ্রীহট্ট থেকে এসেছিলেন ধর্মানুরাগী ও তেজস্বী অদ্বৈত আচার্য, জগন্নাথ মিশ্র এবং শ্রীবাসাদি আরও অনেকে। অদ্বৈত সঙ্গী মুসলমান

সাধক হরিদাস অবশ্য গৌড়েরই ভিন্ন স্থান থেকে এসে কৃত্তিবাস-প্রসিদ্ধ ফুলিয়ায় আশ্রম নির্মাণ করেন।

পত্নী শচীদেবীর সঙ্গে জগন্নাথ মিশ্র সামান্য একটি কুটির বেঁধে বাস করতে থাকেন নবদ্বীপের গঙ্গাতীরের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পল্লীর এক প্রান্তে। চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা মুরারির বিবরণ অনুসারে মিশ্র-পরিবার ছিল 'সুদরিদ্র'। এঁদের প্রথম পুত্র সন্তান বিশ্বরূপে অদ্বৈত আচার্য্যের কাছে ধর্মগ্রন্থ প'ড়ে বৈরাগী হয়ে অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করেন। বাল্যে নিমাই ছিলেন চপল, এমন কি দুরন্ত। সমবয়সী ছেলেদের মিলে গঙ্গার ঘাটে ও পাড়ায় লোককে বিব্রত করতেন, অথচ পড়শীরা তাঁকে ভালোও বাসতেন যথেষ্ট। নিমাই-গৌরাঙ্গ লেখাপড়া আরম্ভ করেছেন এমন সময় জগন্নাথ মিশ্রের লোকান্তর ঘটে। পাঠশালার প্রাথমিক শিক্ষান্তে কৈশোর টোলে পড়ার সময় নিমাইয়ের সেই দুরন্তপনা অন্যরূপ নিলে। টোলে কলাপ-ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন তিনি। ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা ক'রে তিনি শুধু সহপাঠীদেরই অপদস্থ করতেন না, বয়োজ্যেষ্ঠদেরও তর্কের মধ্যে টেনে এনে বিব্রত ক'রে তুলতেন। তার উপর চালচলন নিয়ে উচ্চারণ নিয়ে অন্যকে ব্যঙ্গ করেও মজা অনুভব করতেন। টোলের পড়া বেশ কিছুদূর এগিয়েছে এমন সময় গঙ্গার ঘাটে ও পথে বল্লভ আচার্য তনয়া লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি-বিনিময় হয় ও পরস্পর অনুরাগ জন্মে। বিবাহে উৎসুক হয়ে অন্যের মুখ দিয়ে মায়ের কাছে প্রস্তাব পাঠালে শচীদেবী প্রথমে তাতে সায় না দিয়ে বলেন – এখনও ওর পড়া শেষ হয়নি, উপার্জন ক'রে সংসার চালাতে সক্ষম হোলে তখন বিবাহ। কিন্তু ছেলের মনোভাবের দৃঢ়তা দেখে পরে শচীদেবী মতই দেন। তখন নিমাই-গৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম আনুমানিক সতেরো আঠারো। টোলে পড়ছেন, আর সেই সঙ্গে নিচের শ্রেণীর দু'চারজন ছাত্রকে পড়াচ্ছেনও। আবার, ব্যাকরণ পড়া সাঙ্গ না ক'রেই পৌরোহিত্য শিখছেন সংসারের ভরণ পোষণের উদ্দেশ্যে। এইভাবে দু'আড়াই বৎসর কাটলে পর গৌরাঙ্গ পূর্ববঙ্গ যাত্রা করলেন সেখানে টোল খুলে ও পৌরোহিত্য ক'রে সংসারের সম্বল জোটাতে। কিছুদিন পরে ঘরে ফিরে এসেই মর্মান্তিক সংবাদ শুনলেন যে সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু ঘটেছে। শচীমাতার ভয় ছিল বিশ্বরূপের মত নিমাইও না সংসার ত্যাগ করে। ফলে তিনি দ্রুত পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন করলেন। এবার ধনবান পন্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মায়ের সন্তোষবিধানের জন্য গৌরাঙ্গ নামতঃ দ্বিতীয় বিবাহ করলেন মাত্র। প্রায় বৎসর দুই পর সঙ্গীসহ গেলেন গয়ায়, পিতৃ পিন্ডদানের উদ্দেশ্যে। এই গয়া গমণই তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তনের কারণ হোল। তাঁর অন্তরে প্রসুপ্ত দেবস্বরূপের

আবির্ভাব ঘটালে।

গয়ায় গিয়ে দ্বৈতভাবের সাধক ঈশ্বরপুরীর সান্নিধ্যে এসে ও পাহাড়ের টিলায় মিদ্রিত বিষ্ণুপদ চিহ্ন দেখে তাঁর ভাবান্তর ঘটল। পুরাণ-বর্ণিত ও পদাবলীতে গীত রাধার ন্যায় কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন তিনি। 'কোথা কৃষ্ণ' ব'লে তাঁর ঘন ঘন অশ্রুপাত ঘটতে লাগল, সারা দেহ রোমাঞ্চে কন্টকিত হতে থাকল, কখনও ভাবে বিহ্বল হয়ে তিনি নাচতে ও মূর্ছা যেতে লাগলেন। কখনও বা দু'হাত তুলে যেন কৃষ্ণকে ধরার জন্য ছুটে যেতে লাগলেন। এ জাতীয় অদ্ভূত ব্যাপার দেখে সঙ্গীরা তাঁকে দ্রুত ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যগ্র হলেন। পথে লৌকিক চেতনা ফিরে এলে গৌরাঙ্গ তাঁদের জানালেন – এরকম আচরণ আমার ইচ্ছাকৃত নয়। মুরলীবাদনশীল এক কৃষ্ণবর্ণ কিশোরকে আমি দেখতে পাই, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারই বিরহে বিহ্বল হয়ে আমি নাচি কাঁদি, বাইরের বিশ্ব তখন আমার কাছে মুছে যায়। নবদ্বীপে ফিরে এলে এই ভাব-বিহ্বলতা তো কাটলই না বরং আরও বেড়ে উঠল। পাড়ার সকলে ভাবলে গোরা উন্মাদ হয়ে গেছে। শচীদেবী বায়ুশান্তির ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। ক্রমে শ্রীবাসাদি প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভালো ক'রে দেখে শুনে নির্ধারণ করলেন, এ বায়ু রোগ নয়, এ ঈশ্বরাবেশজনিত বিকার যা এর আগে কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। শুনে শচীদেবী আরও ভয় পেয়ে গেলেন এই ভেবে যে বিশ্বরূপের মত নিমাইও গৃহত্যাগ করবে। সেদিনকার সেই চপল ও তার্কিক প্রিয় কিশোরটির এ ধরণের অদ্ভূত ভাবান্তর ঘটে গেছে খবর পেয়ে শুদ্রপল্লী এমনকি মুসলমান পল্লী থেকেও দলে দলে লোক এসে গৌরাঙ্গের নৃত্য ও নামকীর্তন প্রত্যক্ষ ক'রে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন, কিন্তু সব শুনেও অগ্রাহ্য ক'রে উড়িয়ে দিলেন ব্রাহ্মণ পল্লীর বিত্তবান ও উন্নাসিক পন্ডিতেরা।

ঠিক হোল, প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীবাসের প্রশস্ত অঙ্গনে ভাবদেহী গৌরাঙ্গকে কেন্দ্রে রেখে খোলকরতাল সহ নৃত্যকীর্তন হবে। হতে লাগলও তাই। শ্রীবাসের অঙ্গন ভরে যেতে লাগল কৌতূহলী তথা ধর্মপ্রবণ অশিক্ষিত সাধারণ জনে। সংবাদ শুনে শান্তিপুর থেকে এসে যোগ দিতে লাগলেন অদ্বৈত আচার্য্য ও তাঁর সঙ্গে মুসলমান সাধক হরিদাস, বহুদূর থেকে এসে জুটলেন নিত্যানন্দ, শ্রীখন্ড থেকে মাঝে মধ্যে আসতে লাগলেন নরহরি, যোগ দিলেন গীতিকার ও কীর্তনিয়াদের দল, সহপাঠী ও সুগায়ক মুকুন্দ, গৌরাঙ্গের সতত পার্শ্বচর গদাধর এবং আরও অনেকে। অধিক রাত্রি পর্যন্ত নৃত্যকীর্তনের সঙ্গে গৌরাঙ্গের মূর্ছাদি বিকারের ও জনকোলাহলের বিরাম রইল না। এসব উৎপাত মনে ক'রে উত্তেজিত হলেন

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের দল, ভাবলেন দেশের জাতধর্ম নষ্ট করতে চাইছে গৌরাঙ্গের সঙ্গীরা। প্রচার করতে লাগলেন কিছু ধর্মদ্রোহী মদ্যপ নবদ্বীপে বিশৃঙ্খলা আনতে চাইছে। পিছনে লোক লাগালেন, জগাই ও মাধাইকে উত্তেজিত ক'রে গৌর-নিত্যানন্দের সমুচিত শাস্তিবিধানের আয়োজন করলেন। আর প্রতিদিন লোক পাঠিয়ে স্থানীয় প্রশাসক কাজীর কাছে নালিশ করতে লাগলেন। এদের কথায় কাজী প্রথম প্রথম পেয়াদা পাঠিয়ে কীর্তনিয়াদের নিগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু সেদিন হিন্দু-মুসলমান অগণিত ভক্ত ও কীর্তনিয়াদের সঙ্গে নবদ্বীপের রাজপথে শোভাযাত্রা করে গৌরাঙ্গ কাজীকে বুঝিয়ে দিলেন যে এ কোনও বিশৃঙ্খলার ব্যাপার নয়। এ এক মানবমুখী নবধর্মের প্রারম্ভ, তার পর থেকে কাজী নিরস্ত হলেন। ঐ শ্রীবাস অঙ্গনেই একদিন নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হোল যে গৌরাঙ্গ ঈশ্বর কৃষ্ণেরই মানবদেহধারী অবতার, প্রামধর্ম প্রচারের দ্বারা মূর্খ দরিদ্র ও সমাকে লাঞ্ছিত মানুষের অন্তর-ঐশ্বর্য্যের অভ্যুদয় ঘটিয়ে শূদ্রদ্রোহী ব্রাহ্মণদের থেকেও উচ্চে স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন।

কিন্তু এইভাবে সংসারের অনুবর্তী থেকেই নিজ ভাব প্রকাশের ও ধর্ম-প্রবর্তনের গুরুতর অসুবিধা অনুভব করতে লাগলেন গৌরহরি। মনে মনে সংকল্প নিলেন তাঁকে সংসার ত্যাগ করতে হবেই। নিত্যানন্দাদি ঘনিষ্ঠ দু'চারজন সহচরের সঙ্গে পরামর্শ করলেন ও কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ স্থির ক'রে ফেললেন। তখন তাঁর বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসরের শেষের দিক। ইং ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। শচীমাতা কিছুটা নিজ অনুভবে কিছুটা নিত্যানন্দ প্রমুখের কথাবার্তায় ব্যাপারটা অনুমান করেছিলেন, আর শেষের দিকে গৌরাঙ্গ নিজে তাঁকে ঐ নিদারুণ সংকল্পের কথা জানালে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সন্ন্যাস নেওয়ার আগের দিন রাত্রে গদাধরের সঙ্গে যবন হরিদাসকেও তিনি নিজ কক্ষে রেখেছিলেন। এদিকে শচীমাতা সারারাত্রি বাইরের সদর দরজায় বসে অশ্রুপাত করছেন। গৌরাঙ্গ বারংবার শচীমাতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রেও বারংবার প্রবোধ দিয়ে শেষবারের মত ঘর ছেড়ে বাইরে পদক্ষেপ করলেন।

পরের দিন মস্তক মুন্ডন ক'রে ও তার পরদিন সন্ন্যাস নিয়ে ও দীক্ষান্তে "শ্রীচৈতন্য" এই নোতুন নাম পেয়ে কৃষ্ণভাবে বিহ্বল অবস্থায় অনিশ্চিতভাবে বৃন্দাবনের পথে পা দিলেন গৌরহরি। সঙ্গে চললেন নিত্যানন্দ গদাধর ও চন্দ্রশেখর। দু'তিন দিন পথপরিক্রমা করার পর নিত্যানন্দ কৌশলে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে। আর সেখানে নিয়ে এলেন শচীদেবীকেও। অদ্বৈতগৃহে কয়েকদিন নৃত্যকীর্তনসহ যাপন ক'রে ও পুনরায় মায়ের রন্ধনের স্বাদ উপভোগ করে মায়েরই উপদেশে নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরে সন্ন্যাস জীবন কাটানোর সংকল্প নিয়ে রওনা হলেন নিজ একান্ত অন্তরঙ্গ নিত্যানন্দ, হরিদাস, গদাধর ও মুকুন্দকে নিয়ে।

সেখানে ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রের নির্দেশে তাঁর ও অন্যান্য পরিকরদের বাসগৃহ ও মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ স্থির হয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্রতাপরুদ্রের সভাপন্ডিত প্রবীণ বাসুদেব সার্বভৌমকে শ্রীচৈতন্য নিজ দৈব প্রভাবে অদ্বৈত মত থেকে ভক্তিপথে নিয়ে এলেন। আবার ভক্তির ধর্মে ও দর্শনে খ্যাত অঞ্চল দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পথে ওড়িশার রাজকর্মচারী তথা কৃষ্ণে অনুরাগী রামানন্দ রায়কে নিজ মহিমায় প্রভাবিত করে, পরে ফেরার পথে তাঁকে রাজকার্য ছাড়িয়ে নীলাচলে নিয়ে এসে নিজ পার্শ্বে রাখলেন। বৎসর-খানেক পর গৌড়ের পথ দিয়ে বৃন্দাবন পরিক্রমা করবেন স্থির করলেন, শ্রীচৈতন্য এসেছেন শুনে তাঁকে দেখার জন্য পথঘাট লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতে লাগল। কোনক্রমে লুকিয়ে চুরিয়ে নিশাযোগে চলতে চলতে গৌড় শহরের নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামে এসে পথের ধারে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। ঐ গ্রামেই বাস করতেন গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের অন্তরঙ্গ সচিব ও মন্ত্রী দুই ভাই দবীর খাস ও সাকর মল্লিক। এঁরা মূলে ব্রাহ্মণ হলেও রাজকার্য বশে ঐ আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। এদিকে দবীর খাস ছিলেন ভালো কবি ও সাকর মল্লিক ছিলেন শাস্ত্রবিৎ ও দার্শনিক। শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে এসেছেন শুনে তাঁরা এসে শ্রীচৈতন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ও বৈষয়িক জীবন থেকে তাঁদের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁদের উপদেশ দিলেন সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও গ্রন্থ নির্মাণ ক'রে রাগভক্তি প্রচার করতে, আর তাঁদের নূতন নাম দিলেন সনাতন ও রূপ ব'লে। রাগভক্তি মূলক কাব্যনাটক অলংকারশাস্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থ রচনা ক'রে এঁরা আজও বৈষ্ণবসমাজে বন্দনীয় হয়ে রয়েছেন। গৌড়ের পথে-ঘাটে বিপুল জনতার সমাবেশের খবর সুলতান হুসেন শাহের কানে পৌঁছালে পর সব জেনেশুনে নিয়ে তিনি তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন – এই দরবেশ যেখানে খুশি থাকুন বা চলুন, কেউ যেন কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি না করে তা দেখবে। কিন্তু সে যাত্রা শ্রীচৈতন্যের আর বৃন্দাবন যাওয়া ঘটল না। সনাতন উপদেশ দিলেন, এত লোক পিছনে নিয়ে বৃন্দাবন যাওয়া সঙ্গত হবে না। নীলাচলে ফিরলেন গৌরচন্দ্র। সেখানে ভক্তদের অনুরোধে বৎসর দুই স্থিরভাবে কাটিয়ে ঝাড়খন্ডের অরণয় পথ দিয়ে কোলমুন্ডাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে করতে ও তাদের ভক্তিধর্মে দীক্ষিত ক'রে বারাণসীতে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে বৃন্দাবন পৌঁছালেন। ভাবে আবিষ্ট হয়ে তীর্থ পরিক্রমা সেরে পরে কাশীতে ফিরে এসেও বৃন্দাবনের যাত্রী বৈরাগী সনাতনের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে তথা বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী পন্ডিত প্রকাশানন্দকে ভক্তিধর্মের পথ বুঝিয়ে দিয়ে নীলাচলে ফিরলেন।

এরপর মর্ত্যজীবনের শেষ আঠারো বৎসর নীলাচলে থেকে কখনও কৃষ্ণের বিরহ অনুভব ক'রে নিজ ভাবাবেশে নৃত্যে কীর্তনে তথা প্রলাপে ও মূর্ছায় কাটাতেন, লৌকিক চেতনা ফিরে এলে ভক্তদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন, আবার ন্যায়নীতি ও ধর্মের বিরোধী কিছু দেখলে

বিক্ষুব্ধতা প্রকাশ ক'রে তা নিবারণ করতেন। প্রতিবৎসরই রথযাত্রার সময় ধ'রে বাঙলা থেকে আসতেন পরিচিত ভক্তেরা আর সারা বছর ধরেই ভারতের নানা স্থান থেকে আসতেন বিখ্যাত পন্ডিত ও ভক্তিসাধকবৃন্দ। শ্রীচৈতন্যের ভাবময় অন্তর্জীবনের সঙ্গী ছিলেন রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর আর তাঁর পরিচর্যা করতেন ও পতন মূর্ছাদি বিকার থেকে সামলে রাখতেন জগদানন্দ ও গোবিন্দাদি অনুচরবর্গ। নীলাচলে তাঁর অবস্থানের সময়কার একটি উল্লেখ্য ঘটনা হোল – তাঁর নিকটবর্তী হয়ে ভক্তিধর্মের আচরণে জীবন কাটাবেন এই উদ্দেশ্যে কঠোর বৈরাগী মনোভাব নিয়ে বাড়ী থেকে গোপনে পালিয়ে আসেন জমিদার-তনয় রঘুনাথ দাস। শ্রীচৈতন্য তাঁকে নিজপার্শ্বে আশ্রয়দান ও সর্বতোভাবে ভক্তিধর্মের আচরণে দীক্ষিত করলেন। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর রঘুনাথ দাস বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাগভক্তির পথ সুনির্মিত করতে সাহায্য করেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে পরামর্শ দেন বাঙলায় থেকে মূর্খ সামান্য জনের মধ্যে নামকীর্তন প্রচার ক'রে তাদের ধর্মের অধিকারী ক'রে তুলতে। এইভাবে নীলাচলে রাগভক্তির ও মানবিকতার আশ্চর্য প্রকাশ দেখিয়ে মাত্র আচল্লিশ বৎসর বয়সে ১৫৩৩ খ্রীঃ শ্রীচৈতন্য তিরোহিত হলেন।

শ্রীচৈতন্য নীতিবাক্য ব'লে নিজমুখে ভক্তিধর্মের প্রচারের কাজ করেন নি, তাঁর ভাবময় আত্মপ্রকাশের ফলে শতগুণ প্রচারের কাজ আপনা থেকেই ঘটেছিল। এরই ফলে পূর্বাঞ্চলে ও বিশেষে গৌড়বাঙলায় অন্তত দু'শ বছর ধ'রে ভাবের প্লাবন বয়ে যায়। একদিকে শতাধিক কবির ভাবসৌন্দর্যে পূর্ণ প্রথম শ্রেণীর পদগীতি রচনা চলে, অনুদিকে কীর্তনে মুকগরিত হতে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দীর নিষ্প্রাণ বিমূঢ় গ্রামগুলি। মানুষের সেই উদ্বোধন আজও নিশ্চিহ্ন হয়নি, আচার আচারণে ও সাহিত্যিক প্রয়াসের মধ্যে সেই ভাবের প্রবাহ ক্ষীণ ধারায় আজও বয়ে চলেছে। মুর্হুমুহু নিজভাবপ্রকাশে ব্যাকুলিত শ্রীচৈতন্য প্রচারের কাজ করতে পারেননি, প্রচারের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, রূপ সনাতনাদির উপর, তবে সমাহিত অবস্থার অবকাশে হরিনামের মাহাত্মজ্ঞাপক কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছিলেন মাঝে মধ্যে। বারংবার নামের উচ্চারণের ফলে চিত্তধৌত হয়, সাংসারিক মলিনতা দূর হয়ে যায় এবং বেদবেদান্তে কথিত দুর্লভ আনন্দলোক সহজেই আয়ত্ত্ব করা যায়, এই ছিল তাঁর নিজ উপলব্ধ বক্তব্য। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজে ধর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত অগণিত মানুষের মুক্তির জন্যই এই সহজ পথনির্দেশ। এই শ্লোকগুলির একটিতে নামের বা ভক্তিধর্মের বিশেষভাবে অধিকারী যাঁরা তা এইভাবে জানিয়েছেন – যারা তৃণের চেয়েও সুনীচ, তরুর মতই সহিষ্ণু হয়ে যারা আঘাত সহ্য ক'রে চলেছে, সমাজে যারা মানমর্যাদাহীন অথচ অন্যকে সম্মান দিতে সতত উদগ্রীব তারাই নামভক্তির যথার্থ অধিকারী। শ্রীচৈতন্যের এই মানবীয়তার তুলনা দেখা যায় না।

গৌরাঙ্গ – শ্রীচৈতন্য যেমন কৃত্রিম জাতিবর্ণভেদের প্রবল বিরোধী ছিলেন, তেমনি ধর্ম নিয়ে মানুষের সৃষ্ট সম্প্রদায়-বিভেদও মানেন নি। তাঁর উপলব্ধ নব ভক্তিধর্মে ব্রাহ্মণ, চন্ডাল, মুসলমান সকলেই সমপর্যায়ের। এ বিষয়ে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। নবদ্বীপে প্রাথমিক ভক্তিপ্রকাশের অবসরে হীনশূদ্র শ্রীধরের গৃহে সঙ্গীদল সহ উপনীত হয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় শ্রীধরের লোহার কলসী মুখে তুলে জলপান করেছিলেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে নৃত্যকীর্তন করার সময় সমবেত ভক্তদের যে আলিঙ্গন দিতেন তাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র মুসলমান কোনও কিছু বিচার করতেন না। হরিনামের অবিরাম সাধক মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হরিদাসকে তিনি সকলের চেয়ে বেশি সমাদর করতেন। প্রতি প্রাতে জগন্নাথ দর্শন ক'রে হরিদাসের কুটিরে গিয়ে কুশল সমাচার নিয়ে তবেই নিজ আবাসে ফিরতেন তিনি। সেই হরিদাস দেহরক্ষা করলে পর তাঁর পাদোদক তিনি ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং অন্যের সঙ্গে নিজেও তাঁর দেহ কাঁধে নিয়ে সমাধিস্থলে যান। অন্যপক্ষে মুসলমানেরাও শ্রীচৈতন্যকে কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন তার পরিচয় কয়েকটি ঘটনায় পাওয়া যাচ্ছে। বৃন্দাবন যাওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে অনুচরবর্গসহ তিনি যখন গৌড়ে যাবেন ঐ সময় সীমানা নিয়ে ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে বাঙলার সুলতান হুসেন শা'র বিবাদ চলছিল। নদীপথ দিয়ে যাতায়ার বন্ধ। সুবর্ণরেখা ও ভাগীরথীতে মুসলমান সৈন্যের কড়া পাহারা। অথচ শ্রীচৈতন্যকে দেখে মুসলমান সেনাপতি পুনঃপুন অভিবাদন জানিয়ে তাঁকে সসৈন্যে মেদিনীপুর জেলার অভ্যন্তরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেন। আবার গৌড় থেকে ফিরে আসার সময়েও শ্রীচৈতন্যকে এইভাবেই সাহায্য করেন তাঁরা। বৃন্দাবন-পরিক্রমা থেকে ফেরার পথে ভক্তপরিকরদের নিয়ে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করছিলেন শ্রীচৈতন্য। সাধু ফকিরের ছদ্মবেশে চোরডাকাত এই সন্দেহে সেখানকার পাঠান সরদার বিজুলি খাঁ সসৈন্যে তাঁদের ঘেরাও করে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ভাবাবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে ও তাঁর কথা শুনে শেষে বারংবার সালাম জানিয়ে ফিরে যায়। শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত রাগভক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেকালের অগণিত হিন্দু পদ-রচয়িতাদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন মুসলমান কবিও সমাদরযোগ্য উত্তম পদ রচনা ক'রে গেছেন। সেই মধ্যযুগীয় ভাবাদর্শ ক্ষয়িত হয়েও তার অম্লান সাক্ষ্য রেখে গেছে শ্রীচৈতন্যের চরিত বিষয়ক কাব্যে ও পদগীতি কীর্তনে।

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের জুলুম আজকের সমাজে আর তেমন নেই। অস্পৃশ্যতাও ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। কিন্তু জাতিবর্ণ-সম্প্রদায় ভেদ দলীয় রাজনীতির আশ্রয়ে ভিন্ন রূপে পুনরায় পুষ্ট হয়ে ভারতকে কলঙ্কিত করতে চাইছে। আজকের এই অবসরে সেদিনকার ব্রাহ্মণ্য দর্পের ঘোর প্রতিবাদী ও নিঃশেষ মানবীয়তার প্রতিষ্ঠাতা গৌর-শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে বারংবার নমস্কার নিবেদন করি।

রাজনীতি, সমাজ ও শ্রীচৈতন্য

উনিশ শতকের আগে ইতিহাসের তিন হাজার বছর ধ'রে ভারতীয় জনসাধারণের নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্‌যোগ প্রায় কিছুই ছিল না বললেই চলে। ছিল সামাজিক উদ্‌যোগ, আর সমাজ নিয়ন্ত্রিত থাকত সামন্ত ভূম্যধিকারী সমর্থিত ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্র অথবা কোন-না-কোন ধর্মের সূত্রে। ধর্ম বলতে দেবকেন্দ্রিক অথবা নীতিকেন্দ্রিক নানান্ আচার-অনুষ্ঠান, যা অবশ্য-প্রতিপাল্য ছিল। উচ্চবর্ণের ধর্মীয়তার পিছনে ছিল শাস্ত্র, হীনবর্ণে ছিল উচ্চবর্ণের অনুকরণ এবং সেই সঙ্গে আদিবাসী জীবন থেকে পাওয়া প্রাকৃতিক উপদেবতায় বিশ্বাস, যা আবার উচ্চবর্ণেও শাস্ত্রসম্মত করে নেওয়া হয়েছিল। রাজা এবং সামন্ত রাজারা এবং তাঁদের অধীন কিছু রাজপুরুষ থাকতেন রাজ্য-পরিচালন, দেশ জয়, যুদ্ধ এবং কর শুল্ক সংগ্রহ প্রভৃতি নিয়ে। প্রয়োজনে সাধারণ জন থেকে সৈন্য সংগ্রহ করার রীতি ছিল, আর করভার বৃদ্ধি পেলে প্রজারা অন্তরে বিক্ষুব্ধ হ'ত এবং হয়ত বা গ্রাম-প্রধানদের দিয়ে স্থানীয় প্রশাসকের কাছে আবেদন-নিবেদন করত, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ধর্মনীতিই ছিল জীবননীতি এবং বহিরঙ্গভাবে আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন যাঁরা বজায় রেখে চলতেন,, সাধারণ জন তাঁদের মান্য করতেন। "আমি ঠিক ঠিক জাত-ধর্ম পালন করি মশায়, পৈতৃক আচার-অনুষ্ঠান বজায় রাখি" – এটাই ছিল কোনো ব্যক্তির পক্ষে গৌরবের। এরকম মনোভাবকে আজ আমরা সামন্ততান্ত্রিক বা মধ্যযুগীয় ব'লে থাকি, যা থেকে আমাদের শিক্ষিতদেরও অনেকের এখনও মুক্তি ঘটেনি, এবং যে বিষয়ে বর্তমান রাষ্ট্রনেতাদের হস্তক্ষেপ করার অনিচ্ছার মধ্যেই দেশে ধনতান্ত্রিক নিষ্পেষণের পালা এসে পড়েছে। নানান্ প্রয়োজন-সংঘাতে বিচ্ছিন্নতা এবং বিভেদবুদ্ধি প্রশ্রয় পাচ্ছে ব'লে বিবেকীরা প্রতিবাদ ক'রে চলেছেন, কারণ, আজকের দিনের ঐক্য ও সংহতি সামাজিক ও ধর্মনৈতিক নয়, রাষ্ট্রনৈতিক। আগেকার ভারতে ছোট ছোট রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে বিচ্ছিন্নতা থাকা সত্ত্বেও যে-যে কারণে ভারতীয়তা ব'লে একটা ব্যাপার সব বাইরের বিচ্ছিন্নতাকে আবৃত ক'রে থাকত আজ আর তা নেই, তার উপর প্রাদেশিক ভাষাগুলি পরস্পর

অনেকটা দূরে সরে গেছে। মধ্যযুগের সামন্ত্রতান্ত্রিকতায় রাষ্ট্রবিষয়ে উদাসীন মানুষের শাস্ত্র-প্রবণতার ব্যাপারটি রাজারা ও তদাশ্রিত শাস্ত্রকারেরা সদ্ব্যবহার করেছেন, এমনভাবে, যাতে জন-আন্দোলনের কোনো সুযোগই না ঘটে, আর দেখেছেন যেন স্ব স্ব ধর্মে আস্থাবান থেকে প্রজারা শান্তভাবে দিন কাটায়। নোতুন ধর্মের আন্দোলন জনসমাজকে মাঝে মাঝে নাড়া দিলেও তাতে রাজ-অধিকার বা প্রশাসন ব্যবস্থার কোনো বিপর্যয় না এলে রাষ্ট্র তা উপেক্ষা করেই এসেছে, সমাজের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ক'রে কর-আদায় ও প্রশাসন ব্যবস্থায় বিঘ্ন ডেকে আনতে চায়নি। ইয়োরোপে বরং ধর্মীয় সমাজ ও রাষ্ট্র আরও ঘনিষ্ঠ থাকায় রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মীয় ব্যবস্থার সংঘাত ঘটেছে বারংবার। ভারতে এ ধরণের সংঘাতের পরিচয় কেবল একবারই পাওয়া যায়, সে বিম্বিসারের বৌদ্ধধর্ম বরণের পর অজাতশত্রুর প্রতিবাদে। মহাভারতের যুদ্ধকেও ধর্মাদর্শের সংঘাত বলা যাবে না। ফলত দেখা যায়, তুর্কী, পাঠান মোগল আক্রমণে ভারতীয় সমাজে তেমন কোন বিপর্যয় ঘটেনি, মিশ্রণ হয়েছিল সূফী ইসলামের সঙ্গে হিন্দুধর্মের ও ভাববাদের। ইংরেজরাও আমাদের ধর্ম বা সংস্কার বিষয় উদাসীনই ছিল, অথচ যাবতীয় দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন চেয়েছিলাম আমরাই। আমরাই তাদের দর্শন ও রাষ্ট্রনীতি অধ্যয়ন ক'রে নিয়ে সমাজ- পরিবর্তন ও স্বাধীনতা চেয়েছি।

খিলজী পাঠানদের বাঙলা অধিকারের ফলাফল হিসাবে ঐতিহাসিকেরা কোনো সামাজিক বিপর্যয় দেখেন নি, বরং ক্রমশ রাজা-প্রজার মধ্যে বোঝাবুঝি মিলমিশই লক্ষ্য করেছেন। দেখেছেন তুর্কী-পূর্ব বাঙলায় যেমন হিন্দু জমিদার বা সামন্তদের স্থানীয় প্রাধান্য ছিল, পরে তা তেমনিই রইল, প্রাথমিক পঞ্চাশ-ষাট বছরের একটা অস্থির অবস্থার পর থেকে। প্রথম দিকে যুদ্ধ অভিযানের জন্য কোনো কোনো সুলতান জমিদারদের কাছ থেকে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক দাবি করতেন, পরে তা ক'মে গিয়ে তিন ভাগের একভাগে দাঁড়ায়। বাঙলায় হিন্দু জমিদারী প্রশাসন চালু থাকার জন্যও বটে, আর সুলতানেরা ধার্মিক ও পন্ডিতদের সাহায্য করতেন বলেও বটে, সমাজের অভ্যন্তরে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রাধান্য অব্যাহতই ছিল। এই জন্যই মধ্যযুগে সংস্কৃতে ও বাঙলায় এত বই লেখা সম্ভব হয়েছে এবং লোকজীবনে শিব, চন্ডী, মনসা প্রভৃতি নিয়ে ব্রতকথা, পূজানুষ্ঠান ও কাব্য রচনা একই সঙ্গে চলতে পেরেছে। বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা জয়দেবের গীতগোবিন্দের পর দু'শ বছর অন্য কোনও রচনা পাচ্ছেন না ব'লে কাকতালীয় অনুমান ধ'রে নিয়েছেন যে খিলজী, মামুলক, এমনকি ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানেরাও হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিলেন তাই সাহিত্য রচনা হয়নি। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়, আসলে ঐ সময়কার অত প্রাচীন পুঁথি আমরা পাইনি। ঐ

সময়কার একটি লক্ষনীয় ঘটনা হ'ল তুর্কীদের সঙ্গে ভারতে তথা বাঙলায় বহু মুসলমান সুফী দরবেশ অনুপ্রবিষ্ট হন। এঁদের কাজ ছিল ভাবুকতাময় প্রেমধর্ম প্রচার করা। এঁরা নামে ইসলাম ধর্মীয় হলেও বাস্তবে প্রেমভাবুক ছিলেন। এঁরা ভারতীয় সাধকদের মত আল্লাহর নাম-গান, ধ্যান, কীর্তন করতেন, এমন কি ভাবাবস্থায় মূর্ছিতও হতেন। ঐ সময় বাঙলায় ঠিক ঐ ধরণের ঈশ্বরপ্রীতির ভাব ছিল না। ছিল কৌলিন্য, ছিল পুরান শাস্ত্র ও আচার অনুষ্ঠান পালনের বাতিক। এর ফলে নিম্নস্তরের হিন্দুদের অনেকেই নিষ্ঠাবান্ সূফী ভক্তদের প্রতি আসক্ত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। মুখ্যভাবে এ থেকেই বাঙলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বিস্তার। পরে যখন শ্রীচৈতন্য হিন্দুধর্মের মধ্যে ঐ ধরণের ঈশ্বরভক্তি প্রমাণ ক'রে দেখান তখন থেকে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা কম হতে থাকে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হীনবর্ণের প্রতি ঘৃণার ভাবও সাময়িকভাবে কমে যায়। ইসলাম ধর্ম বাঙলায় আসার একটা পরোক্ষ ফল বাঙলা ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রসার। সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা অবশ্য এ কথা স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন এরই ফলে মঙ্গলকাব্যগুলির ছড়া ও ব্রতকথার রূপ কাব্যিক আকার লাভ করে। আমরা কিন্তু আরও এগিয়ে যেতে পারি। আমরা মনে করি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো রাধাকৃষ্ণ-নির্ভর পরকীয়া প্রীতিমূলক কাব্য রচনার মূলে ইউসুফ-জোলেখার প্রণয়কাহিনী ছিল। একথা মনে করার প্রধান কারণ রাধিকার স্বামী আয়ানকে অর্থাৎ অভিমন্যুকে নপুংসক রূপে কবির বর্ণনা। এরকম ব্যাপার হিন্দু পুরাণে কোথাও দেখা যায় না, অথচ ইউসুফ জোলেখার কাহিনীতে রয়েছে। সেখানে জোলেখার স্বামী পোতিফার নপুংসক। প্রণয়ের বর্ণনার রীতিতেও বেশ মিল রয়েছে। এ কাহিনী প্রেমিক সূফীরা বহন করে এনেছিলেন। তা ছাড়া গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সমসাময়িক শাহ মহম্মদ সগীর সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার আগেই ঐ কাহিনী বাঙলায় লেখেন। সুতরাং মুসলমান শাসকেরা গ্রামকে গ্রাম লুঠতরাজ করে ও সাহিত্য শিল্পকে স্তব্ধ করে দেয় এ কল্পনা ঠিক নয়। এমনও হতে পারে যে কৌলিন্যের প্রাধান্যে সাধারণ জন ঘৃণিত ও শোষিত হতে হতে বিদেশী শাসনই কামনা করেছিল, যেমনটা ঘটেছিল আমাদের ইংরেজ শাসনকে অভিনন্দিত করার ব্যাপারে। ধর্মপূজা বিষয়ক ছড়ার নিগৃহীত নিম্নবর্ণের মানুষদের মুসলিম শাসনকে অভ্যর্থনা করার একটি অধ্যায়ও রয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেকার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থা এখন ভেবে দেখা যেতে পারে। একদিকে ইতিবৃত্ত এবং অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যের জীবনী নিয়ে লেখা কাব্যগুলি মুখ্যতঃ এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য। তবে জীবনী-কাব্যের প্রদত্ত ঘটনাগুলিকে ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। কারণ, জীবনীকার জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায়

এমন একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন যা ইতিহাসের সঙ্গে মেলে না। এমনকি, অন্যান্য জীবনী কাব্যগুলির সঙ্গেও না। সেটি হ'ল এই যে নবদ্বীপের নিকটবর্তী পীরালি গ্রামের যবনেরা নবদ্বীপের হিন্দুদের মেরে কেটে উচ্ছন্ন করেছিল। আর মুসলমান হরিদাস হরিনাম করতেন ব'লে তাঁকে বাইশবাজারে বেত মারা হয়। এরকম কিছু অপ্রামাণিক ও আতিশয্যমূলক কল্পকাহিনী নানা কারণে লোকমুখে গড়ে ওঠে। ইতিহাসের পরিবেশ মিলিয়ে এসব গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে। শ্রীচৈতন্যের জন্মের আগে এবং সম্ভবত তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে আসার সময় গৌড়ের সুলতান বিখ্যাত রুকনুদ্দীন বারবক কৃতী হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অনেককে উচ্চরাজপদে নিয়োগ করেছিলেন। একজন হিন্দু জমিদারের আনীত অভিযোগের জন্য ইনি তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি ইসমাইল গাজীকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন। পরবর্তী ইউসুফ শাহ এবং জালালুদ্দীন ফতশাহ (১৪৮৭ খ্রীঃ পর্যন্ত) দক্ষতা ও উদারতার সঙ্গেই বাঙলা শাসন করেন। এরপর অবশ্য হাবসীদের রাজত্ব আরম্ভ হয়, যাদের মধ্যে শামসউদ্দীন মুজাফ্ফর অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর অপশাসন ছিল মাত্র দু' বছরের জন্য। তারপরই সুলতান-শ্রেষ্ঠ হুসেন শাহ তাঁকে হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। 'উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ' এ যদি সত্য হ'ত তাহলে ঐ সময়ে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের অত ঐশ্বর্য ও প্রতাপের বর্ণনা চরিতগ্রন্থে দুর্লভ হ'ত আর শ্রীচৈতন্যের প্রবল ব্রাহ্মণ-বিরাগের কারণও থাকত না। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের মতো, বরং আরও বেশি পরিমাণেই, হুসেন শাহ হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন। এমনকি একান্ত অন্তরঙ্গ চিকিৎসক ও আত্মসচিব হিসাবেও।

আমরা পূর্বেই আভাস দিয়েছি যে হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা ও সাহিত্যসেবীরা সুলতানদের দ্বারা আগাগোড়াই উৎসাহিত হয়েছেন। এ রকম উৎসাহ অর্থাৎ আর্থিক সহায়তায় পরিস্ফীত হওয়ার মুখ্য দৃষ্টান্ত বহন করছে তখনকার নবদ্বীপ শহর। পুরাতন গঙ্গার দক্ষিণ ও পূর্ব তীর ধ'রে ব্রাহ্মণদের বসবাস ছিল আর কাঁসারি, শাঁখারি, তাম্বুলিক প্রভৃতি শ্রেণীর শূদ্রেরা ও মুসলমানরা বাস করতেন মোটামুটি প্রত্যন্ত দক্ষিণ ও প্রত্যন্ত পূর্বে এই শূদ্রদের 'নগরিয়া' অর্থাৎ বহুপূর্ব থেকেই 'নগরের' অধিবাসী এমন বলা হ'ত। নবদ্বীপ যে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ছিল বা তার চেয়েও বেশি, তার মূলে নিশ্চয়ই প্রশাসনের সহায়তা ছিল। যাই হোক, কিছু পড়াশোনার সঙ্গে বড় হবার পর থেকেই নিমাই পন্ডিত (যে কোনও ব্রাহ্মণই সেকালে পন্ডিত আখ্যায় পরিচিত হতেন) ঐসব স্মার্ত নৈয়ায়িক ও বেদান্তবাদী পন্ডিতদের উন্নাসিকতা ও মানুষ-ঘৃণার পরিচয় পেয়ে তাঁদের পল্লী এড়িয়ে চলতেন এবং দরিদ্র মানহীন নগরিয়া শূদ্রদের পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন

সহপাঠীদের সঙ্গে। এসব সংবাদ দিচ্ছেন চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা মুরারি এবং তাঁর পরবর্তী জীবনীলেখক বৃন্দাবন দাস। তাঁদের বর্ণনায় মনে হয় যে সাধারণ মানুষ স্থানীয় প্রশাসক কাজি বা দেওয়ানের প্রশাসনকে ভয় করে চলতেন, যদিও ভয়ের প্রত্যক্ষ কোনো কারণ ঘটেনি। শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের সংকীর্তনে কাজির লোকজন যে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন তার কারণ পন্ডিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কাজির কাছে অহরহ 'লাগানি'। এ তথ্যও বৃন্দাবন দিচ্ছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁর পিছনে জনসমর্থন দেখিয়ে যুক্তি-তর্ক সহ বোঝানোর পর কাজি তাঁর সাময়িক বিদ্বেষ ত্যাগও করেছিলেন। বস্তুত স্থানীয় কাজি বা কোতোয়ালের সঙ্গে তখনকার নগর গ্রামের লোকের মোটামুটি পরিচয়ই থাকত।

তখনকার দিনে জনসাধারণের পলিটিক্স্ ব'লে কিছু ছিল না, আর শ্রীচৈতন্যও রাজনৈতিক সমর্থন বা বিরোধিতা কিছুই করেননি। ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রকে অনুগ্রহ করার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া অনেকেরই জানা। কিন্তু তাঁর প্রেমভক্তির আদর্শের পিছনে প্রবল জনসমর্থন রাজনীতিক কৌশলের থেকে ঢের বেশি কাজ করেছিল, যার ফলে সুলতান হুসেন শাহ বিস্মিত হয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, এই দরবেশ যেমন খুশী থাকুন বা চলুন, কেউ যেন বাধা না দেয়। আর তাঁর আত্মসচিব শ্রীরূপ কাজ ছেড়ে দিয়ে শ্রীচৈতন্যের শরণ নিলে পর তাঁর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তিনি নেননি। একমাত্র শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠ সনাতনকে তিনি কারারুদ্ধ বা নজরবন্দী করেছিলেন এই কারণে যে, প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধের বিপদের মুহূর্তে সনাতন মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। যাঁরা মনে করেন শ্রীচৈতন্য লোকজনসহ কাজিকে ভয় দেখাতে গিয়েছিলেন তাঁরা ভুল করেন। সেটা সম্ভব ছিল না, আর তাঁর প্রবৃত্তিও যে সেরকম ছিল না তা দেখিয়ে কাজির ক্রোধ প্রশমনের যে চিত্র চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখিয়েছেন তা-ই ঠিক। চৈতন্য-ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের কাজির উপর ক্ষুব্ধ থাকার কারণ ভিন্ন। রাজ-প্রশাসনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের কোনো সম্পর্ক না থাকার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতে দেওয়া হয়েছে এই ঘটনা, যা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। পুরীতে তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর রায় রামানন্দের ছোট ভাই গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজভান্ডারে জমা দেওয়ার শুল্কের টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন, প্রশাসন থেকে পুনঃপুনঃ তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও টাকা দেননি। পরিশেষে হত্যার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা হলে পর শ্রীচৈতন্যের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ও রাজপন্ডিত সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যকে অনুরোধ করেন যে, তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রকে বললে তবেই গোপীনাথ মৃত্যুদন্ড থেকে অব্যাহতি পান। এতে শ্রীচৈতন্য ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং নীলাচল ত্যাগ করে যাওয়ার মনোভাব দেখান। পরে সার্বভোম – গোপীনাথকে মুক্তি দেওয়া শ্রীচৈতন্যের

অভিপ্রায় – এই কথা নিজে থেকেই জানিয়ে মৃত্যুদন্ড মুকুব করিয়ে নিলে পর ব্যাপারটা যখন শ্রীচৈতন্যের কানে গেল তখন তিনি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন। হুসেন শাহের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের সীমানা নিয়ে কলহের সময় শ্রীচৈতন্য কাউকে কিছুই বলেননি, কোনো মনোভাবই প্রকাশ করেননি। সুতরাং নিজ উপলব্ধ প্রেমভক্তির প্রচারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো পলিটিক্সের মধ্যেই তিনি যাননি, ধর্মের এবং সেই সঙ্গে সামাজিক আলোড়নের ব্যাপার নিয়ে রাজশক্তিও মাথা ঘামায়নি, তবে ব্যক্তিগতভাবে রাজা বা প্রশাসক ধর্মে বিশ্বাস রাখতে পারতেন, যেমন করেছিলেন প্রতাপরুদ্র এবং পাঠান সর্দার বিজুলী খাঁ। বস্তুত ধর্মের ভূমিকা তখনকার হিন্দু-মুসলিম দুই সমাজেই খুব প্রবল ছিল। যদিও রাজ প্রশাসনে ধর্মান্তরকরণ ছিল নিষিদ্ধ।

শ্রীচৈতন্য প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মেছিলেন। ক্রুদ্ধও হতেন। কিন্তু তাঁর এই প্রতিবাদ ছিল ব্যক্তিগত বা সামাজিক অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে। কৃষ্ণের নাম না নিয়ে তাঁর নিজের নাম নিয়ে কীর্তন করলে তিনি চটে যেতেন, আর কোথাও তাঁর স্তবস্তুতি দেখলে বা শুনলে তিনি বিক্ষুব্ধ হতেন। রাজপন্ডিত সার্বভৌম কর্তৃক লিখিত তাঁর স্তুতিশ্লোক তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এরকম বেশ কয়েকটি ঘটনা চরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কীর্তনিয়া ছোট হরিদাসের নারী-সম্ভাষণের ঘটনায়। জীবনীকার বলেননি, কিন্তু মনে হয় ছোট হরিদাস ও মাধবী দেবীর চরিত্রের উপর তাঁর পূর্বেই সন্দেহ ছিল। আর সেই মাধবীদেবীর প্রদত্ত অন্ন তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে ব'লে তাঁর ক্রোধের সীমা ছিল না। এজন্য ছোট হরিদাস প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেও তাকে ক্ষমা করেননি। বাল্যকালে তিনি মাতার উপরেও মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হতেন। পরে বয়সে প্রবীণতা অর্জন করেও একদিন বিশেষ কারণে শচীদেবীর উপর রুষ্ট হয়ে প্রকৃত সন্ন্যাস নেওয়ার আগেই সন্ন্যাসের সংকল্প নিয়ে গৃহত্যাগ করেন, তবে অনুচরদের আশ্বাস পাওয়ায় ঘরে ফিরে আসেন। ঘটনাটি সম্ভবত বিষ্ণুপ্রিয়াকে কেন্দ্র ক'রে। লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা মুরারি এ বর্ণনা দিচ্ছেন, যদিচ বিষয়টির অসংলগ্নভাবে বর্ণনা দেওয়া রয়েছে। আসলে বোঝা যায় যে মুরারি বর্ণিত ঘটনার অনেকটাই তাঁর পুঁথি থেকে বর্জন ক'রে ওলট-পালট করা হয়েছিল এবং এটা করা হয়েছিল মুরারির দেহত্যাগের প্রায় সমকালেই, যাতে সংস্কার-করা পুঁথিই প্রচারিত হয়। ঐ গ্রন্থের ১ম প্রক্রমে যেমন শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার মাঝাখানেই তাঁর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের এক পৃষ্ঠা ঢুকে গেছে, তেমনি দ্বিতীয় প্রক্রমের দু'এক পৃষ্ঠা বর্জিতও হয়েছে দেখি , কারণ, বারো সর্গে বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার দৃশ্যের পর পরই হুড়মুড় ক'রে অপ্রাসঙ্গিকভাবে শ্রীচৈতন্যের ক্রুদ্ধ হয়ে সংঙ্গীদের নিয়ে মুরারিগৃহে উপস্থিতি, লিপিকার বিজয়ের গৃহে

রাত্রিযাপন ও প্রত্যুষে সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য গঙ্গা পার হওয়া ও সঙ্গীদের অনুরোধে ফিরে আসার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কী কারণে কী হয়েছিল তার কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল তাঁর মুখের একটি কথায় দেখা যাচ্ছে যে, তিনি মায়ের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগের ও সন্ন্যাস সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। প্রথম শ্রীবাসের গৃহে যান অথচ মূল গ্রন্থে তারও উল্লেখ নেই, প্রত্যাবর্তনের সময় 'পুনরায় শ্রীবাসের গৃহে ফিরে এলেন' এমনই বলা হয়েছে। আমাদের মনে হয়, ঐ তুলে নেওয়া অংশে মাতার উপর ক্রোধের কারণ বর্ণনা করা ছিল এবং অনুমান হয় শ্রীচৈতন্যকে সংসারী করার অত্যাধিক আগ্রহের বশে শচীদেবী কোনও প্রকারে তাঁর বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্মিলন ঘটানোর আয়োজন ক'রে থাকবেন। তাতেই ক্রোধ এবং তারই বশে তখনই সন্ন্যাস নেওয়ার সংকল্প করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। মুরারিত গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রক্রমেও এরকম অসংগঠিত ও জোড়াতাড়া লাগানো বর্ণনায় বাহুল্য দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য- ভক্তেরা একটি ঘটনার বিবরণে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন। সেটি হ'ল বৃন্দাবন-পরিক্রমা ক'রে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি নবদ্বীপে আসেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে সম্ভাষণ করেন। অবশ্য সন্ন্যাসী-রূপ ধ'রে না দেখা দিয়ে নিজেরই অন্য মূর্তিতে প্রিয়া-সকাশে এসেছিলেন এমন অদ্ভূত বর্ণনা রয়েছে। আসলে এটি ভুল তথ্য। বৃন্দাবন থেকে ফেরার সময় ঝাড়খন্ডের পথ দিয়ে নীলাচলে আসেন এই তথ্যই চরিতামৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। আর, চরিতামৃতই নীলাচল-লীলা বর্ণনার সবচেয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ। আসলে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা মুরারি ছিলেন না। তবে গোড়ার দিকের সামান্য কিছু বিবরণ তিনি লিখে থাকতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যের জীবনের আনুপূর্বিক সব ঘটনা আজকের দিনে আমরা জানতে চাই। কিন্তু এ বিষয়ে চরিতগ্রন্থগুলি আমাদের পূর্ণ পরিতৃপ্ত করে না। অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনার প্রসঙ্গ বাদ দিলেও দেখা যায় প্রত্যাশিত অনেক কিছুই বলা হয়নি। বিশেষে এমন অবিশ্বাস্য বর্ণনাও রয়েছে যে শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণদের খুব সমাদর করতেন এবং ব্রাহ্মণদের হাতে ছাড়া অন্য কোথাও অন্ন গ্রহণ করতেন না। যে শ্রীচৈতন্য শাস্ত্র ও তত্ত্ববাদী ব্রাহ্মণ্যের আগাগোড়া বিদ্বেষী ছিলেন, যিনি মুসলমান হরিদাসকে স্বগৃহে স্থান দিয়েছিলেন এবং সেই হরিদাস ঠাকুর দেহরক্ষার পর তাঁর পদধূলি ভক্তদের নিতে বলেছিলেন, সমাজ-নিগৃহীত হীনবর্ণের মানুষের জন্যই যিনি নামমন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁর এরকম ব্রাহ্মণাসক্তি অবিশ্বাস্য। বিশেষে সন্ন্যাস নেওয়ার পর শাস্ত্রীর নিষেধ তো তাঁর উপর প্রযোজ্য ছিল না। অরণ্য- পথে কোল-মুন্ডাদের অঞ্চল পার হয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় তাঁর প্রচ্ছন্ন মানবিকতা কি প্রকাশ পায়নি? তিনি কি তাদের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন নি? বেশ বোঝা যায়, শ্রীচৈতন্যের অনুবর্তী ভক্তসম্প্রদায় তাঁর ও নিত্যানন্দের মত শাস্ত্রনিষ্ঠা ও আচার

সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি। মুরারির পরিবর্তিত গ্রন্থে তো মুহুর্মুহু ব্রাহ্মণ-মহিমার কীর্তন দেখা যায়। অবশ্য এও ঠিক যে শ্রীচৈতন্য যতই বাউলভাবাপন্ন হোন না কেন, বহিরঙ্গভাবে লোকাচার বজায় রাখার জন্য মাঝে-মাঝে চেষ্টিত হতেন, নিত্যানন্দের মত একেবারে উদ্দাম হতে পারেন নি। নিত্যানন্দের উদ্দামতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অদ্বৈত আচার্য্যের। শ্রীচৈতন্যের দেহরক্ষার কয়েকমাস আগে নবদ্বীপ থেকে তিনি একটি তর্জা লিখে পাঠান। তাতে এই অভিযোগ ছিল যে – নিত্যানন্দ এত মচ্ছব লাগিয়েছেন যে হাটে চাউল দুর্লভ হয়েছে, আর জাত-পাতের বিচার তিনি এমনভাবে তুলে দিতে চাইছেন যে, "লোকে হইল আউল" অর্থাৎ জনসমাজ আকুল বা এলোমেলো হয়ে পড়েছে, কোনও আচার সংস্কারের বাঁধন কেউ মানছে না। নরনারী সম্পর্কের মধ্যেও এই বাঁধন-ছাড়া মনোভাব দেখা দিয়েছে। চরিতামৃতকার লিখছেন যে, এই তর্জা পড়ে শ্রীচৈতন্য চিন্তাকুল হয়েছিলেন। কিন্তু এর কোনও প্রত্যুত্তর বা নিষেধসূচক কিছু তিনি লিখে পাঠান নি। আমাদের মনে হয়, ভক্তিধর্ম প্রচারে অদ্বৈতের সঙ্গে নিত্যানন্দের মিল হচ্ছে না এটাই শ্রীচৈতন্যের বিষাদের কারণ হতে পারে। যাই হোক, চরিতগ্রন্থগুলি এইভাবে নির্ভরযোগ্য হয়েও প্রত্যাশিত বহু বিষয়ের ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দেয়নি। শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগ বিষয়ে চরিতামৃতের নীরবতা একদিক দিয়ে শ্রদ্ধার যোগ্য হলেও প্রত্যাশা-পূরক হয়নি। পায়ে ইঁটের আঘাত লাগার পর জ্বরে মৃত্যু এমন বিবরণ জয়ানন্দ দিয়েছেন, কিন্তু তখনই প্রশ্ন করতে হয় যে, তাঁর মরদেহ গেল কোথায়, তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়নি? শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগ বিষয়ে অন্যান্য চরিতগ্রন্থগুলিরও নীরবতা একালে নানান্ উদ্ভট কল্পনার প্রশ্রয় দিয়েছে। যেমন, একটি হ'ল ডঃ বিমানবিহারীর অনুমান-প্রতাপরুদ্র ভক্তিতে নিমজ্জিত হয়ে প্রশাসনে অমনোযোগী হচ্ছিলেন ব'লে পান্ডাদের সাহায্যে শ্রীচৈতন্যকে খুন ক'রে দেহটা সরিয়ে ফেলা হয়। অর্থাৎ এটি পোলিটিক্যাল হত্যা। এ-ধরণের অনুমান নিতান্ত স্বকপোল-কল্পিত ও বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। শ্রীচৈতন্য বাইরে গেলে তাঁর সঙ্গে কাশীশ্বর ও গোবিন্দ সর্বদা থাকতেন, দৌড়ালে তাঁরাও পিছনে পিছনে ছুটতেন এবং হয়ত বা আরও অনেকেই সঙ্গ নেওয়ার চেষ্টা করতেন। আর স্বয়ং প্রতাপরুদ্র এবং তাঁর প্রশাসনে সতত যাঁর ও যাঁর ভক্তগোষ্ঠীর সেবা-যত্নের জন্য উন্মুখ তাঁকে হত্যা করা আজকালকার মত অত সহজ ছিল না, আর তার প্রয়োজনও কিছুমাত্র ছিল না।

মহাপ্রভুর বাউল-ব্যক্তিত্ব ও নামপ্রীতি-সংগতি

একরীতির ধর্ম হ'ল – ব্যক্তিক এবং সামাজিক অনুভব ও আচরণে মানবিক ন্যায়নীতি অনুসরণ, আর এক ধর্ম হ'ল সৃষ্টিতে অতিসূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর নিয়মের প্রকাশ দেখে অন্তরালবর্তী কোনো সত্তার কল্পনা করে তার কাছে আত্মসমর্পণ। এ দুই দৃষ্টিভঙ্গি আপাতবিরোধী হলেও, দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রথমটির অর্থাৎ মুক্তি বা ঈশ্বরে কর্মার্পণের মধ্যে অতিমাত্রায় বিষয়াসক্তি ও ভেদবুদ্ধি ত্যাগের বিষয়টি অন্তর্লীন হয়ে আছে। এইদিক দিয়ে আস্তিক ও নাস্তিক ধর্ম ও দর্শনের নীতিগত আচরণের বিষয়ে মিল। অপ্রাকৃত ঈশ্বরত্ব থাকুক বা না থাকুক, একান্ত বাস্তব যে মানুষজীবন তাকে সংগত ও সুস্থির রাখার ক্ষেত্রে দুই পথেরই মিল লক্ষণীয়। বিশ শতাব্দীতে বস্তুবাদ আশ্রয় ক'রে সমাজবাদী সাম্যচেতনার বিকাশ ঘটেছে। আশ্রয় যাই হোক না কেন, মানবিক সাম্য তো পুরাতন ধর্মেরও বিষয়, আর শ্রেণীস্বার্থ সমুচ্চ হয়ে মানবিকতা অর্থাৎ ধর্ম লঙ্ঘন করতে চাইলে তার প্রতিরোধও ধর্মেরই অনুসিদ্ধান্ত। রামায়ণ মহাভারতকে ইতিবৃত্ত হিসাবে মানলে সংগ্রামের দ্বারা মানবিক ধর্মের প্রতিষ্ঠার বিষয়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৃহত্তর মানবসমাজকে যা নিগৃহীত ও নিশ্চিহ্ন করতে চায় তা আপনা থেকেই সংঘাত ডেকে আনে, এটা নিসর্গেরও নিয়ম। অভিকর্ষ ও খন্ডিত দেশকাল-নিয়ন্ত্রিত যাবতীয় পার্থিবতার এই আনুষঙ্গিক ধর্ম। ব্রাহ্মণ্য-দর্পসমন্বিত পৌরোহিত্য ও তার অনুচর ক্ষত্রিয়ের অনুশাসন যখন নিতান্ত অমানবিক হয়ে দাঁড়াল তখন ভগবান বুদ্ধের মধ্যস্থতায় তার সমাধান এল।

পনেরো ষোল শতাব্দীতে পূর্বাঞ্চলে শাস্ত্র ও তত্ত্বের আস্ফালনের কেন্দ্রভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছিল নবদ্বীপ। মুসলিম প্রশাসন হিন্দুদের বিদ্যা ধর্ম ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি, বরং সহায়তাই করেছিল। মধ্যযুগে ব্যক্তিগত কলহ বিদ্বেষের ব্যাপার ছাড়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার বিষয় ইতিহাসে লেখে না। নির্বিঘ্ন কর আদায় হয় এবং

প্রশাসন বিপর্যস্ত না হয় এ বিষয়ে তুর্কী পাঠান মোগল রাজাদের লক্ষ্য ছিল। অনেকটা সে কারণেও বটে, আবার হিন্দু প্রাধান্যকে জমিদারী ও প্রশাসনিক বিষয়ে স্বীকার করার জন্যও বটে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সপক্ষতা করাই মুসলিম রাজন্যর নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উচ্চরাজপদে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিয়োগ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদের চতুষ্পাঠীতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া , আর সেই সঙ্গে বাঙলা ভাষায় যাত্রা, পাঁচালী কীর্তন প্রভৃতিকেও উৎসাহিত করা মুসলমান রাজ্য ও রাজন্যদের পক্ষে প্রথায় পরিণত হয়েছিল। এই অবস্থায় উচ্চকুল বিদ্যার প্রশ্রয়ে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় স্বক্ষেত্রে অতিমাত্রায় দাম্ভিক ও প্রাধান্য পরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন – এমনভাবে, যাতে শূদ্রেরা বিশেষে হীনবর্ণের শূদ্রেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘৃণা ও দৈন্য বহন করতে করতে নিজেদের হীন পশুতুল্য বলেই মনে করতে লাগল। উচ্চবর্ণের ধর্মীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষায় বহু শতাব্দী ধ'রে তাদের কোনো অধিকারই ছিল না। কিন্তু এই অবস্থা চরমসীমায় পৌঁছেছিল কৌলিন্য- প্রথা ও জাতিবর্ণ বিভাগের পর থেকে ধীরে ধীরে। এই হ'ল মধ্যযুগের চরম অমানবীয়তার কেন্দ্রীভূত ধর্মের গ্লানি অর্থাৎ জীবনধারার গ্লানি। অতএব প্রতিঘাত এল। এল সূফী-বাউলধারার আঘাত, শ্রীচৈতন্যের মধ্যস্থতায়।

শ্রী চৈতন্য যে ধর্মের অন্তরে অনুভব করেছিলেন তা পূর্বেকার কর্মানুষ্ঠানমূলক ও বর্ণাশ্রম-বিভেদমূলক ভক্তি ধর্মের থেকে নিতান্ত ভিন্ন। রামানুজ মধ্বাদি থেকে এবং বেদ উপনিষদাদি থেকে পৃথক এবং বাউলদের অন্তর-অনুভব-প্রাধান্যের সঙ্গে সর্বদা সংগত। কৃষ্ণ-ভগবান্ সে ধর্মের আশ্রয় হলেও পূর্বরীতির কৃষ্ণোপাসনা থেকে এ ধর্মের রীতিপদ্ধতি অত্যন্ত পৃথক্। বলা হয়েছে এ শ্রদ্ধাভক্তির পথ, রাগভক্তির ধর্ম। এর সাহিত্যিক পরিচয় ভাগবতে, তামিল আড়বারদের গানে এবং পারসীক রুমি হাফেজ সাদি প্রমুখ সূফী মনোভাবাপন্ন কবিদের বহু রচনায়। রাগভক্তির পরিণত ভাবনাবস্থা ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে – হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ। এ সূফী ভক্তদেরও হাল-দশার অবস্থা। এ বিষয়ে আমাদের অনুমান ভারতে মুসলিম অভিযানের আগে থেকেই আরব-পারস্যের সঙ্গে ভারতের নানাভাবে যোগাযোগ ছিল। ক্রমে ভারতীয় ভাবুক ও ভারতীয় সূফী বিমিশ্রণে না-হিন্দু না মুসলিম আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁই-কর্তাভজার সৃষ্টি। আর শ্রীচৈতন্যই সেই মহাবাউল যিনি পূজা-উপাসনার পুরানো দৃষ্টান্ত ত্যাগ ক'রে নামোচ্চারণের উপর মুখ্য গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সূফী আউলিয়াদের সঙ্গে তাঁর ভাবুকতার একমাত্র স্বাতন্ত্র্য মূর্তি বা বিগ্রহের মধ্যস্থতা। সেক্ষেত্রেও কিন্তু প্রথানুগত বৈষ্ণব পদ্ধতি থেকে তাঁর উপলব্ধির পার্থক্য লক্ষণীয় – এ কৃষ্ণকে হতে হবে যশোদাতনয়,

তমাল শ্যামরুচি, কিশোর বয়স্ক, মুরলীবাদক রাখাল এবং গোপক্রীড়া সহচর নটবর বেশী মানুষ। কৃষ্ণের এই লীলাচারী স্বরূপের আভাস ফুটেছে ভাগবতে আর প্রায় পূর্ণাঙ্গতা চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। এর মাঝে রয়েছে বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত ও জয়দেবীর গীতগোবিন্দ – যে দুয়েরই মূলসূত্র আড়বার গীতি। অতএব বেদ উপনিষদ্ পর্যন্ত ভারতের পূর্ব পূর্ব ধর্মীয়তা থেকে শ্রীচৈতন্য-অনুভূত মহাভাব ও জনচিত্তে তার গৌণ প্রসারের বিষয়টিকে পৃথকরূপে বিবেচনা করতে হবে। সাদৃশ্য টানা যেতে পারে, কিন্তু জন্য-জনক সম্বন্ধে দেখা ভুল হবে। এ হৃদয়ানুভব-সাক্ষ্যযুক্ত সম্পূর্ণ এবং সমুচ্চভাবের ধর্ম, আর সেই সঙ্গে চিত্তবিপ্লাবক লোকধর্মও বটে।

ধর্মজগতে অবতার বলে যাঁরা গৃহীত হন, তাঁদের জীবন ও চারিত্র্য বিষয়ে নানান্ অলৌকিক ধারণা লোকচিত্তে উদ্ভূত হয়। শ্রীচৈতন্য-জীবনীকারেরা, বিশেষে বৃন্দাবনদাস এরকম কিছু ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। অথচ শ্রীচৈতন্য স্বয়ং অলৌকিকে বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না। আবার অনেকেরই ধারণা, শ্রীচৈতন্য যখন স্বয়ং ঈশ্বরই ছিলেন তখন তত্ত্বজ্ঞানেও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এরকম ধারণা থেকেই তাঁরা দিগ্বিজয়ী-পরাভব (যা প্রত্যক্ষদ্রষ্টা মুরারি বর্ণনা করেন নি) এবং নব্যন্যায়ের স্রষ্টা রঘুনাথ শিরোমণি সপক্ষে তাঁর নিজ ন্যায়গ্রন্থ গঙ্গায় নিক্ষেপ প্রভৃতি গল্পকাহিনীর উদ্ভব। এই সূত্রেই অলৌকিক ঈশ্বরীয় প্রতাপের দ্বারা কাজীকে বশীভূত করার অতিরঞ্জিত কাহিনীর প্রসার। এ বিবরণও মুরারির লেখায় নেই, আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিষয়টিকে বিবৃত করেছেন কাজী প্রবোধন নামে, - যা বাস্তব ও স্বাভাবিক মনে করা যায়। বৃন্দাবন্দাস মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর কিছু রুষ্ট ছিলেন। হয়ত বা ব্যক্তিগত কোনো কারণে , নতুবা হোশেনশাহী আমলে, এমনকি তার আগে বা পরেও বাছাই ক'রে হিন্দুদের উপর কোনো অত্যাচারের ঘটনা ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় না। বিচিত্র কাল্পনিক কাহিনীর স্রষ্টা জয়ানন্দ তো তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভেই এরকম একটা অবিশ্বাস্য কাহিনীর অবতারণা করেছেন। যাই হোক, এসব বাদ দিলে চৈতন্যজীবনীর বেশ কিছু বাস্তব উপাদান এঁরা গ্রন্থসমূহে বিন্যাস করেছেন, যা থেকে অন্বয়-ব্যতিরেকী প্রমাণমুখে সামঞ্জস্য নির্ধারণ ক'রে শ্রীচৈতন্যের লৌকিক অথচ অদ্ভূত জীবন চরিত্রের মোটামুটি একটা ধারণায় পৌঁছানো যায়।

শ্রীচৈতন্যের যে ভাবজীবনকে পূর্বভারত নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে বরণ ক'রে নিয়েছে তার প্রারম্ভ তাঁর গয়া থেকে ফিরে আসার পর, ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে প্রথমে, যখন তাঁর বয়স ২৩ পূর্ণ হতে আরও মাস দুই বাকি। তার প্রায় দু'বছর আগে

তাঁর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ ঘটেছে। তার একবছর আগে তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে টোল ও পৌরোহিত্য সেরে এসেছেন, নিজ আগ্রহাতিশয্যে পরিণিতা দয়িতার আকস্মিক লোকান্তরে বেদনাহত হয়েছেন। তারও আগে তিনি গঙ্গাদাস পন্ডিতের টোলে কলাপ ব্যাকরণ কিছুটা আয়ত্ত ক'রে সৎক্রিয়াবিধি বা পৌরোহিত্য শিখেছেন দরিদ্র সংসারের ভরণপোষণ নির্বাহের জন্য। সব দিক দিয়ে জীবন-সমস্যার সমাধানে আগ্রহী এক বাস্তব তরুণের প্রতিচ্ছবি। জীবনীকারেরা লিখছেন, গয়া গিয়ে শ্রীচৈতন্যের ভাবান্তর ঘটে এবং নোতুন ধর্মের অনুভব নিয়ে তিনি ফিরে আসেন। গয়ায় পিন্ড দিতে গিয়ে প্রয়াতা দয়িতার স্মৃতি, মন্ত্রোচ্চারণ ও বিষ্ণুপদ দর্শনে ঈশ্বরানুভব এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সান্নিধ্যে ঈশ্বরীয় প্রেমভাবুকতার উদ্‌ভব, এসব কার্যকারণ সংগত ব'লে মনে করা যায়। মানবিক প্রেম-সম্পর্কের রোম্যান্টিক অধ্যাত্মময় প্রণয়ভাবুকতায় সমুত্তরণ বাস্তব ব্যাপার হিসাবে মনস্তত্ত্বে স্বীকৃত। আর অতিরিক্ত ভাবসমাহিত অবস্থায় ভাবানুরাগ দৈহিক বিকারও মনে। দেহ-সমতা-বিচারক চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত। আমাদের মনে হয় ভাবপর্যায়কুল সূফী-সাধকেরাও বহুল পরিমাণে এরকম বিকারের বশীভূত হতেন। যার ফলে অলৌকিকবোধে অশিক্ষিত ও নিম্নবর্ণের হিন্দু নরনারী সূফী-ইসলামের অনুগত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে মধ্যযুগের বাঙলার ইতিবৃত্ত আমাদের সমর্থক। যাই হোক, এই অদ্ভূত ঈশ্বরানুরাগ ও বিরহকাতরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নৃত্যে, গানে ও নামোচ্চারণে। এই অবস্থা সহজেই তাঁর থেকে তাঁর সহচরদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় এবং দলবদ্ধ নামসংকীর্তনেরও বিকাশ ঘটে। নামোচ্চারণক্রমে ঈশ্বর সান্নিধ্য অনুভবের তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যের পূর্বেকার ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, পদ্মপুরাণ, গীতগোবিন্দ, চন্ডীদাস-পদাবলী প্রভৃতি বহু গ্রন্থেই পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় রামায়েৎ ভক্ত-সম্প্রদায় ও বেশ কয়েকটি সুফী সম্প্রদায়ে। নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই লৌকিক ধর্মের দিক অজানা থাকতে পারে না, ছিলও না, তাছাড়া গয়া থেকে আসা-যাওয়া এবং পূর্ববঙ্গ ভ্রমণেও তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। কাছাকাছি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত ছিল শান্তিপুরের মুসলমান হরিদাসের। এসব সত্ত্বেও কিন্তু নামের কেবলত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। একমাত্র শ্রীচৈতন্যের প্রবল বুক্তিত্বের মধ্যস্থতাতেই এটি সম্ভব হয়েছিল। ভাবের প্রথম প্লাবনে তীব্র বিরহার্তির মধ্যে অপ্রাপণীয় প্রিয়বস্তু নামোচ্চারণই তাঁর কাছে একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় ছিল এবং হয়ত সেই অবস্থায় রোদন, কম্পন, পুলক, মূর্ছার সঙ্গে তা অনায়াসেই স্ফুরিত হয়েছিল, কিন্তু পরে বৈরাগ্য ও ধর্মে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার এবং সেই সঙ্গে নিজ প্রথম জীবনের অপ্রগলভ সহজ ধর্মবোধকে বিচারদৃষ্টিতে মূল্যায়ণের পর নামে রুচিই যে ধর্ম-অনুভবের প্রথম ধাপ তা তিনি স্থির নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এই সময় থেকে অর্থাৎ

মোটামুটি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে সেরে নিয়ে ও তত্ত্ববিচারমূলক কৃষ্ণভক্তির কিছু কিছু বিষয় জেনে নিয়ে, স্থিত প্রজ্ঞবুদ্ধি ও মন নিয়ে নোতুন লোকধর্ম প্রবর্তন মানসে তিনি অতি অনায়াস এবং অশিক্ষিত দীন মানুষের পক্ষেও বা নিতান্ত সহজ এমন নামোচ্চারণ মহিমা প্রতিষ্ঠা করলেন।

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টক নামধেয় আটটি ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত কবিতায় মুখ্যভাবে নামের অধিকারী, নামের গুণ ও শক্তি, নাম ও নামদ্বারা লক্ষিত সত্তার একত্ব প্রভৃতি বিবৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আবার "তৃণাদপি সুনীচেন" প্রভৃতি মুখ্যতম রচনাটি ধর্মে ও জীবনাচরণে পূর্বাপর অবহেলিত ও পরিত্যক্ত নিম্নবর্ণের এমন কি ভিন্নতর সম্প্রদায়েরও নিতান্ত দীন মানুষ সম্পর্কে। এদেরই ধর্মের এবং সেইসঙ্গে মনুষ্যত্বের অধিকার দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্যের আত্মপ্রকাশ, এ বিষয়টি চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে বারংবার বলা হয়েছে। শ্লোকটির অন্তর্নিহিত প্রতিপাদ্য ভালোভাবে বিচারের অপেক্ষা রাখে। শ্লোকটির মুখ্য বা বাচ্য অর্থ হ'ল – যারা সমাজে তৃণের চেয়েও সুনীচ অবস্থায় রয়েছে , যারা তরুর মত সহিষ্ণু হয়ে বারংবার আঘাত ও লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে যাচ্ছে, যাদের আত্মসম্মানবোধ যুগ যুগ ব্যাপী অবহেলায় অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে, অথচ যারা অন্যকে করজোড়ে সর্বদা সম্মান দিয়ে থাকে এমন দুর্ভাগারাই হরিনাম উচ্চারণের যোগ্যতম পাত্র। বস্তুতঃ" এই ব্যাখ্যাই শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রেত। কারণ, এক্ষেত্রে যদি এমন ব্যাখ্যা করা হয় (এবং যা করা হয়েছেও) যে আগে তৃণের চেয়ে নীচ, আগে অনামী মানদ প্রভৃতি হতে হবে, তবেই নাম উচ্চারণে অধিকার জন্মাবে, তাহ'লে শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রায়ে স্ববিরোধী দোষ এসে পড়ে। কারণ, অন্যত্র "চেতোদর্পণমার্জনং" প্রভৃতি শ্লোকে তিনি বলেছেন যে নাম থেকেই সব গুণের উদ্ভব হয়, চিত্ত মার্জিত হয়, বৈষয়িকতার আক্রমণ বিনষ্ট হয়, উপনিষদাদি কথিত বিদ্যা, শ্রেয় অমৃত প্রভৃতি অনায়াসেই লাভ করা যায়, - নামের অন্য কোনো সাধন নেই। তাছাড়া "নাম্নামকারি বহুধা" প্রভৃতি শ্লোকে নামেরই সর্বশক্তির বিষয় বলা হয়েছে। অতএব নামে অধিকার দেওয়া সম্পর্কে অদ্বৈতাদির কাছে পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন তা-ই এই শ্লোকে রক্ষিত হয়েছে। সে প্রতিজ্ঞা এই যে – হীন, অধম, পতিতেরাই নামের অর্থাৎ ধর্মের একমাত্র পাত্র। শ্রীচৈতন্যের এই ব্রাহ্মণেতর শূদ্র সম্প্রদায়ের, বিশেষে নিম্নবর্ণের অতি দীন মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার বিষয় মুরারির গ্রন্থে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে অদ্বৈতের সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিত্বের মিল লক্ষণীয়। তাঁর ঈশ্বরত্ব বিষয়ে প্রিয় পরিকরেরা নিঃসন্দেহ হ'লে যেদিন নবদ্বীপে এতদর্থে আনুষ্ঠানিক অভিষেক সংঘটিত হয়, সেদিন অদ্বৈতপ্রভু তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা

করিয়ে নিয়েছিলেন যে এই নতুন ধর্মের মূল্যবান্ অধিকার যেন তারাই পায় যারা শূদ্র, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত, , হীন এবং পতিত। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং অতি দরিদ্র ছিলেন ব'লে শিক্ষাহীন, সরল নিতান্ত গরীব মানুষের সঙ্গেই আত্মীয়তা অনুভব করতেন। সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এলে পর কোনো একদিন তিনি তাঁকে একান্তে বলেছেন – কাঁথা, কমন্ডলু, লাঠিসম্বল দরিদ্র বৈষ্ণবেরা বৎসরে বৎসরে বৃন্দাবন পরিদর্শনে যায়, আপনি এদের একটু দেখবেন যেন (চৈ-চ)। দেখা যায় কয়েকবার ফিরিয়ে দেওয়ার পরও জমিদার-তনয় রঘুনাথ দাস পরিশেষে নীলাচলে তাঁর কাছে আশ্রয় পেতে কোনো একদিন উপদেশ চাইলে শ্রীচৈতন্য তাঁকে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে ও শুনতে এবং ভাল খাওয়া পরার আগ্রহ ত্যাগ করতে ব'লে পরে তৃণাদপি সুনীচেন শ্লোকটি শুনিয়েছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃত)। অভিপ্রায় এই যে – এই নামকীর্তন- ধর্মে যাদের স্বাভাবিক অধিকার, ধনীর সন্তান তোমাকে তাদেরই মত হতে হবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে, হীন-পতিত ও নাম-সংকীর্তন এইভাবে অভিন্ন হয়ে পড়েছে। পরবর্তী সময়ে, এমন কি শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই তাঁর আবির্ভাব বিষয়ে ও রাগাত্মিক সহজ ভক্তি নিয়ে তত্ত্ব গ'ড়ে উঠলেও শ্রীচৈতন্যকে তার স্পর্শ বিশেষ লাগেনি ব'লেই মনে হয়। কাশীতে সনাতনকে তত্ত্বশিক্ষা দেওয়া, যা চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার কয়েকটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে , তা আতিশয্যদোষযুক্ত ব'লে পন্ডিতেরা ঠিকই অনুমান করেছেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের কুড়ি বৎসর পর থেকে যে সব তত্ত্বচিন্তা বৃন্দাবনে গ্রন্থভূক্ত হতে থাকে, কবিরাজ গোস্বামী তার বর্ণনা দিয়ে নিজ বিশ্বাসমত শ্রীচৈতন্যের মহিমা বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। সেইমত প্রকাশানন্দগোষ্ঠীতে বিশেষে সার্বভোম-মিলনে কিছু কিছু তত্ত্বচিন্তা শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ ঐসব বর্ণনার মধ্যেই এমনতর কথা রয়েছে যাতে বোঝা যায়, তত্ত্বকথার উপল্বধি বা তত্ত্বে আগ্রহ তাঁর সামান্যই ছিল । "আপনি আচরি ভক্তি জীবেরে শিখায়" – এই বর্ণনাটিই তাঁর পক্ষে একেবারে যথাযথ। বস্তুতঃ শাস্ত্রতত্ত্বের তিনি বিরোধীই ছিলেন। নবদ্বীপবাসের শেষ বৎসর তিনি পরিপূর্ণ বাউল-আচরণের দ্বারা তত্ত্ববাদীদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছিলেন। জাত-পাঁতের ভেদ মানেননি। ধার্মিক মুসলমানদের নিতান্ত সমাদর করেছেন। এই সব কারণেই কাজীর কাছে "ধর্ম" গেল – রক্ষা করুন" বলে ব্রাহ্মণেরা প্রতিনিয়তই অভিযোগ করতেন। আর সম্ভবত জগাই-মাধাই তাঁদেরই দলীয় গুন্ডা প্রকৃতির ক্ষমতাশালী লোক ছিল। জগাই-মাধাই শ্রীচৈতন্য-দ্রোহ ত্যাগ করলে পর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ডান হাত ভেঙে যায় এমনই মনে হয়। কিন্তু ওঁদের দল থেকে জগাই-মাধাইকে সরিয়ে আনা কিভাবে সম্ভবপর হয়েছিল তা চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। শ্রীচৈতন্যের

আন্তরিক বাউলভাব ক্রমশ তাদেরও মনে রেখাপাত করেছিল এমনই সম্ভব। শাস্ত্রতত্ত্বের বিষয়ে দৃক্‌পাতহীন এরকম ভাবোন্মাদ জগাই-মাধাইকে অতিমাত্রায় বিস্মিত ক'রে থাকবে। ভাবের প্রথম আবেশে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে জল্পনাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করার জন্য তিনি শ্রীবাসাদি সহচরদের আদেশ করছেন এমন দেখা যায়।

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ - আধ্যাত্মং ন কদাচন।
ভবদ্ভিঃ কুত্রচিদ্ বাপি-বক্তব্যং যদি রোচতে।। (মুরারি)

অদ্বৈত আচার্য সাময়িকভাবে তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ব'লে শ্রীচৈতন্য তাঁর পিঠে মুর্হুমুহু কিল মেরেছিলেন এমন কাহিনী শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়। মুরারি তা দেননি। তবে উক্ত বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে ঐ কাহিনী বাস্তব বলেই মনে হতে পারে। আর বারাণসীতে প্রকাশানন্দ-সম্মিলনে শ্রীচৈতন্য যে আত্মভাষণ করেছিলেন তাও তাঁর অকপট সত্যোক্তির পরিচয়ই বহন করেছে। প্রকাশানন্দের জিজ্ঞাসা ছিল – তুমি সন্ন্যাসী হয়ে উন্মাদের মত নাচ-গান করো কেন ? এ কোন্ স্তরের ধর্মমূলক আচরণ ? তার উত্তরে শ্রীচৈতন্যের বক্তব্য ছিল – আমি নিজের ইচ্ছায় প্রমত্ত হই না , গুরু আমাকে নাম-মন্ত্র দিয়েছিলেন , তার প্রভাবে আপনা থেকে আমার ঐ অবস্থা ঘটে থাকে, আমি কী করব। তিনি অদ্বৈতমত খন্ডনের দিকেও যাননি , সে শক্তিও তাঁর ছিল না , আর সাক্ষাৎ তো বড়জোর দু'এক ঘন্টার। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ঐ সংক্ষিপ্ত স্বগতোক্তিতে তাঁর তত্ত্ব -উদাসীন নামপ্রেমিক বাউল স্বভাবেরই পরিচয় ফুটেছে। এই ব্যক্তিত্বেই সার্বভৌম বিমুগ্ধ হয়েছিলেন , প্রকাশানন্দ হয়ত বা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে থাকবেন। এ হ'ল শাস্ত্র-তর্কাতীত রাগভক্তির বিষয়, যার উপর নবদ্বীপের তত্ত্ববাদীরা অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট ছিলেন। শ্রীচৈতন্য নিজেকে বৈরাগী কৃষ্ণভক্ত হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইতেন। তার উপরস্তরের কোনো মানুষ হিসাবে নয়। অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি কৃষ্ণের নাম ছেড়ে তাঁর নাম কীর্তন করছেন – এ শুনলে তিনি চটে যেতেন। তাঁর ভগবত্তা-প্রতিপাদক সার্বভৌমের দ্বিশ্লোকের স্তুতি তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। বিদগ্ধমাধব ললিতমাধব নাটকের প্রস্তাবনায় রূপগোস্বামী তাঁকেই স্বয়ং ভগবান্ ব'লে বন্দনা করলে তিনি নিতান্ত বিক্ষুব্ধতা প্রকাশ করেছিলেন। আর প্রচলিত লোকব্যবহার লোকনীতিকে মান্য করে চলা অন্য বিবেকী মানুষের মতই তিনি কর্তব্য ব'লে মনে করতেন। রাজ-প্রতিগ্রহ বৈরাগীর পক্ষে নিতান্ত অকর্তব্য বিবেচনা করতেন। ফলে রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম-রামানন্দকে বারবার অনুরোধ করলেও নিজ ইচ্ছায় তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়ে রাজাকে অনুগৃহীত করেননি। রামানন্দ-ভ্রাতা ও রাজকর্মচারী গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজকোষের টাকা আত্মসাৎ করে যুবরাজকে উপেক্ষা করলে পর যুবরাজ তাঁর মৃত্যুদন্ড আদেশ করেন। এই মৃত্যুদন্ড থেকে প্রতাপরুদ্রকে ব'লে অব্যাহতি

ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দ্বারা বারংবার অনুরুদ্ধ হ'লে পর শ্রীচৈতন্য নীলাচলত্যাগের সংকল্প করছিলেন। পরিশেষে সার্বভৌম – এটি শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছা, এমন কথা প্রতাপরুদ্রকে জানিয়ে গোপীনাথ পট্টনায়কের মৃত্যুদন্ড মকুব করলে পর শ্রীচৈতন্য নিতান্ত খেদের সঙ্গে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলেছিলেন –

প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য কি মোর করিলে।
রাজ-প্রতিগ্রহ তুমি মোরে করাইলে।।

শ্রীচৈতন্যের এই বৈরাগী অথচ যুক্তিতে অবিচল লোকিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দীনহীন মানুষের দিকে পক্ষপাতের বিষয়টিকে স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিশেষ একটি দিক তাঁর বাঙলা জীবনীগুলিতে তেমন পাওয়া যায় না। একমাত্র মুরারিত চৈতন্যচরিতেই তা কখনও স্পষ্টাক্ষরে কখনও ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। এটি হ'ল বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। তাঁর নাম বিষয়ে আগ্রহের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগ কিছু নেই, কিন্তু সন্ন্যাসের সঙ্গে রয়েছে। তাই বিষয়টি উপস্থাপিত করতে হ'ল। কিছু কিছু পদরচনায়, মুরারির প্রক্ষিপ্ত অংশে এবং সামান্যভাবে লোচনদাস ও জয়ানন্দের গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর সাংসারিক মধুর সম্বন্ধের বিষয় উত্থাপিত হলেও ব্যাপারটি যে অত্যন্ত ভিন্ন তারও পরিচয় ঐ মুরারির গ্রন্থেই রয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অথচ উপেক্ষিত থেকে গেছে একারণেও এর উপস্থাপন অসঙ্গত হবে না। আমাদের সন্দেহ হয়, মুরারির চৈতন্যচরিতে এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ ছিল, যাতে বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে তাঁর প্রবল ঔদাসীন্য ব্যক্ত হয়েছিল। এর ফলে মুরারিত দেহরক্ষার ঠিক পরই তাঁর গ্রন্থের সংশোধন কেউ কেউ দাবী করেন এমনই মনে হয়। সেই আকার থেকে মুদ্রিত গ্রন্থটি স্বর্গত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদনায় আমরা পেয়েছি। মুরারির গ্রন্থে প্রদত্ত বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহ ঘটনা এবং মাতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের মনোমালিন্যের অপূর্ণাঙ্গ বিবরণ থেকে বিষয়টি অনায়াসে অনুমান করে নিতে হচ্ছে। এই বিবাহ-প্রসঙ্গ নিয়ে গ্রন্থটির প্রথম প্রক্রমের ত্রয়োদশ-চতুর্দশ সর্গ লিখিত।

দেখা যায় , শচীদেবী গৌরাঙ্গের সম্মতি না নিয়েই গণকের মাধ্যমে সনাতন পন্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দিনক্ষণ সহ বিবাহের সম্পর্ক স্থির করেন। গৌরাঙ্গ অধিবাস বা গায়ে-হলুদের দিনেও এর কিছু জানতেন না। যেমন পথে পথে শূদ্রদের পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো অভ্যাস ছিল তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ঐ দিন আকস্মিকভাবে সেই গণক তাঁকে পথে এভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখেন এবং সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন।

তাতে গৌরাঙ্গ ঐ বিবাহের কিছুই জানেন না ব'লে জবাব দিলে তিনি দ্রুতবেগে সনাতন মিশ্রের বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি জানান। গণকের রিপোর্ট ও তারপর যা হ'ল তা পরপৃষ্ঠায় উধৃত শ্লোকগুলি পড়লেই বোঝা যাবেঃ

ময়াভেত্য পথি মুদা শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরতঃ প্রভুঃ।।

দৃষ্ট পৃষ্টশ্চ ভগবন্ অধিবাসস্তবানঘ।
বিবাহস্যাদ্য কিং তত্র বিলমম্ভাত দৃশ্যতে।।
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ মাং দেবো রাজৎস্মেরমুখাম্বুজঃ।।
কুতঃ কস্য বিবাহস্তে বিদিতস্তদ্ বদস্ব মে।।
ইতি শ্রুত্বা ময়া তস্য বচনং তব সন্নিধৌ।।
সমাগতং নিশম্যৈতদ্ যদ্যুক্তং তৎ সমাচর।।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য গণকস্য সুদূঃখিতঃ।
শ্রীমৎ সনাতনো ধৈর্য্যামবলম্ব্যাব্রবীদ্ বচঃ।।
কৃতং ময়ৈতৎ সকলং দ্রব্যালংকরণানি চ ।
তথাপি তস্য ন তত্রাদরোভূদ্দৈবদোষতঃ।।
মমাত্র কিং ময়া কার্যং নাপরাধ্যামি কৃত্রচিৎ।
ততঃ সন্ত্রস্তহৃদয়া পত্নী তস্য শুচিব্রতা।।
কুলজা বিষ্ণুভক্তা চ পতিসেবাপরায়ণা।
অব্রবীৎ দুঃখিতা দঃখযুক্তং পণ্ডিতসত্তমম্।।
পতিং পতিব্রতা-বাক্যং ন করোতি যদা স্বয়ম্।
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরো নাত্রাপরাধো মে কথং ভবান্।।
দুঃখিতঃ কিন্তু না স্মাভির্বক্তব্যং কিঞ্চিদণ্বপি।।
কার্যমেতন্ন কর্তব্যং ত্যজ দুঃখং সুখী ভব।।
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা প্রিয়ায়াঃ প্রীতিমাবহন্।।
উবাচ বন্ধুভিঃ সার্ধমেতদেব সুনিশ্চিতম্।।
নাকরোদ্ যদি বিপ্রেন্দ্রো না করিষ্যাম এব হি।।
ততোহসৌ ভগবান্ জ্ঞাত্বা দুঃখিতৌ দ্বিজদম্পতী।। ইত্যাদি।

সবই যখন ঠিক ঠাক হয়েছে তখন শেষমুহূর্তে বিবাহ বন্ধ হওয়ার দুর্ঘটনা থেকে তিনি মাকে ও কন্যাপক্ষকে মূক্তি দিলেন। ফলত, এ বিবাহ একটা কৌশল বা যোগসাজশে ঘটানোর মত হয়েছিল এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি কোনো দিনই অন্তরে স্থান দিতে পারেননি। লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে

বিবাহের পর সম্বল সন্ধানের জন্য তিনি বরং পূর্ববঙ্গে যান। এবার সে উদযোগও দেখা গেল না। গৃহে থেকেই কয়েকটি ছাত্রকে তিনি পৌরোহিত্য ও সম্ভবত কিছু ব্যাকরণ পড়াতে লাগলেন (অপাঠয়ৎ লৌকিক-সৎক্রিয়াবিধিম্ -মুরারি)এবং স্বল্প পরেই গয়া চলে গেলেন পিতৃপিণ্ড দেওয়ার উপলক্ষে। আর গয়া থেকে ফিরে এলেন যখন তখন তো মাঝে মাঝে ভাবোন্মাদের অবস্থা। এমন অবস্থায় ভয়ব্যাকুলিতা শচী একদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে এসে ওঁর সামনে দাঁড় করালেন, কিন্তু দেখা গেল-"দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়"- ভাবের দৃষ্টি একেবারেই নেই। আমরা অনুমান করতে পারি, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে একত্র শয্যাগ্রহণ তিনি কোনোদিনই করেন নি এবং এখান থেকেই সন্ন্যাসের সংকল্প নিয়েছিলেন। জীবনীগ্রন্থগুলিতে দেখা যায় তাঁর শয্যাপার্শ্বে থাকতেন পন্ডিত গদাধর। যে রাত্রিশেষে তিনি মহানিষ্ক্রমণ করেন, সে রাত্রে সাধক হরিদাসও তাঁর কক্ষে শয়ন করেছিলেন। মুরারির মূল চৈতন্যচরিত কোনো দুর্বল হস্তদ্বারা দ্রুত ও আদ্যন্ত পরিমার্জিত হলেও এমন ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে, যাতে শচীমারার শ্রীচৈতন্যকে সংসারী করার কৌশল এবং শ্রীচৈতন্যের প্রবল বিষ্ণুপ্রিয়া-বিরাগ আচ্ছাদিত হয় নি। মুরারির গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রক্রমের দ্বাদশ সর্গ দেখা যাক। সর্গটি কাহিনীর একেবারে মাঝখান থেকে প্রারব্ধ হয়েছে। বেশ বোঝা যায় প্রারম্ভিক কিছু অংশ একেবারেই তুলে নেওয়া হয়েছে।

সংস্কৃতে বর্ণনাটি এই-

ততো বাট্যাং মুরারেস্তে ঝটিত্যাগত্য সেশ্বরাঃ।
উপবিশ্য ক্ষণং স্থিত্বা বিজয়স্যাশ্রমং যযুঃ।।
উষিত্বা রজনীং তত্র প্রভাতে ভগবান্ পরঃ।
জগামোত্তরকং কুলং স জাহ্নব্যা অভ্রমৎ দ্রুতম্।।

তারপর তাঁরা (শ্রীচৈতন্যসহ সঙ্গীরা) মুরারি-গৃহে দ্রুতবেগে এসে অল্পক্ষণ মাত্র থেকেই লিপিকার বিজয়ের গৃহে চলে গেলো। সেখানে রাতটা কাটিয়ে শ্রীচৈতন্য প্রায় ছুটতে ছুটতে গঙ্গার তীরে পৌঁছে (এবং বোধহয় সাঁতরে গঙ্গা পার হয়ে) উত্তরকূলে গিয়ে হাজির হলেন। এবং তারপরই আবার দ্রুতবেগে চলতে লাগলেন। তারপর –

ব্রাহ্মণাঃ সাধ্বঃ শান্তা বিনয়েন দ্বিজোত্তমাঃ।
উচুঃ প্রসীদ ভগবন্ আগচ্ছ স্বগৃহং পুনঃ।।
তৎশ্রুত্বা বিনয়ং তেষাং করুণার্দ্রোন্যবর্তত।
স্বভক্তহৃদয়ানন্দঃ শ্রীমান্ বিশ্বম্ভরঃ প্রভুঃ।।

অর্থাৎ পাড়ার ব্রাহ্মণেরা তাঁর পিছু পিছু গিয়ে কাতরবাক্যে তাঁকে সান্তনা দিলে পর তিনি ফিরে এলেন।

ততস্থে হৃষ্টমনসস্ত্যক্তশোকা মুদান্বিতাঃ ।
আজগ্মুর্হরিণা সর্বে শ্রীবাসস্যালয়ং পুনঃ।।

ফিরে এলেন শ্রীবাসগৃহে এবং ফিরে এসে শ্রীচৈতন্য সমবেত সকলকে বললেন –

মাতরং সবংপরিত্যজ্য গতে ময়ি দিগন্তরম্।
সর্বে মাং সংদিষ্যন্তি বিরুদ্ধং কৃতবানসৌ।।

ফিরে এলাম কিন্তু আপনারাই বলুন মাকে ছেড়ে যদি আমি অন্যদেশে চ'লে যাই তখন আপনারাই তো বললেন যে কাজটা ভাল করেনি।

এই বর্ণনা থেকে আমাদের মনে হয় শচীমাতা গৌরাঙ্গের নিতান্ত বিষ্ণুপ্রিয়া বিরাগ ও প্রবল ধর্মভাব দৃষ্টে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সম্ভবত পাড়াপড়শীর ও সম্ভবতঃ বৈবাহিক পক্ষেরও সহায়তায় কৌশলে গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন বিষয়ে উদ্‌যোগ নেন। এছাড়া মায়ের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তখনই সংসার ত্যাগ সংকল্পের আর কোনো কারণ অনুমান করা যায় না। শ্রীচৈতন্যের নাম-প্রেমের সঙ্গে সন্ন্যাসের অনিবার্য সংগতি তাঁর পরিকরেরা খুঁজে পাননি। নিত্যানন্দ তো তাঁর দন্ড ভেঙেই ফেলেছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর ভাবপ্রেরণার প্রথমের দিকে সন্ন্যাস বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও পরে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং পরিকরদের তথা শচীদেবীকে পূর্বাহ্নে তা জানিয়েও ছিলেন। কিন্তু দেখা যায়, বিষ্ণুপ্রিয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করেছিলেন। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় মহানিষ্ক্রমণের সময় সাংসারিক সম্বলেন জন্য তিনি মাকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করছেন – 'তোমার সকল ভার আমার' 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' পাওয়া যায় যে সন্ন্যাসী হয়েও তিনি মায়ের কথা ভোলেন নি, কারো না কারো হাত দিয়ে বস্ত্রাদি সম্বল পাঠিয়ে দিতেন। প্রবল ঈশ্বরাসক্তির অনিবার্য ফল সন্ন্যাস হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস নেওয়া ও চিরতরে গৃহত্যাগ করার সংকল্প শাস্ত্ররীতি লঙ্ঘী বাউল-ভাবুক হয়ে তিনি না করলেও পারতেন এবং নবদ্বীপ-পরিকরদের অনুরোধে হয়ত শেষপর্যন্ত নাম-কীর্তন-বিলাসে কাটিয়েও দিতেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রবল বাধা ছিল তাঁর ঐ দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ। এই কারণেই অনেক ভেবেচিন্তে তাঁকে দূরদেশে থাকার সংকল্প নিতে হয়েছিল। তাঁর অনুচরদের মধ্যে একমাত্র গদাধরকেই তিনি দৃঢ়ভাবে সন্ন্যাস নিয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দের বিবাহ ও ঘর সংসার করার বিষয়ে সম্ভবত হাঁ না কিছুই স্পষ্ট করে বলেননি, তবে অনুমান হয় নীলাচল আসতে নিষেধ ক'রে এবং গৌড়ে কাটাতে নির্দেশ দিয়ে তিনি নিত্যানন্দের সংসারী হওয়ার বিরোধিতা করেননি। অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ে গৌরাঙ্গের বহিরঙ্গ দীক্ষা হয়েছিল, অন্তরঙ্গ দীক্ষা হয়েছিল পনেরো মাস আগেই মাধবেন্দ্র-পুরী-শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছে। শংকরাচার্যের অদ্বৈতমত দু'তিন শতাব্দীর

মধ্যেই বৌদ্ধতান্ত্রিকতা ও পরে সুফীবাদের সংঘর্ষে আহত হয়ে পড়ে। তাছাড়া সাকার উপাসনা অনুমোদন করায় ক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তিবিশ্বাসের ধর্মাচরণরীতি কট্টর অদ্বৈতমতবাদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং অদ্বৈত সন্ন্যাসগুরুর কাছে বহিরঙ্গ দীক্ষা নিয়ে পুরীগিরি ভারতী সম্প্রদায় কার্যতঃ ভক্তিধর্মই প্রচার করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে আবার শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী মায়াবাদ থেকে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তাঁর নিজ হৃদয়ে মৌলিকভাবে উপলব্ধ বাউল ভাবুকতাময় প্রেমধর্মকেই প্রকাশ ও প্রচার করতে থাকেন। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরবৃন্দ এবং তার অনুসরণে জীবনীগ্রন্থাকারেরা মাধবেন্দ্রপুরীকেই ঈশ্বরপ্রেমবাদের অঙ্কুররূপে দেখেছেন। আমরা বিষয়টিকে ইতিহাস অনুগত দৃষ্টিতে দেখে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ভারতব্যাক্ত সুফীমতের সঙ্গে এর অনিবার্য যোগ প্রত্যক্ষ করছি। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় ভাগবত টীকাকার শ্রীধর স্বামীও স্বম্ভবতঃ এই ধর্মীয় পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত হয়েই ভাগবতের টীকা রচনায় হাত দেন। শ্রীচৈতন্যের সময়ে তিনিই ভাগবতের সর্বাধুনিক টীকাকার। বস্তুত অদ্বৈতমত যে পরিমাণে স্বয়ংসম্পূর্ণ দার্শনিক অভিমত সে পরিমাণে অবলম্বনযোগ্য ধর্মীয় মত নয়। সন্ন্যাস কেবল মুষ্টিমেয়ের পক্ষে সাধ্য। অথচ ধর্মার্থে সংসার ত্যাগ ও তদর্থে গুরুর কাছে দীক্ষার রীতি ভারতে গতানুগতিকভাবে স্বীকৃত থাকায় প্রেমভক্তির ক্ষেত্রেও দীক্ষা আবশ্যক ছিল। প্রচলিত শাস্ত্রমতে দীক্ষা নিতে হয় তাই, নতুবা চলব স্বচ্ছন্দে বাউল পথে – এরকম একটা মধ্যম মার্গ তখনকার দিনে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে থাকবে। বাউল ও সন্ন্যাসপথের মিল এখানে যে উভয়মতেই গুরুকরণ প্রয়োজন। তবে পদ্ধতি ভিন্নরীতির এই পর্যন্ত। এই কারণেই আন্তর সম্পর্কে মহাপ্রভু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যের নিকট মন্ত্রদীক্ষা পেলেও তাঁর সন্ন্যাস দীক্ষার প্রয়োজন তিনি অনুভব ক'রে থাকবেন। কিন্তু তাঁর সন্ন্যাসের সপক্ষে এরকম যুক্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের ধারণায় ব্যাপারটি আর একটু জটিল ও গভীর ছিল। কারণ মাধবেন্দ্র শিষ্য অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ তো গৃহীই ছিলেন।

নাম-প্রেমসহ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের মুখ্য কারণ ধর্মীয় এবং সামাজিক দুইই। এ দুয়ের মধ্যে তেমন বিভেদ ছিল না, কারণ ঐ সময় সমাজে ধর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির – সে ধর্ম কেবল আনুষ্ঠানিক অথবা আন্তরিক যাই হোক না কেন – বিশেষ মর্যাদা ছিল। ইসলাম আসার পর পরোক্ষ হিন্দু সমাজেও ধর্ম বিষয়ক ইমান বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। আমরা পূর্বেই বলেছি মুসলিম রাষ্ট্র হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির বিষয়ে হয় পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, নয় উদাসীন থেকেছে, বিরোধী কোনকালেই হয় নি। কারণ রাজ্য প্রশাসনে হিন্দুদের সমর্থন ও সহায়তা এবং নিশ্চিন্তে রাজস্ব আদায়ই মুসলিম প্রশাসকদের কাম্য

ছিল।

প্রমাণে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য অথবা অদ্বৈত অথবা নিত্যানন্দ কেউই মুসলিম প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য কেউই করেন নি। পরোক্ষে বরং সন্তুষ্টিই প্রকাশ করেছেন। একমাত্র জীবনীকার বৃন্দাবন দাস কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কেন ইতিহাসের প্রমাণে তার কারণ পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। যাই হোক, শ্রীচৈতন্যের ও তাঁর অভিনব মানবিক ধর্মের প্রকাশে অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ, ব্যক্তিক ও সামাজিক দুই কারণই বর্তমান। তিনি নির্যাতিত, শিক্ষা-দীক্ষাহীন সুতরাং ধর্মেরও অধিকারহীন নিম্ন মানুষকে ধর্মের অধিকারে উঠিয়া ব্রাহ্মণাধিক মনুষ্যত্ব দিতে চেয়েছিলেন। আর এটি যে-রীতিতে যে-উপায়ে করেছিলেন তা অভিনব, তার সূত্র বেদ-বেদান্তে পাওয়া যাচ্ছে না, যাচ্ছে তাঁর পূর্বেকার তিন চারশ' বছরের পূজানুষ্ঠান-উপাসনা-বিরোধী ভাবুকতায়। শ্রীচৈতন্যের পরিকরেরা তাঁর আবিরবভাবের মধ্যে দু'টি বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন। একটি হ'ল তাঁর নিজভাব-বিলাস, অন্যটি জনচিত্ত-পরিবর্তন – 'সেই দ্বারে আচন্ডালে কীর্তন সঞ্চারে'। এর ফলে পরের দুই শতাব্দী ধরে 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব' আখ্যা সমাজের মর্যাদাপূর্ণ আখ্যা হয়ে উঠেছিল। এবং ক্রমে বৈষ্ণব আখড়াধারী মোহান্তেরা ও সহজিয়া সম্প্রদায় উন্নত বৈষ্ণব জীবনাচরণ প্রায় বিধ্বস্ত ক'রে দিলেও উচ্চনিম্ন সর্বস্তরেই তার কিছু নিদর্শন রয়েই গেছে। শ্রীচৈতন্য-জন্মের পাঁচশ বৎসর পরে আজকের মুষ্টিমেয়ের বৈষয়িকতা ও ভ্রষ্টচারিত্র্য থেকে মানুষের উদ্ধার কোন্ পথে করা যাবে তার চিন্তাই প্রথম কাজ ব'লে মনে করা যায়।

ঐক্য ও সংহতির সাধক শ্রীচৈতন্য

প্রায় পাঁচশ বছর আগে নবদ্বীপের এক সুদরিদ্র পন্ডিত পরিবারে যিনি জন্মেছিলেন, নিযাতিত মানুষের পরিত্রাতা সেই নরদেবতাকে নমস্কার। অনর্পিতচরীং চিয়াৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ- শ্রেণীস্বার্থে মহাপাপ, বিষয়ী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের একযোগে শূদ্রদলন এবং অশুচি-অপবিত্র আখ্যা দিয়ে মুসলিম ঘৃণা যে সময় বাঙলার প্রাণকেন্দ্র নবদ্বীপকে গ্রাস করে সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়েছে-ঘনীভূত করেছে কলির তমিস্রা, এমন মুহূর্তে যেন নৈসর্গিক প্রতিক্রিয়ার সূত্রে ধরেই অদ্ভুত এই মহাবাউলে আত্মপ্রকাশ ঘটল। তিনি বহু বিলম্বে দেখা দিলেন, তবু দুর্যোগ এবং সংগ্রাম মাথায় করে এলেনই তো। আর কোনো মহাপুরুষ মানুষের মধ্যে যা দিতে পারেন নি এমন এক নিতান্ত সহজ পথ দেখিয়ে কোটি কোটি লাঞ্ছিত মানুষকে দিলেন বহুদিনের হারানো ধর্মের অধিকার অর্থাৎ মনুষ্যত্বের মর্যাদা। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের কৃত্রিম ধর্মের ভিত্তি ছিল কঠোর জাত পাতের জল-অচল ভেদ, হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের মধ্যে দুস্তর পারাবারের ব্যবধান সৃষ্টি। তিনি তা ভাঙলেন, চুর্ণ করলেন কপট শাস্ত্রের বিধানে গড়া শৃঙ্খল। তিনি দূরকে শুধু নিকটেই আনলেন না, মিলিত করলেন, বাঁধলেন –মানুষের শ্রেষ্ট যে মানসিক সম্পদ –সেই অন্তরঙ্গ অনুরাগের বন্ধনে। যে মন্ত্রে তিনি এক করলেন, যা দিয়ে চণ্ডালকেও করে তুললেন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ট, সে হল তাঁর নিজ জীবন দিয়ে প্রমাণ করা নিতান্ত সহজ-উপায়-নাম-উচ্চারণ, নাম-কীর্তন। "আপনি আচারি ধর্ম জীবেরে শিখায়" যারা শিক্ষা এবং মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত, যারা ভারবাহী পশুর মত থেকে উচ্চবর্ণের অন্ন ও বিলাসের উপাদান জুগিয়ে আসছে, তারা অন্তত ধর্মের দিক দিয়ে মানুষের মর্যাদা পাক- এই বুঝেই তিনি এই সহজ পথের প্রবর্তন করলেন। কোন অনুষ্ঠান নয়, নয় পূজা-আরাধনায় আড়ম্বর, আর সেই সঙ্গে ভীত হয়ে করযোড়ে দূরে অবস্থান। জোর দিয়ে বললেন এই নাম উচ্চারণ থেকেই জন্ম কর্মের সব দোষ দূর হবে, মানসিক হীনতা বোধ কেটে যাবে, নাম থেকেই হবে শ্রেয়োলাভ, মূঢ় ম্লান মূক পাবে দুর্লভ অমৃতের সঙ্গে মনুষ্যত্বের অধিকার।

এই অভিনব ধর্ম এবং তার অনিবার্য বিধানে সম্প্রদায়-ভেদ ও সমাজ- বৈষম্যের

হটে যাওয়ার ব্যাপারটি এক মুসলিম কবি-বাউলের দৃষ্টিতে ঠিকই ধরা পড়েছে-

গৌর, কী আইন আনিলে নদীয়ার
আনকা আচার আনকা বিচার
দেখেশুনে যে ভয় পায়।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ। সমর্পয়িতুম উন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম" জ্ঞান নয়, শাস্ত্র নয়, চাই হৃদয়ের মুক্তি, সহজ অনুভব, ভাব বিপ্লব। এ সেই মুক্তি যা চিরাচরিত ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র দিতে পারেনি, না অদ্বৈত, না দ্বৈত, না তর্ক-বিতর্ক, না স্মৃতিনির্দিষ্ট নিত্যকর্ম পদ্ধতি। এসব বরং বাড়িয়েই তুলেছিল বন্ধন, পাকা করেছিল মানুষে মানুষে বিভেদের কায়েমী দলিল। শাস্ত্র সম্বল এই সুবিধাবাদের পুরোনো কাগজকে ছিঁড়ে ফেলে পদদলিত করলেন মানুষের ঠাকুর। এক আঘাতেই বিচূর্ণ করলেন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের জমাট গ্র্যানাইট, অবিরল অশ্রুর প্লাবনে ধুয়ে ফেললেন মুসলিম-শূদ্রের ওপর স্বার্থের তাগিদে লেপিত কলঙ্ক-কালিমা। তাই তিনি 'অগতি-পতিত –কুমুদ-বন্ধু', তাই পদকর্তার বিস্মিত দৃষ্টিতে

বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।

আবার 'আচন্ডালে ধরি দেই কোল' অদ্বৈত আচার্যের ইঙ্গিতে তিনি ধার্মিক মুসলমান হরিদাসকে নিজগৃহে স্থান দিলেন এবং ব্রাহ্মণদেরও প্রণম্য শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে তাঁকে ঘোষিত করলেন। সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী আর সেই সঙ্গে প্রথম সারির কবি-পন্ডিত ছিলেন দবীর খাস ও সাকর মল্লিক। মুসলিম সংসর্গের জন্য ব্রাহ্মণের তালিকায় যাঁদের পতিত করা হয়েছিল, শ্রীচৈতন্য তাঁদের বেছে নিলেন সারা ভারতে তাঁর অনুরাগ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। নাম দিলেন রূপ ও সনাতন। "ঐছন সদয়-হৃদয় রসময় গৌর ভেল পরকাশ"। সে আজ থেকে কিছু কম পাঁচশ বছর আগে। বাঙলায় তখন হুসেন শাহী আমল। ন্যায় ধর্ম উদারতার গুণে আকবরের সমকক্ষ সুলতান হুসেন শাহ-হিন্দু-মুসলমানে সমদৃষ্টি। শুধু তাই নয়, যোগ্য বিবেচনায় রাজস্ব, রাজকোষ রাজ্যরক্ষায় পরামর্শ দেওয়া সবই উচ্চশিক্ষিত হিন্দু কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত, আর এটাই ছিল তুর্কী পাঠান আমলের ট্র্যাডিশান। তাছাড়া উচ্চবর্ণের হিন্দু কবি-শাস্ত্রকারদের গ্রামদান ভূমিদানের দ্বারা উৎসাহিত করা এও ছিল সুলতানী আমলের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে। এরই ফলে বিদ্যায় ও অর্থে তখনকার উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের খুব বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা ঘটেছিল। এটা এক দিক থেকে প্রার্থিত ব্যাপার হলেও এই রন্ধ্রেই শনি প্রবেশ করেছিল হিন্দু-সমাজে। রাজ সহায়তায় বিদ্যায় ও অর্থে প্রতিপত্তি অর্জন করে সমাজের সর্বেসর্বা হয়ে নিঃসম্বল নিম্নবর্ণের মানুষকে এই কুলীনেরা মানুষ বলে গণ্যই করলেন না। যথার্থ জ্ঞান ভেদবুদ্ধি নষ্ট করে। কিন্তু এঁরা যেহেতু বৈষয়িক স্বার্থ-প্রণোদিত ছিলেন সেইহেতু নোতুন নোতুন শাস্ত্র বানিয়ে সেই পুরানো বল্লালী আমলের বৈষম্যকেই

আরও পাকা করে তুললেন। অগণিত নিম্নবর্ণের মেহনতী মানুষ ও মুসলমান অন্ত্যজ, অস্পৃস্য, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি আখ্যায় বর্ণিত হয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক হয়ে পড়ল। এই জঘন্য অমানবিকতার নৈসর্গিক প্রতিক্রিয়া সূত্রেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।

যেদিন থেকে এই মহাবাউল নবদ্বীপে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নৃত্য গীত কীর্তনের মাধ্যমে নোতুন মানব ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন,-শূদ্রদের সঙ্গেই আত্মীয়তা স্থাপন করতে লাগলেন, অস্পৃশ্যের গৃহে গিয়ে তার জলপাত্র তুলে নিয়ে জলপান করলেন, আর মুসলমানদের আলিঙ্গন করে আপন করতে লাগলেন, সেই দিন থেকে (খ্রীঃ ১৫১০) নবদ্বীপের গোঁরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গেলেন চ'টে। তাঁরা নানাভাবে বৈষ্ণবদের বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। জগাই মাধাইকে পিছনে লাগালেন, ধর্মীয় প্রশাসক কাজীর কাছে নালিশ করতে লাগলেন-নিমাই পন্ডিত ও তার দলের লোকগুলো দিনরাত নাচে গায়। হল্লা করে আর জাতপাঁতের ভেদ একেবারে মানে না। আমাদের ধর্ম গেল, মান ইজ্জত গেল, নবদ্বীপ উচ্ছন্ন হতে চলেছে, প্রশাস্নে বিঘ্ন ঘটবে, আপনি রক্ষা করুন। কাজীও এই সব শুনে প্রথম প্রথম রুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু একদিন শ্রীচৈতন্য যখন হিন্দু মুসলমান সব শ্রেণীর মানুষ নিয়ে সংকীর্তন করে কাজীর বাড়ী গিয়ে দেখালেন এবং বোঝালেন যে তাঁর ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ হল সব মানুষেরই যথার্থ ধর্ম, -ভক্তির পথে জাতিবর্ণে হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদ নেই, আর এই জন্যই বিভেদকামী স্বার্থ পরায়ণদের ক্ষোভ,-তখন কাজী বুঝলেন। ক্রমে গৌরাঙ্গের এই আশ্চর্য মানবিকতার ধর্মে, নাম উচ্চারণের সঙ্গে অবিরল অশ্রুপাতে দেশ অভিভুত হয়ে পড়ল –একমাত্র বোধ হয় কিছু মুষ্টিমেয় রক্ষণশীল ছাড়া। রাজধানী গৌড়ের কাছাকাছি রামকেলি গ্রামে দবীর খাস ও সাকর মল্লিকের সন্ধানে যেদিন তিনি এলেন, সামনে পিছনে আশে পাসে হিন্দু –মুসলমান অগণিত মানুষ। শান্তি বিঘ্নিত না হয় এজন্য রাজকর্মচারী ও সৈন্যদের উৎকণ্ঠা-সেদিন সুলতান হুশেন শাহ নির্দেশ দিলেন – এই দরবেশ যেখানে খুশী স্বছন্দে যান আসুন, যেমন খুশী থাকুন, কেউ যেন না কোনো বাধার সৃষ্টি করে। ঐ সময় ওড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে হোসেন শাহের বিবাদ চলছিল, রাজ্যের সীমানা নিয়ে কলহ, কোনো সম্প্রদায়িক ব্যাপার নয়। তবু সুবর্ণরেখার এপারে মুসলমান সৈন্য, ওপারে প্রতাপরুদ্রের ওড়িয়া সৈন্য। কিছুদিনের জন্য লোক যাতায়াত প্রায় বন্ধই ছিল। কিন্তু এতে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সঙ্গীদের পুরী থেকে যাওয়া আসার কোনো অসুবিধাই হয়নি। দুই সীমান্তের হিন্দু ও মুসলমান শাসনকর্তা ও সেনাধ্যক্ষেরা সমায়িক সন্ধি করে ও মিলিত হয়ে রক্ষী সহ শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সঙ্গীদের পারাপার করিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পুরী থেকে এখানে আসার সময় তো মুসলিম সেনাপতি নিজে দশটি নৌকায় বোঝাই সৈন্য সহ শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সঙ্গীদের গঙ্গারঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দেন। আবার, বৃন্দাবন থেকে যখন ফিরে আসছিলেন সে সময় পাঠান সর্দার বিজুলি খাঁ তাঁকে সন্দেহ ক্রমে

ঘেরাও করে পরিশেষে তাঁর মহান ধর্মের স্বরূপ পরিচয় পেয়ে ও সে ধর্মে হিন্দু-মুসলিম দুয়েরই সমান অধিকারের তত্ত্ব জেনে অজস্র সালাম জানিয়ে ফিরে গেলেন।

মধ্যযুগের হিন্দুদের সামাজিক ধর্ম ও শ্রেণী বিন্যাসের ব্যাপারে মুসলিম রাষ্ট্রিক প্রশাসনের কোনো পক্ষপাত ছিল না। যদিচ হিন্দু ও মুসলমান, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সামাজিক ব্যবধান ছিল গুরুতর। সামাজিক ব্যাপার নিয়ে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে চায়নি, কারণ, স্থিতাবস্থা রক্ষিত হলেই প্রশাসন সহজ হয় ও নির্বিঘ্নে রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়।কিন্তু সামাজিক শ্রেণীস্বার্থ বিষয়ে প্রশাসন উদাসীন থাকলেও এর গোড়া ধরে টান দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য। আজকের ভারতব্যাপী সমাজ-বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রতিরোধের চিন্তায় তাই শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্ব ও খ্রীষ্টীয় ষোল-সতেরো শতাব্দীর মানুষে মানুষে সম্মেলনের বিষয় নিতান্তই স্মরণীয়।ঐ সময় প্রায় দু'তিন শতাব্দী ধ'রে শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠার গৌরবে দাম্ভিক উচ্চবর্ণের মানুষঘৃণা খুবই স্তিমিত হয়ে পড়ে। সাহিত্যে যেমন হিন্দু কবিরা নবীপুরাণ এবং কারবালার বিষাদ-কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করতে থাকেন, তেমনি অগণিত মুসলমান কবি সূফী প্রেম ও রাধাকৃষ্ণ কাহিনী মিশ্রিত ক'রে গান রচনা করতে থাকেন। বিখ্যাত কবি মুকুন্দ কবিকঙ্কণ তাঁর চন্ডীকাব্যে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য কালকেতু ফুল্লরার আদর্শ চারিত্র দেখালেন, আর কালকেতুর নগরপত্তনের বর্ণনার প্রথমেই স্থান দিলেন ধার্মিক মুসলমানদের। কী শ্রদ্ধার সঙ্গেই না তিনি তাঁদের বর্ণনা দিচ্ছেন- বড়ই দানেশমন্দ কিছুতে না চ্ছন্দ।–একান্ত সরল সোজা মানুষ এঁরা, কপটতার ধার দিয়েও চলতে চান না, ইত্যাদি ব'লে। আর একই সময়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বৈষ্ণবপদ লিখতে লাগলেন-সৈয়দ আলাওল, সৈয়দ মর্তুজা, সারিবিদ খাঁ প্রভৃতি অনেকে। "বিরহ বেদনা গাহে হীন আলাওল"-বৈষ্ণব আলাওলের নিজের উপর এই 'হীন' বিশেষণ প্রয়োগ দেখুন। আর নসীর মামুদের সেই বিখ্যাত আত্মনিবেদন-

অগম নিগম বেদ সার
লীলাত করত গোঠ বিহার
নসিরা মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রি।

শ্রীচৈতন্যের প্রেরণায় যে সহজ ভাবসাধনা স্ফুরিত হ'ল তার ধারায় সঞ্জীবিত হয়েছেন অগণিত গ্রামীন বাউল কবি। বিখ্যাত লালন ফকির স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন-

ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে
তাঁর কাছে জেতের বিচার নাই।

বৈষ্ণব বাউলদের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদ শূন্য পূর্ণ মানবিকতার প্রকাশ দেখে আজকের মহাকবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাদেরই সঙ্গে নিজের মানসিক সগোত্রতা অনুভব করে লিখেছেন- ওরা

অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্র বর্জিত .....

কবি আমি ওদের দলে

আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

হিন্দু-মুসলিম উচ্চ-নিম্ন বহু মানুষের প্রার্থিত স্বাধীনতা পঞ্চাশ বছর হ'ল পাওয়া গেছে, তবু স্বপ্নে যে পূর্ণতা কাম্য ছিল বাস্তবে তা করায়ত্ত হয়নি। তার উপর সমাজ-বৈষম্য সাম্প্রদায়িকতা এবং বিচ্ছিন্নতাবুদ্ধি আজ আমাদের পঙ্গু ক'রে রাখতে চাইছে। সাপ্রতিক এই দুঃখ বেদনায় মধ্যেও ভাবী আশা নিয়ে আপনাদের পরিচিত একটি স্বদেশী সংগীত একটু রূপান্তরে গাওয়া যেতে পারে-

কতকাল পরে বল ভারত রে।

দুখ-সাগর সাঁতরি পার হবে।।

গৌর-কৃষ্ণ-উপাসনায় নবদ্বীপ-বৃন্দাবন

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের মূলে সহজ অনুভব কিভাবে কাজ করেছে তার দৃষ্টান্ত গয়া-প্রত্যাবৃত্ত মহাপ্রভুর ভাবাবস্থা। কোনো কার্য-কারণ সূত্রে ব্যাপারটিকে ধরা যায় না ব'লে একে ধর্মের প্রকাশ বা আবির্ভাব বলা যেতে পারে। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং তৎশিষ্য ঈশ্বরপুরীপাদের সংসর্গে তাঁর ভাবোদ্গম হয়েছিল ব'লে এই ধর্মকে বিশেষভাবে বাঙলারই ধর্ম বলা যায়, আর মহাপ্রভুকে এই ভাবধর্মসম্প্রদায় প্রভাবিত করেছিল এমনও স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে। বাঙলার রাধাকৃষ্ণ গীতিকাব্য এবং স্মরণকীর্তনপরায়ণ ও পুলকাশ্রুমূর্ছাময় সূফীসাধকদের ধর্মসাধনাকেও এ ধর্মের ভূমিকারূপে দেখা যেতে পারে। মহাপ্রভুর জীবনী থেকে আমরা দেখেছি তাঁর মধ্যে সহসা-উদিত এই ধর্মসম্বন্ধে তাঁর কোনো সজ্ঞান প্রস্তুতি ছিল না। তিনি ব্যাকরণ, কাব্য এবং পৌরহিত্য-ক্রিয়াবিধির ছাত্র ছিলেন। কথকতা প্রভৃতি শোনার মধ্য দিয়ে পুরাণ এবং বিশেষতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের সঙ্গে তাঁর আর পাঁচজনের মতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু রাগানুগা ভক্তির কোনো পরিচয় তাঁর মধ্যে বা তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ অদ্বৈত-শ্রীবাসাদির মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। তাঁর চিত্তে নবভক্তিধর্মের আবির্ভাবের পরও দেখা যায় ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অর্জিত জ্ঞান সামান্যই ছিল। রাগাত্মিক প্রীতি, গোপীভাব, রাধাভাব প্রভৃতি বিষয়ে রামানন্দ তাঁর কৌতুহল চরিতার্থ করেন। আর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে নানান তীর্থে সাধুমহাজনদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সম্ভবতঃ শ্রী-সনকাদি তত্ত্ববাদিদের অভিমতও তিনি কিছু কিছু জেনে নেন। তিনি নিজে তত্ত্বের চেয়ে আচরণের উপরই জোর দেওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং এইজন্য ঠাকুর হরিদাস তাঁর গৌরবের পাত্র ছিলেন এবং রঘুনাথ দাস বিশেষ স্নেহভাজন হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং রাধাকৃষ্ণলীলাতত্ত্ব বিষয়ে কিছু লেখেননি এবং কেউ তাঁর কাছে এ বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হ'লে, হয় স্বরূপ দামোদর নয় রামানন্দের কাছে তাঁকে যেতে বলতেন। তবে তিনি রূপ-সনাতন গোস্বামীকে তাঁর সাধ্যমত এবং অতি সাধারণভাবে কৃষ্ণলীলাতত্ত্ব, নাম-মাহাত্ম এবং বৈষ্ণবাচরণ সম্বন্ধে

কিছু কিছু প্রেরণা দিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। (১) এ বিষয়ে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বর্ণনা অবিশ্বাস্য মনে হয় না এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রারম্ভে শ্রীরূপের স্পষ্টোক্তি – "হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোহহং বরাকরূপোহপি" – অর্থহীন নয়। কিন্তু তাহলেও একথা ঠিক যে, যে নবধর্ম তাঁর চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বতঃ-আবির্ভূত এবং নিয়ত নূতনতর হতে হতে প্রগাঢ়তা লাভ করেছিল, তার যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণে তিনি নিজে অক্ষম ছিলেন। নিরন্তর আস্বাদতন্ময় অবস্থায় যিনি যাপন করতেন, যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কার স্ববশে ছিল না, তাঁর পক্ষে আত্মবিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক বিচার প্রভৃতি অসম্ভবই ছিল। তাঁর লীলাসহচরেরা তাঁর বিচিত্র ভাববিলাস এবং বিবিধ বিকার দৃষ্টে রাগভক্তির শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে এবং শ্রীচৈতন্যের অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌরত্ব সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন। আশ্চর্য গৌরলীলাদৃষ্টে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণলীলাকে নূতন তাৎপর্য গ্রথিত করার প্রয়োজন উপলব্ধ হ'ল। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করলেন রূপ-সনাতন, গোপাল ভট্ট এবং জীব গোস্বামী। প্রয়াগে ও বারাণসীতে মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের উপর নির্দেশ দিয়েছিলেন কৃষ্ণলীলাতত্ত্বকেই নূতন এবং যথার্থতর আলোকে উপস্থাপিত ক'রে সাধারণ্যে প্রচার করতে। শ্রীরূপের রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক কাব্যগীতের সঙ্গে এবং শ্রী সনাতনের ভাগবতানুরাগ সম্বন্ধে মহাপ্রভু পূর্বেই অবহিত হয়েছিলেন, সুতরাং যোগ্যতম পাত্র নির্বাচনে তাঁর কোনো সংশয়ই ছিল না। শ্রীরূপাদি গৌরাঙ্গকে পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ জেনেও গৌরলীলাবর্ণনে প্রবৃত্ত হননি এবং কেবল গৌর-লীলার উপর ভিত্তি ক'রে রাগভক্তির দার্শনিক রহস্য বিশ্লেষণ না ক'রে কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যান কেন করতে গেলেন তাই নিয়ে কোনো পর্যালোচক নানাবিধ জল্পনায় উপনীত হয়েছেন। তাঁর সমগ্র অভিযোগটি এই –

Except the usual obeisance and homage to Chaitanya and general passages testifying to his identity with the supreme deity, there is nowhere in the extensive works of the early authoritative Gosvamins (Rupa, Sanatana & Jiva) and direct reference to his personal views and teachings. These theologians and philosophers are chiefly concerned with godhead of Krishna. Krishna and his Lila as revealed in the older scriptures and Krishna in their theory as we shall presently see, is not an Avatara, but the supreme deity himself. There are almost entirely silent about Chaitanya-Lila and its place in their devotional scheme and it is somewhat strange that in preserving a system in Chaitanya's name they rely exclusively upon older sources and

do not refer at all to his direct realization of spiritual truth. (ডঃ সুশীলকুমার দে-সম্পাদিত 'পদ্যাবলী'র ভূমিকা)।

ঘটনার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় রূপ-সনাতন এক্ষেত্রে প্রভুনির্দেশই আক্ষরিকভাবে পালন করেছিলেন। কৃষ্ণলীলাকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপিত করার পর এমন অবকাশ মেলেনি যাতে গৌরলীলায় হস্তক্ষেপ করেন। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে নবদ্বীপের প্রত্যক্ষদর্শীদের বহু পদরচনা, সংস্কৃত কড়চা এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে গ্রথিত চৈতন্যভাগবত রচিত হয়ে গেছে। শ্রীরূপাদি যে নিত্যানন্দ সম্পর্কে নীরব ছিলেন তারও কারণ এই এবং কিছুটা অনভিজ্ঞতাও হ'তে পারে, কিন্তু নিত্যানন্দবিমুখতা কোনোক্রমেই নয়। আমরা আরও অনুমান করি যে মহাপ্রভু রূপ-সনাতনকে তাঁর নিজলীলা-বর্ণনে প্রকারান্তরে নিষেধই করেছিলেন। কৃষ্ণ নাম ত্যাগ ক'রে তাঁর নাম গ্রহণ করায় তিনি কিরকম ক্ষুব্ধ হতেন তার পরিচয় চরিতামৃতে নানাস্থানে রয়েছে। রূপ-কৃত বিদগ্ধ-মাধব নাটকের প্রারম্ভে গ্রথিত "অনপিতচরীং চিরাৎ" ইত্যাদি বন্দনা শুনে মহাপ্রভু মন্তব্য করলেন – "এই অতি স্তুতি শুনিল"। ললিতমাধব নাটকের "নিজপ্রণটিতা" প্রভৃতি নান্দীতে পুনরায় আত্মস্তুতি শুনে বিরক্ত হয়েই মন্তব্য করলেনঃ

কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্যসুধাসিন্ধু। তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতিক্ষারবিন্দু।।

রামানন্দ রায় কৌশলে রূপ গোস্বামীকে সমর্থন জানালে পরঃ

প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস। শুনেইতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস।।

- চৈ, চ, অন্ত্যলীলা

মহাপ্রভু নিজ বৈরাগ্য এবং বৈষ্ণব-শিক্ষণের জন্যই যে কৃষ্ণলীলার উপর জোর দিয়েছিলেন তা নয়। নবধর্মের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্য বৃন্দাবনলীলার দার্শনিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং নোতুন রসসিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। নীলাচলে রূপ-সনাতনের আগমনপ্রসঙ্গ বর্ণনের উপলক্ষ্যে চরিতামৃতকার মহাপ্রভুর এই অভিলাষ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেনঃ

সবে কৃপা করি ইঁহার (=শ্রীরূপকে) দেহ এই বর। ব্রজলীলা
প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর।।..এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে। শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্তনে।।পুনশ্চ, দেহত্যাগে কৃতসংকল্প সনাতন গোস্বামীকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে মহাপ্রভুর উক্তিঃ

তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন। এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন।।
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বের নির্ধার।বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার।।

কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্তন। লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ।।

এই নব ভক্তিধর্ম সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের যা কিছু উপলব্ধি ও বাণী সে তো ঐ রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়েই। কৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা, বৃন্দাবনলীলার মুখ্যতা, গোপী-প্রেম ও রাধাভাব এবং প্রেমার পরমপুরুষার্থত্ব – এই সবই তো মহাপ্রভুর উপলব্ধি এবং বক্তব্য। স্বরূপ দামোদর (?) একটি শ্লোকে মহাপ্রভুর অভিমতের সারসংক্ষেপ ক'রে বলছেনঃ

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।

এ ছাড়া, বহিরঙ্গ-শিক্ষণ হিসেবে মহাপ্রভু নামগ্রহণের উপরেই জোর দিয়েছেন। তাঁর রচিত 'শিক্ষাষ্টক' নামে প্রচলিত আটটি শ্লোকে তিনি যেমন নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করেছেন, তেমনি বৈষ্ণব-শিক্ষণের দিক্‌টি যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করেছেন। তাঁরই ইঙ্গিতে সনাতন তাঁর হরিভক্তিবিলাসে এবং রূপ তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নামমাহাত্ম প্রচার করেছেন। সুতরাং মহাপ্রভুর উপলব্ধিকে উপেক্ষা ক'রে তাঁরা কৃষ্ণলীলাবর্ণনে আগ্রহী হয়েছিলেন এরকম অভিমত শ্রোতব্য নয়।

ঐ ভূমিকাতেই ডঃ দে-র দ্বিতীয় অভিযোগ হ'ল এই গোস্বামিত্রয় মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষানুভূতির দিক্‌গুলি উপেক্ষা ক'রে পুরাণবর্ণিত বিষয় এবং পরস্পর-বিরোধী আখ্যান-উপাখ্যানের সমাধান করতে গিয়ে অনর্থক তাঁদের প্রতিপাদ্যকে জটিল ও দুরবগাহ ক'রে তুলেছেন। "... while the intellectual seriousness or the ethical nobility of the heart is hardly propounded with force of direct realization, in as much as they are completely merged in a floating mass of uncertain myths, legends and traditional beliefs." বলা বাহুল্য, এ ধরণের আলোচনা ভারতীয়ের লেখনী থেকে নির্গত না হয়ে বৈদেশিকের লেখনী থেকে নির্গত হ'লেই যথাযথ হ'ত। গোস্বামীরা পৌরাণিক ব্যাপার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্যই ছিল, অন্ততঃ সেকালে। হৃদয়ে উপলব্ধ ঐ নবধর্মটিকে প্রচলিত বহুধা বিচিত্র ধর্মীয়তার উপরে তাঁদের স্থাপন করতে হয়েছিল। শুধু শ্রী-রুদ্রাদি সম্প্রদায়ে প্রচলিত তত্ত্বেরই খন্ডন করতে হয়নি। বিষ্ণু, নারায়ণ, অবতার কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, রুক্মিণী – সত্যভামা প্রভৃতি নিয়ে যে সব কাহিনী, এবং তাত্ত্বিকতা প্রচলিত ছিল তার গ্রহণ-বর্জন করতে হয়েছিল এবং সর্বোপরি গোপীভাব এবং রাধাবাদের উপর ব্রজলীলার ভিত্তি স্থাপন করতে

গিয়ে নোতুন যুক্তি বিন্যাস ক'রে সমস্ত পুরাণকে ঢেলে সাজাতে হয়েছিল। গোস্বামীরা বেদোক্তির প্রামাণিকতার উপর নির্ভর না ক'রে পুরাণের উপর জোর দিতেই পুরাণ-প্রসঙ্গগুলির পুনর্বিচার অত্যাবশ্যক হয়েছিল। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই উপলব্ধিতে আস্থাবান্ হওয়ায় অবতারবাদকে তাঁরা ঢেলে সাজালেন। গুণাবতার, লীলাবতার, প্রকাশ-বিলাসাদির পার্থক্য, দ্বারকা-বৃন্দাবনের সামঞ্জস্য এসব বর্জন ক'রে পূর্ণাঙ্গ দার্শনিকতা কিভাবেই বা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে? কেবল প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয় বিশ্লেষণ ক'রে তো কবিতা-গান রচনা চলে। সে প্রয়াস তো ঐ সময়ে নরহরি-বাসুদেবাদির রচনায় এবং মুরারি-গুপ্ত-কর্ণপুর-বৃন্দাবনের জীবনীতে বা কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সিদ্ধ হয়েছে। শ্রীরূপ যদি দ্বিতীয় চৈতন্যচন্দ্রোদয় লিখতেন – সমালোচক কথিত 'direct realization '-এর বিষয়টি আর কতদূর বর্ধিত হ'তে পারত? আর নিগূঢ় শ্রীচৈতন্য-জীবনী রচনার যা সারাংশ তা-ই তো তাঁদের নবভক্তি-উদ্দীপিত গ্রন্থাদিতে বিস্তৃত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি এবং পদ্যাবলী প্রভৃতির গ্রন্থন কি মহাপ্রভুর হৃদয়ানুভবকেই বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করছে না? বস্তুতঃ রূপ-সনাতন এবং জীব ঐ Realisation –এর যৌক্তিক এবং কাব্যিক রূপ দিতে গিয়ে তাঁদের জীবৎকালে যা ক'রে গেছেন তার তুলনা বিরল। এক হাতে অদ্বৈতবাদিদের সঙ্গে, অন্য হাতে বিশিষ্টাদ্বৈত বা প্রচলিত দ্বৈতবাদিদের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁরা যে বিজয়ী হয়েছেন এবং প্রভুদত্ত প্রেরণার মর্যাদা নিঃশেষে রক্ষা করেছেন এর চেয়ে গৌরবের বিষয় তাঁদের এবং আমাদের আর কী হ'তে পারে?

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বলতে যা বোঝায় তা মুখ্যতঃ ঐ শ্রীপাদ-সনাতন-রূপ-জীব গোস্বামীর সৃষ্টি। মহাপ্রভুর মতানুযায়ী ভাগবতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এই দর্শনের সারকথাসমূহ নিহিত এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি রসব্যাখ্যানে এই দর্শন পল্লবিত। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর ভাগবত-সন্দর্ভে রূপ-সনাতন-গোপাল ভট্টের আলোচনার সারনিষ্কর্ষ যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি তাঁদের সকলের গ্রন্থের সার সন্নিবেশিত হয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাঙলা গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে। চরিতামৃত আবার উক্ত গ্রন্থাদি থেকে অধিকগুণও বটে। শ্রীচৈতন্যের নিগূঢ় রাধাভাবলীলা, স্বরূপ দামোদর ও তৎশিষ্য রঘুনাথদাস গোস্বামী বর্ষ বর্ষ ধ'রে যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার অধিকারলাভে ধন্য হয়েছিলেন কবিরাজ গোস্বামী। গোস্বামীগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গলীলা (বহিরঙ্গ লীলা তো বটেই) একাধারে সমীকৃত হয়ে এ গ্রন্থে বিরাজ করছে। কবিরাজ গোস্বামীকে নমস্কার। এই একটি গ্রন্থেই তিনি তাত্ত্বিক, রসলিপ্সু এবং লীলাশ্রবণোৎসুক পাঠককে সম্যক পরিতৃপ্ত করেছেন, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবস্বরূপা রাধাকে একাধারে ভক্তচক্ষুর গোচর

করেছেন। কৃষ্ণলীলা এবং গৌড়লীলার নিঃশেষ একত্বানুভব নবদ্বীপের লীলাপরিকরদের অন্তরে প্রতিভাত হয়নি, তাঁরা গৌরকৃষ্ণের অভিন্নতা যদিচ অনুভব করেছিলেন, তা আরও বিস্তৃত ক'রে পূর্ণাঙ্গ প্রেমলীলাবাদের যৌক্তিক অথচ হার্দিক বিশ্লেষণ তাঁরা উপস্থাপিত করতে পারেননি। সন্ন্যাসাশ্রিত শ্রীগৌরের নীলাচললীলার অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছিল একমাত্র তাঁরাই পুর্বাপর মিলিয়ে সমগ্রভাবে বিষয়টিকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। এদিক থেকে ক্রমানুসারে রামানন্দ-স্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ দাস-জীব-কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ সাধকদের অনুভবই অগ্রগণ্য। নবদ্বীপলীলা-সহচরেরা, মুখ্যভাবে অদ্বৈত-নিত্যানন্দ এবং সহায়কভাবে শ্রীবাস, মুরারি, গদাধর, নরহরি, গোবিন্দ-বাসুদে, , মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি এক অতি মহৎ কর্তব্য সাধন ক'রেছিলেন, তা হ'ল শ্রীগৌরের কৃষ্ণত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি ক'রে ঈশ্বরীয় লীলার প্রকাশের আনুকূল্য বিধান। এঁরা লক্ষ্য করেছিলেন ধর্মসংস্থাপক কৃষ্ণ নামকীর্তনমুখে কলিযুগের উপযোগী প্রেমভক্তি প্রচার ক'রে আচন্ডাল মানুষকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। সন্ন্যাস-পূর্ব বৎসরেক সময়ের বিবিধ আবেশময় ও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল নবদ্বীপলীলায় অভিভূত এবং সন্ন্যাসে নিতান্ত ব্যাকুল বিমূঢ় পরিকরবৃন্দের কাছে এ ছাড়া আর কিছু প্রতিভাত হয়নি। কেন তীব্র বৈরাগ্য, কেন অশ্রু-কম্প-মূর্ছাদি, কেন কৃষ্ণের গৌরবর্ণ এ সবের সমাধানে তাঁরা অগ্রবর্তী হননি। নীলাচল-বৃন্দাবনের যে সব বিদগ্ধ প্রেমিক খুঁটিয়ে গৌরলীলা অধ্যয়ণ করলেন তাঁরা নবদ্বীপ-পরিকরদের দর্শনের উপর ভিত্তি ক'রেই পূর্ণাঙ্গ রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণদর্শন গ'ড়ে তুললেন। এই দুই রীতির দর্শনে মৌলিক পার্থক্য কিছু নেই। দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর নির্ভরশীল এবং পরিপূরকভাবে স্বভাবতই গ'ড়ে উঠল। ফলে কেউ ভগবান্-বোধে গৌরবিগ্রহের আরাধনা করতে লাগলেন, আবার কেউ নবদ্বীপলীলার চেয়ে ব্রজলীলাতেই আসক্ত হলেন (২)। কবিপর্ণপুর যদিচ পিতৃ-ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রে গৌরভজনেই নিরত ছিলেন এমন মনে করা যায়, তবু তিনি এ বিষয়ে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক অভিমত পোষণ করতেন না এবং এর সাধারণের ইঙ্গিতও তিনি তাঁর নাটকে দিয়েছেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের দ্বিতীয়াঙ্কে গৌররূপ এবং শ্যামরূপ বিষয়ে অদ্বৈতের সংশয়ে নাট্যকার তদানীন্তন 'মহামহিম'দের উপলব্ধিই ব্যক্ত করলেন – গৌর এবং শ্যাম অভিন্ন, লীলায় রূপভেদ এবং ভাবভেদ মাত্র। উপাস্য শ্যাম এবং গৌর দুই-ই হ'তে পারে, অহেতুকী প্রীতি যদি আকর্ষণের হেতু হয়। চরিতামৃতে দেখা যায়, রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের মধ্যে রাধাস্বরূপাবৃত শ্যামকে লক্ষ্য ক'রে সংশয়ী হয়ে মহাপ্রভুকেই জিজ্ঞাসা করছেনঃ

পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ। এবে তোমা দেখোঁ মুঞি শ্যাম গোপরূপ।।

তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পাঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা।। রামানন্দ লীলাশুকের মতো মাধুর্য-সিন্ধু গোপকৃষ্ণের উপাসক হ'লেও শুদ্ধসখ্যে চৈতন্যোপাসকও ছিলেন ("পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য")। সার্বভৌম ভট্টাচার্য নীলাচললীলা-তত্ত্বজ্ঞ হয়েও সম্ভবতঃ গৌরভজনেই আসক্ত ছিলেন। স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর অতি প্রিয় এবং মুখ্যলীলাসঙ্গী হ'লেও সম্ভবতঃ রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণরূপেই তিনি অনুরক্ত ছিলেন। সনাতন-রূপ-জীব গোস্বামী কৃত বিভিন্ন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এবং স্তবাদিতে গৌরাঙ্গের ভগবত্তা পুনঃপুনঃ কীর্তন করা হয়েছে, তবু তাঁরা ভাগবতপ্রতিপাদ্য রাসরসিক কৃষ্ণের লীলাতেই সম্ভবতঃ নিহিতচিত্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের দ্বারা অনুপ্রেরিত হওয়ার পূর্বেই রূপ-সনাতন ভাগবতধর্মী ছিলেন। তখন সনাতন লিখনে কিছু প্রকাশ করেননি, কিন্তু রূপ রচনা করেছিলেন অন্ততঃ 'হংসদূর' এবং 'উদ্ধবসন্দেশ'। শ্রীচৈতন্যে এঁদের ঐতিহ্য এবং মানসিকতা উপলব্ধি ক'রে কৃষ্ণলীলা-ব্যাখ্যানেই এঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই রাধাভাব-বিগ্রহ যখনই অবকাশ পেয়েছেন তখনই "গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর" কৃষ্ণের আরাধনারই প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। ত্রিহুতের রঘুপতি উপাধ্যায়ের চৈতন্য-সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ ((চৈ চ মধ্যলীলা) অন্য বহু দৃষ্টান্তের একতম, -

প্রভু কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায়। শ্যামমেব পরং রূপং কহে উপাধ্যায়।।
শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়। পুরী মধুপুরী বরা কহে উপাধ্যায়।।
বাল্য পৌগন্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং কহে উপাধ্যায়।।
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়। আদ্য এব পরো রসঃ কহে উপাধ্যায়।।
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে। এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্‌গদ্‌স্বরে।।

শ্রীচৈতন্যের সর্বাধিক গৌরবের পাত্র ঠাকুর হরিদাস উচ্চকণ্ঠে কোন্ প্রিয়-নাম কীর্তন করতেন এবং তাঁর অভিলাষই বা কী ছিল? দেখা যায়, চৈতন্য নাম নয়, হরিনাম, এবং অন্ততঃ অদ্বৈত্য-চৈতন্য সংসর্গে এসে তাঁর অভিলাষ জন্মেছিল – 'নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে'। নিজ নাম গ্রহণ করায় শ্রীচৈতন্য কি রকম বিক্ষুব্ধ হ'তেন তার পরিচয়ও চরিতামৃতে রয়েছেঃ

একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্তন।।
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচনে। কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্তনে।।
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সভাকার মন। স্বতন্ত্র হইয়া সভে নাশাবে ভুবন।।

এ-বিবরণ অবিশ্বাস্য হ'তে পারে না। প্রবীণ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের দুই শ্লোকে চৈতন্যস্তুতি তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অথচ এই চৈতন্যই প্রথম ভাবাবেশ সময়ে নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্য্য প্রমুখ প্রবীণ ভক্তদের মন্ত্রোচ্চারণে নিয়মিত পূজা স্বীকার করেছিলেন।

কিন্তু সে একদিন, আর সন্ন্যাসগ্রহণের পর এ আর একদিন। হিসেবে দেখা যায়, রায় রামানন্দের পর স্বরূপের অভিমতই মহাপ্রভুর একান্ত সমাদারযোগ্য ছিল এবং তিনি যে তাঁর অশেষ স্নেহভাজন রঘুনাথ দাসকে স্বরূপের নিকট সমর্পণ করেছিলেন তা অর্থহীন নয়। নবদ্বীপের পরিকরদের অনেককেই মহাপ্রভু গৌর-আরাধনা থেকে নিরস্ত করতে পারেননি। নরহরি বাসুদেবাদি মমতাধিক্যবশতঃ যে পথ ধরেছিলেন তা থেকে নিরস্ত করা সহজও ছিল না। মুরারিকে রামভক্তি থেকে নিরস্ত করার ইচ্ছাও মহাপ্রভুর ছিল না। কিন্তু নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু যথার্থই পেরে ওঠেননি। তিনিই বাঙলাদেশে জাতিকুল নির্বিচারে সকলকে গৌরহরি নাম গ্রহণ করিয়েছিলেন। ফলতঃ এই দাঁড়াল যে, একালের বাঙলায় লিখিত পদে, চরিতাখ্যানে এবং আরাধনায় কৃষ্ণস্বরূপ গৌরই কিছুকাল পর্যন্ত কীর্তিত হ'তে থাকলেন এবং নীলাচল-বৃন্দাবনে অধিকতর চমৎকার সূক্ষ্মবৈদগ্ধ্যপূর্ণ রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণই প্রচারিত হ'লেন। ক্রমশঃ স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় অনুভব প্রথমটি কে সমাচ্ছন্ন ক'রে বাঙলায় সর্বত্র গৃহীত হয়। কিন্তু তা ষোড়শ শতকের সপ্তম দশকের আগে নয়। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর মথুরা-বৃন্দাবনের সঙ্গে বাঙলার সংযোগ দৃঢ়তর হ'তে থাকে, বাঙলার বর্ষীয়ান মহান্তেরা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণাঙ্গ লীলাবাদের অভিমুখীন হ'য়ে নীলাচল-বৃন্দাবনের অভিমতের সমাদর করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে নরহরি সরকার রচিত চৈতন্যের নবদ্বীপলীলার পদের সঙ্গে নীলাচললীলার পদের পার্থক্য স্মরণীয়। অদ্বৈত-নিত্যানন্দের অপ্রকটের পর বাঙলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব আংশিকভাবে শ্রীখন্ডে চালিত হয়। 'গৌর-নাগর' ভাবের প্রবর্তক বিখ্যাত নরহরি সরকার ঠাকুর এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীচৈতন্যের নিতান্ত প্রিয় রঘুনন্দন উদ্‌যোগী হয়ে শ্রীনিবাস আচার্যকে বৃন্দাবনে অধ্যয়ন করার জন্য পাঠান। জাহ্নবী ঠাকুরাণী, বীরভদ্র, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতিরও বৃন্দাবনের সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ জানবার আগ্রহ কম ছিল না। বৃন্দাবন-প্রত্যাগত ঠাকুর নরোত্তমের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উৎসবে জাহ্নবী দেবীর আনুকূল্য সকলের জানা। ঐ সময়েই কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাসের পদে রূপ-প্রবর্তিত নূতন ও সূক্ষ্ম বৈদগ্ধ্যের সন্নিবেশকে সকলেই অভিনন্দিত করেছেন।

বলা হয়েছে, চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস যখন তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করেন (আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীঃ) তখন স্বরূপ-দামোদর প্রমুখ নীলাচলবাসীদের অভিমত এবং সেইসঙ্গে সনাতন-রূপের কিছু কিছু অভিমত নিশ্চয়ই নবদ্বীপে এসে পৌঁছেছিল; সেক্ষেত্রে বৃন্দাবন ঐ নূতন অভিমত সম্পর্কে নীরব রইলেন কেন? এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, রূপ-সনাতনের ভক্তি ও রসশাস্ত্রে অভিনিবেশ নবদ্বীপবাসীদের কর্ণগোচর হ'লেও তখনও ঠিকমত জানবার কথা নয়। আর স্বরূপ-দামোদরের সিদ্ধান্ত হয়তো মহাপ্রভুর লীলার শেষের দিকে অদ্বৈত-

মুরারি-শিবানন্দের গোচর হয়েছিল, কিন্তু তা সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ জানলেও এসব গ্রাহ্য করতেন না। স্ব-ভাবেই মত্ত থাকতেন। কবিকর্ণপুর তো তখনও বালক। আর মুরারি সম্ভবতঃ সংস্কৃত জীবনীতে মহাপ্রভুর নীলাচল-অবস্থানের প্রথম দিক্ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ঐ জীবনীর তৃতীয়র্ধ ও চতুর্থ প্রক্রম মুরারির কিনা সন্দেহ। মহাপ্রভুর তিরোধানের স্বল্প পরেই স্বরূপ-দামোদর তিরোহিত হন। রঘুনাথদাস গোস্বামী যিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ও লীলা-কড়চা কণ্ঠস্থ করেছিলেন তিনিও বৃন্দাবনপ্রয়াণ করেন। ফলতঃ অন্ত্যলীলা লেখার সময় বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর রসরাজ-মহাভাবত্ব কানে শুনলেও সম্যক্ না জানায় গ্রন্থমধ্যে স্থান দিতে পারেননি। দেখা যায়, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ও নীলাচল যাত্রা পর্যন্ত ঘটনা বৃন্দাবন যে রকম মনপ্রাণ দিয়ে প্রকাশ করেছেন, অন্ত্যলীলা সে রকম পারেননি। অন্ত্যলীলার ঘটনার বর্ণনায় তাঁর গ্রন্থে নানান্ অসংগতিও লক্ষ্য করা যায়। এরকম ক্ষেত্রে নীলাচল-বৃন্দাবনের মত বৃন্দাবনদাস অধিগত ক'রেও তাঁর গ্রন্থমধ্যে স্থান দেননি এ অভিযোগ যথার্থ নয়। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল যে রীতির গ্রন্থ তাতে ইতিবৃত্ত বা তত্ত্বরসের কোনো বৈদগ্ধ্য তাঁর কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। নীলাচল-বৃন্দাবনের রাধাভাবিত-কৃষ্ণমত শ্রীনিবাস-নরোত্তমের বৃন্দাবন গমনের পূর্বে বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বিশেষতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃত গ্রন্থের প্রচারের পূর্বে নয়। এরপর থেকে বাঙলার আচন্ডালদ্বিজ বৈষ্ণব সমাজ মোটামুটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এক, শিক্ষাদীক্ষাহীন বৈষ্ণবজন যাঁরা নিত্যানন্দ-বীরচন্দ্র প্রচারিত সহজ প্রেমভক্তিকে ধরে রইলেন, আর এক, যাঁরা শিক্ষার আভিজাত্যসম্পন্ন, নব গোস্বামী-শাসিত বাদানুবাদনিষ্ঠ পন্ডিত-ভক্ত, শাস্ত্রাধ্যায়ী ও কবিসমাজ। উভয়পক্ষের যৎকিঞ্চিৎ যোগাযোগ অবশ্য অনুমেয়।

উপরিলিখিত বিবরণ থেকে সহজেই উপলব্ধ হবে যে, নবদ্বীপ নীলাচল বৃন্দাবনে এই নবলোকধর্মের উদ্গাতা সম্পর্কে স্বল্পভিন্নরীতির ধারণা ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি প্রচলিত থাকলেও তা এমন প্রকট ও সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেনি যাতে মহান্ত ও ভক্তদের মধ্যে বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য ঘটে। অথচ ইতিবৃত্তাশ্রয়ী আধুনিক কোনো কোনো বিচারক জীবনী ও তত্ত্বগ্রন্থের উল্লেখাদির বিচার ক'রে নবদ্বীপ-বৃন্দাবনের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষের বীজ দেখতে পেয়েছেন। আমরা পূর্বেই 'পদাবলী'র ভূমিকা থেকে ডঃ সুশীলকুমার দে-র অভিমত উদ্ধার করেছি। বিষয়টিকে আরও বিস্তৃত ক'রে তিনি দেখেছেন Vaisnava Faith and Movement। এর পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বলছেনঃ

Unlike the Vrindavana Gosvamis, they take Chaitanya as the centre of their thought and emotion, and regard him as the highest reality

and object of adoration of their faith. This has been characterized as the Gauraparamya-Vada, which the Vrindavana Gosvamis never discuss or set forth in their theological treatises. In the eyes of the contemporary composers of padas of Chaitanya for instance, Chaitanya is Krisna himself who in his recollection for Vrindavana pines for Radha. They also believe in the Radha Bhava of Chaitanya as both Krisna and Radha in one personality. They do not, however, consider it necessary to discuss the question, but take it as already established by Anubhava or personal experience. Narahari and his disciple Lochana, however, develop a doctrine of Gaura-nagara-bhava in which the devotee (in the Raganuga way) regards Chaitanya as the Nagara and himself as a Nagara. But this doctrine receives little credit in the orthodox circles....

ইত্যাদি অভিমতের প্রতিধ্বনি ক'রে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থে একেবারে স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন - "গৌড়মন্ডলে একপ্রকার মতবাদ এবং বৃন্দাবনমন্ডলে অন্যপ্রকার মতবাদ স্থাপিত হইয়াছিল"। এবং "বৃন্দাবনে ও গৌড়দেশে উত্থিত দুই মতবাদে শ্রীচৈতন্যের স্থান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট গৌরাঙ্গ হইতেছেন উপায়মাত্র ((means to an end) আর গৌড়ে উত্থিত মতবাদে তিনি স্বয়ং উপেয়(end in itself)" (৩) এই দ্বিতীয় বিবৃতিটেই অভিযোগ হিসেবে গুরুতর এবং শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালে তাঁর প্রত্যক্ষেই এরকম দ্বান্দিক মত প্রচলিত হয়েছিল এই ইঙ্গিতে প্রকারান্তে তাঁর প্রতিও কটাক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু আগে ডঃ দে-র প্রথম বক্তব্য পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। তিনি বলছেন, নবদ্বীপের পরিকরবৃন্দের মধ্যে কোনো সুসংগ্রথিত মতবাদ গড়ে ওঠেনি। তাঁরা নিজ অন্তর দিয়ে শ্রীগৌর বিষয়ে যে-যে ধারণায় উপস্থিত হয়েছিলেন তা-ই ব্যক্ত করেছেন। নরহরি ও তৎশিষ্য লোচন যে পথে গেছেন, শ্রীবাস, মুরারি, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ সে পথে যাননি। নরহরি সরকার বিরচিত পদে যেমন গৌর-নাগর ভাব দেখা যায়, তেমনি গোপীভাব বা রাধাভাবের পরিচয়ও পাওয়া যায়। আবার কবিকর্ণপূর তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে চৈতন্য জীবন যেমনভাবে বর্ণনা করেছেন, নাটকে ঠিক তেমনভাবে করেননি। অথচ একটি বিষয়ে এঁরা সকলেই একমত যে, শ্রীচৈতন্য কলিযুগে আবির্ভূত কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নন। নরহরি-বাসুদেব যখন গৌরাঙ্গকে নাগররূপে এবং নবদ্বীপবাসিনীদের নাগরীরূপে বর্ণনা করেছেন তখনও গৌরাঙ্গে ভাগবতের কৃষ্ণত্ব উপলব্ধি ক'রেই তাঁরা তা করেছেন, আবার যখন সন্ন্যাসী

গৌরাঙ্গের কৃষ্ণসঙ্গপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা বর্ণনা করেছেন তখনও কৃষ্ণবোধেই করেছেন; রাধাভাব-অবলম্বণকারী কৃষ্ণবোধে এই যা তফাৎ। কিন্তু তা'হলে রূপ-সনাতন-রঘুনাথদাসের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য কোথায়? যদি বলা যায়, নবদ্বীপ-পরিকরদের সহজ উপলব্ধি ছিল('simple and passionate') স্বরূপ-রূপের তা ছিল না, তা'হলে সে তো অত্যন্ত বিপজ্জনক অথবা খামখেয়ালী মন্তব্যে দাঁড়ায়। এর প্রমাণই বা কী, যখন রূপ-সনাতন-জীব তাঁদের শতাধিক বন্দনায় এবং অন্যপ্রকারেও শ্রীচৈতন্যকে ভগবান্ বলেই বিবৃত করেছেন? আবার এই দুই মতবাদীদের একজনকে বলতে দেখা যাচ্ছে – "ভাবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার সহিত শ্রীচৈতন্যের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।এই হিসাবে স্বরূপ-দামোদর যে প্রকারে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের রচিত সাহিত্যে যাহা প্রচারিত হইয়াছিল তাহার সহিত ঐতিহাসিক চৈতন্যের অনেকটা মিল আছে" (চৈ-উপাঃ)। তাহ'লে তো গোল চুকেই গেল। তাহলে আর লেখক তাঁদের উদ্ভাবিত গৌর-পারম্যাবাদের দোহাই দিয়ে কবিকর্ণপুরের 'গোস্বামী' না হওয়ার জন্য আক্ষেপ করেন কেন? – "বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা যে ছয় গোস্বামী নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র হইয়াও এবং অতগুলি গ্রন্থ লিখিয়াও স্থান পাইলেন না; অথচ শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না আসিয়া এবং রঘুনাথ ভট্ট লোকো গ্রন্থ না লিখিয়াও স্থান পাইলেন"। কিন্তু "গৌর-পারম্য" শব্দের অর্থ কী? এতে কি এই ব্যঞ্জিত করে যে, কৃষ্ণসম্পর্কহীন গৌরই স্বয়ং ভগবান? ডঃ সুশীলকুমার শুধু সাম্প্রদায়িকতারই আভাস দিয়েছেন, ভিতরে প্রবেশ ক'রে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনবোধ করেননি। ভেবে দেখেননি যে কোনো ভক্ত 'রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ' প্রত্যক্ষ ক'রেও ভজনের জন্য গৌরবিগ্রহকে স্বচ্ছন্দে অবলম্বণ করেন। ডঃ বিমানবিহারী বলছেনঃ "শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার ও সম্ভবতঃ মুরারি গৌরমন্ত্র-দ্বারা রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ গৌরাঙ্গেরই উপাসনা প্রবর্তন করেন"। রক্ষা করেছেন, ভাগ্যিস বলেননি যে, কৃষ্ণ-সম্পর্কহীন গৌরেরই ভজনা করেছেন দ্বিতীয় স্বয়ং ভগবান্ হিসাবে! কিন্তু ওকথার কোনো প্রমাণ নেই, নরহরি শিবানন্দ গৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেননি। আসলে এ হ'ল ভজন-সাধনের ব্যাপার, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"। যেমন একজন বহু পরবর্তী পদকার বলছেন "যার মনে লেগেছে যারে তারা ভজুক তারে গো, মোর মনে লেগেছে ভালো শচীর দুলাল গোরা গো"। এসব নিয়ে ইতিবৃত্তের কার্য-কারণের কোনো যোগ নেই। একথা কোনোমতেই মনে করা যায় না যে নরহরি, শিবানন্দ, মুরারি মহাভাব-ব্যাকুলিত প্রত্যক্ষ কৃষ্ণের ধারণার উপর বিতৃষ্ণ ছিলেন। তারপর ঐ গৌর-নাগর ভাব। এর ভিত্তি যদি বৃন্দাবনের নটবর কৃষ্ণের উপর না হয় তাহলে এর কোনো অর্থই হয় না। গয়া-প্রত্যাগত

বিশ্বম্ভরের নৃত্য-কীর্তনাদি-সমন্বিত ভাবাবেশ ও পুষ্পমালাঢ্য চাঁচরচিকুর সুশোভিত নবীন রূপ ভাগবত-গীতগোবিন্দ-চন্ডীদাস-পদাবলীর পাঠক ভক্তের মুগ্ধ দৃষ্টিতে গোপীচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণের ব'লে প্রতিভাত হওয়াতেই গৌর-নাগর ভাবের বর্ণনা। রাধামোহনঠাকুর এইজন্যই নরহরি-লোচন-বাসুঘোষের পদকে 'ভাব-বিতর্ক' ব'লে এর যথাযথ মূল্যায়ণ করেছেন। বৃন্দাবনদাস এর সপক্ষতা করেননি, কারণ ব্যাপারটি ঐতিহাসিক বাস্তব নয়। লোচনদাস যে করেছেন তার কারণ গুরু নরহরির নির্বিচার অনুসরণ এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাব, ভাবকল্পনার প্রাবল্য। তবু গৌরনাগর-ভাবনাকেও অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌরত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করা যায় না।

এঁরা যাঁরা চৈতন্যজীবনী এবং জীবনীগ্রন্থসমূহের উপর ইতিহাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ছোটখাট বিরুদ্ধতা এবং অসংগতির সমন্বয় সাধন না করতে পেরে নানান জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা কলহ-সমাচ্ছন্ন বুদ্ধিতে মাঝে মাঝে কিরকম ভ্রম-প্রমাদ ক'রে ফেলেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। Vaisnava Faith and Movement গ্রন্থে চৈতন্য-জীবনের উপকরণ সংগ্রহে নিরত লেখক বলেছেনঃ

"Vasudeva paints Chaitanya as a devout person even from his birth : and like Narahari and some other Pada-writers, he believes in the Radha-bha-va of the Chaitanya incarnation – a doctrine, which is found indeed in the Stotras of Gosvamins and in the Ramananda Ray episode described by Krisnadasa Kaviraja, but which must have been a dogma of an earlier Na-vadvipa origin." -এর পাদটীকায় উদাহরণ দেওয়া হয়েছেঃ

নরহরিঃ গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে। ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে।। বাসুদেবঃ আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কাঁদে লোটায় ধরণী।। শিবানন্দ সেনঃ রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মূরছিয়া। শিবানন্দ কাদে পঁহুর ভাব না বুঝিয়া।।

পাঠক বিচার করুন, একে কি 'রাধাভাব' বলে? না এ কৃষ্ণভাব? অবশ্য রাধাসন্ধীয় ভাব এমন মধ্য-পদলোপী সমাসের কষ্টকল্পনা করলে প্রযুক্ত রাধাভাবের অর্থ হ'তে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, 'রাধার ভাব' এই অর্থেই শব্দটি পারিভাষিক হয়ে পড়েছে, খুশিমত ব্যাখ্যা করার কারো অধিকার নেই। ঐ গ্রন্থাকারে ব্যাখ্যানের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানের গ্রন্থকারের অভিমতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ইনি কৃষ্ণভাবকে রাধাভাব ব'লে বিষয়টিকে গোলমেলে করেননি, কিন্তু নীলাচল ও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের উপলব্ধির মহিমা খর্ব করতে বদ্ধপরিকর হয়ে শ্রীরূপ লিখিত চৈতন্যাষ্টকের রাধাভাবাবস্থার সঙ্গে সরকার ঠাকুর রচিত পদের কৃষ্ণভাবাবেশের ঐক্য নির্ধারণ করেছেন। কারণ বৃন্দাবন-স্মরণের কথা দুয়েতেই

আছে। ব্যঞ্জনা এই যে, সরকার ঠাকুরের রচনা অবলম্বণেই রূপগোস্বামী লিখেছেন। যেমন – "গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে। ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে।।

সুরধুনী দেখি পঁহু যমুনায় ভ্রমে। ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে।।

পূরব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে। পীতবসন আর সে মুরলী চাহে।। ...ইত্যাদি

.....শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যাষ্টকে প্রভুর নীলাচনের সমুদ্রতীরস্থ উপবন দেখিয়া বৃন্দাবন মনে পড়ার কথা আছেঃ

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া

মুহুর্বৃন্দাবণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ।

ক্বচিৎ কৃষ্ণবৃত্তিপ্রবলরসনো ভক্তিরসিকঃ

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।--

.....নরহরি সরকার ও শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের একই রূপ ভাবাবেশে (!) ভ্রম বর্ণনা করিয়াছে"।

স্বমতের পোষকতা করতে গিয়ে এরকম অনেক বিষয় তিনি তাঁর বিখ্যাত 'উপাদানে' কৌশলে সজ্জিত করেছেন যাতে নীলাচল-বৃন্দাবন-tradition এবং গ্রন্থরচনাদি পাঠকের কাছে যথার্থই কৃত্রিম ও স্বল্পমূল্য প্রতিভাত হয়। তিনি নিশ্চিত বুঝেছেন যে গৌর-নাগরভাব বিষয়ে পদরচনা করেছিলেন ব'লেই মুরারি, কবি-কর্ণপুর এবং বৃন্দাবনদাস নরহরির উল্লেখ করেননি। নরহরির নবদ্বীপ-লীলাপরিকর হিসেবে অবিসংবাদিত প্রাধান্যের প্রমাণ তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছে ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির ভণিতা দেওয়া পদ থেকে। তাঁর মনে চরিতামৃতকার কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য ও নাটক থেকে মহাপ্রভু-রামানন্দ সাক্ষাৎ-কার হুবহু অনুবাদ করেছেন, অথচ কর্ণপুরের কাছে ঋণের কথা চেপে গেছেন। যেন রামানন্দ রায় থেকে স্বরূপ-দামোদর, রঘুনাথদাস এবং তাঁদের থেকে কবিরাজ গোস্বামীর জানা সম্ভবই ছিল না। কবিকর্ণপুর যে শিবানন্দ-পুত্র, আর সব তথ্যের ভান্ডার তো শিবানন্দের হাতেই ছিল!! আরও দেখা যায়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে একখানি পুরাপুরি অনৈতিহাসিক গ্রন্থ এবং গোবিন্দদাসের কড়চাকে কাল্পনিক সৃষ্টি জ্ঞান ক'রেও লেখক স্বমতের পরিপুষ্টির জন্য এঁদের থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করতে একটুও দ্বিধা করছেন না। আবার উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা এবং মুরারির কড়চার সর্বাংশই তিনি সত্য মনে করেন। মুরারি যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর সংস্কৃত চরিতামৃত লেখেন তা তিনি যখন ধরে নিচ্ছেন তখন আর কথা কী? কিন্তু 'উপাদানে'র লেখক চরিত-গ্রন্থগুলির তথ্যস্থাপনে ও বর্ণনায় যথার্থ কতকগুলি বৈষম্য দেখিয়েছেন, হয়ত বা এইগুলির উপর ভিত্তি ক'রেই নবদ্বীপ ঐতিহ্যের সঙ্গে নীলাচল-

বৃন্দাবন ঐতিহ্যের তিনি বিরোধ অনুমান করেছেন এবং সম্ভবতঃ মহতের মতই দুর্বল-পক্ষ অবলম্বণ করতে চেয়েছেন। তাঁর নির্দিষ্ট কয়েকটি বৈষম্য নিয়ে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি, কল্পিত তত্ত্ববিরোধ মীমাংসার প্রয়োজনে আরও দু-একটি মন্তব্যসহ উল্লেখ করতে হচ্ছে। তিনি বিরোধ-বৈষম্যকে অতিশয়িত ক'রে দেখেছেন কিনা এবং অন্যবিধ অনুমান সম্ভব কিনা তা পাঠকেরাই বিচার করবেন।

১) কর্ণপুর স্বরূপ-দামোদরের কড়চার নাম করেন নি, যদিও তাঁর নাটকে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ্য লীলা-পরিকর হিসেবে স্বরূপ-দামোদরের উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, এই অনুল্লেখের ফলে স্বরূপগোস্বামীর রচনা কিছু ছিল না এমন প্রমাণ হয় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ পুনঃ পুনঃ লিখেছেন যে রঘুনাথদাসের কণ্ঠ থেকে তিনি ঐ কড়চায় লিখিত বিষয়সমূহ জেনেছিলেন এবং তদনুযায়ী অন্ত্যলীলা লিখেছেন। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ লীলা সম্পর্কে শ্রীরূপের রচনা নবদ্বীপ লীলা-পরিকরদের, যাঁরা বর্ষে বর্ষে আসতেন এবং দু-চার মাস থেকে চলে যেতেন, তাঁদের তেমন জানার কথা নয়, তাই কর্ণপুরও জানেননি। তত্ত্বদৃষ্টির বৈষম্যের জন্য তিনি স্বরূপের মতের উল্লেখ করেননি, এ অলীক কল্পনা মাত্র। অথচ, লেখকের মতে, স্বরূপ-দামোদরের পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ক অভিমত কর্নপুর তাঁর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গ্রহণ করেছেন। আবার কর্ণপুর যাঁর শিষ্য, সেই শ্রীনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'চৈতন্যমতমঞ্জুষা'র মঙ্গলাচরণে 'আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" প্রভৃতি ব্রজমন্ডলের মত তো পূর্বেই গ্রহণ করেছেন দেখছি। অবশ্য আমরা সন্দেহ করি, এই শ্লোকটি চক্রবর্তিপাদের নিজের নয়। যাই হোক, সত্য হ'লে কর্ণপুরের ব্রজ-বিমুখতা এবং লেখক-উক্ত গৌরপারম্যবাদ টেঁকে কী করে?

২) কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত চরিতামৃত থেকে কোনো শ্লোক উদ্ধার করেননি, 'চন্দ্রোদয়' থেকে করলেও প্রমাণ বিষয়ে যেমন বৃন্দাবনদাস, মুরারি গুপ্ত এবং স্বরূপ দামোদরের নাম উল্লেখ করেছেন তেমন কবিকর্ণপুরের নাম করেননি – ইত্যাদি।

এ বিষয়ে বক্তব্য, সংস্কৃত চরিতামৃত থেকে তিনি একটি শ্লোক নিয়েছেন, তাঁর মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে; বৃন্দাবনে গিয়ে মহাপ্রভু গোবর্ধন আরোহণ করতে না চাওয়ায় স্বয়ং কৃষ্ণ নেমে এসে তাঁকে দর্শন দিলেন, এই ঘটনার সমর্থনে। কেবল রূপ-সনাতনের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন ঘটনার বর্ণনাতেই নয়, অন্য বহু বিষয়েও তিনি আত্মপক্ষ-সমর্থনে

কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক থেকে শ্লোক গ্রহণ করেছেন। যেমন, গঙ্গায় যমুনাভ্রমবশতঃ মহাপ্রভুর যমুনাস্তব (মধ্যলীলা, ৩য়); সার্বভৌমের সঙ্গে ব্রহ্মবিষয়ে বিতর্কে সবিশেষ-ব্রহ্মস্থাপনে শ্লোক (মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ); নীলাচল-আগত স্বরূপ-দামোদরের চৈতন্যস্তব (মধ্যলীলা, ১০ম); সার্বভৌম-প্রস্তাবিত প্রতাপ রুদ্রকে দর্শনদান বিষয়ে মহাপ্রভু কর্তৃক অনৌচিত্য নির্দেশে দুটি শ্লোক (মধ্যলীলা, ১১শ); রঘুনাথদাসের নীলাচলে মহাপ্রভু মিলনে ((অন্ত্যলীলা, ৬ষ্ঠ)। এছাড়া অধুনা-লুপ্ত কর্ণপুরের আর্যাশতক-উদ্ধৃত তাঁর সাত বৎসর বয়সে রচিত এবং মহাপ্রভুর সামনে উচ্চারিত শ্লোক (অন্ত্যলীলা, ১৬শ)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কবিরাজ গোস্বামী তাঁর পূর্বসূরী কবিকর্ণপুরের রচনার উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। তিনি আদিলীলার ও মধ্যের কিয়দংশের বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস ও মুরারির উপর প্রধানভাবে নির্ভর করেছিলেন, যেমন অন্ত্যলীলার জন্য স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের উপর, কারণ এঁরা অন্ত্যলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। এছাড়া তিনি আরও নানান সূত্র থেকে প্রমাণ বা সমর্থন সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলি গৌণ ব্যাপার ব'লেই উল্লেখ করেননি। কিন্তু 'উপাদানে'র লেখক যে প্রমাণপঞ্জীতে কর্ণপুরের নাম দাবি করেছেন, সেরকম প্রমাণপঞ্জী তিনি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ আধুনিক রীতি; এটি ভালোও বলা চলে, মন্দও বলা চলে। আর সকলের নাম করা এবং কাউকে না চটানো এটিও আধুনিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য। সেকালের লেখকেরা এসব কথা ভেবে দেখেননি।

৩) কবিরাজ-গোস্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত চৈতন্যচন্দ্রামৃতের নামও করেননি। লেখকের অনুমান এই যে প্রবোধানন্দ গৌর-পারম্যবাদের ভক্ত ছিলেন ব'লে বৃন্দাবনের দল কেউ তাঁর সপক্ষতা করতে চাননি।

এ বিষয়ে বক্তব্য, প্রবোধানন্দের চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতেন না, তাই কেউ নাম করেননি বা উদ্ধৃতি তোলেননি। শুধু কবিরাজ গোস্বামীর উপর দোষারোপ করলে চলবে কেন? গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় প্রবোধানন্দের গ্রন্থের উল্লেখ আছে, অতএব চন্দ্রামৃত ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত হলেও এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ না করা গেলেও চৈতন্যচন্দ্রামৃত স্তবের প্রচার ছিল না এমন মনে করা যায় স্বচ্ছন্দে। আমাদের আরও মনে হয়, অনুরাগবল্লী-রচয়িতা মনোহরদাসই প্রবোধানন্দের গ্রন্থের প্রচার করেন। তাঁর দাক্ষিণাত্যে যাতায়াত ছিল এবং সে অঞ্চলে তাঁর বহু শিষ্যও ছিল। প্রবোধানন্দের উপর সাম্প্রদায়িক মত আরোপ করার আগে তাঁর শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র অন্যতম গোস্বামী গোপাল ভট্টের কথা চিন্তা করতে হবে। তা ছাড়া দেখতে হবে প্রবোধানন্দ কেবল গৌরেরই অর্চনা করেননি, বৃন্দাবনের কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের অভেদ এবং শ্রীচৈতন্যের মধ্যে

রাধাকৃষ্ণ-সম্মিলিত বিগ্রহও বারংবার লক্ষ্য করেছেন।

সুতরাং শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বাঙলা দেশে প্রবর্তিত প্রাথমিক ধারণার সঙ্গে নীলাচল-বৃন্দাবনের সূক্ষ্মতর ও প্রবৃদ্ধতর ধারণার যদি কিছু পার্থক্য থাকে তা পরিমাপগত মাত্র, গুণগত নয়। এই নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব-বিরোধ থাকলে জীবনীকার, প্রচারক বা ব্যাখ্যাতারা নিশ্চয়ই তা কোনো না কোনো রীতিতে নির্দেশ করতেন। নীলাচল-বৃন্দাবনের রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণতত্ত্ব নির্দ্বন্দ্বে সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল, তবে কিছু সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-শ্রীবাস-মুরারি-শিবানন্দ-কর্ণপুর তা সম্যক অবগত হতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। জানলেও ক্ষতি কিছুই অনুভব করেননি, কারণ, কল্পিত দু'পক্ষের পার্থক্য সামান্যই। আর আমাদের প্রার্থনা, যাঁরা উক্ত বিরোধ সম্পর্কে দৃঢ়মত তাঁরা ইতিহাসানুগত প্রমাণ দিন, বিনা প্রমাণে লোকচিত্তে কোনো সংস্কার গড়ে তোলার প্রয়াস যেন না করেন। আরও দুঃখের কথা, সাম্প্রতিক কোনো কোনো সাহিত্য-ইতিবৃত্তকার এরকম কলহদর্শী মতবাদকে বিনা-অনুসন্ধানে, কেবল অভিনবতার খাতিরে অথবা গড্ডারিকা-রীতিতে মেনে নিয়েছেন, যার ফলে ছাত্র ও জিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকের চিত্তে বৈষ্ণব ধর্ম, যুগ ও লোকমান্য সাধকদের সম্পর্কে সন্দেহের উদ্ভব ঘটেছে। দলগত কলহ বিশেষভাবে আধুনিকের স্বভাব। অপ্রমাণে এই স্বভাবত্যাগী বৈরাগী নিষ্কিঞ্চন মানুষগুলির উপর আরোপ করা হয়েছে।

টীকা ও নির্দেশিকা

১) স্বর্গত ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর Vaisanava Faith and Movement গ্রন্থে চরিতামৃতে প্রদত্ত (মধ্যলীলা ১৯-২৪) রূপ-সনাতন-শিক্ষণের বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ, রূপ-সনাতনাদি গোস্বামীদের রচিত ভক্তিগ্রন্থের সারাংশই এতে দেখা যায়। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য – ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই অবকাশে পাঠকদের অভীষ্ট পূরণের জন্য যদ্যপি বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তবু বারাণসীতে দুমাস অবস্থানকালে মহাপ্রভু সনাতনের কাছে রাগানুগা ভক্তির মুখ্য ব্যাপারটি নিশ্চয়ই উপস্থাপিত করেছিলেন। নিজ উপলব্ধি ছাড়া মহাপ্রভু ইত্যমধ্যে ঐ বিষয়ে কিছু জ্ঞানও সঞ্চয় করেছিলেন।

২) তবু মহাপ্রভুর জীবৎকালে গৌরবিগ্রহের পূজা প্রারব্ধ হয়েছিল একথা মনে করা যায় না। মুরারি গুপ্তের কড়চার যে অংশে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কর্তৃক এবং অম্বিকা কালনার গৌরীদাস পণ্ডিত কর্তৃক গৌরবিগ্রহ স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায় সে অংশ নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত।

৩) তুঃ 'In these Padas, as in the lives of Caitanya which derive their inspiration from the Navadvipa circle, and to which they have a natural

affinity, no abstruse theology obscures the simple and passionate faith; to them Caitanya is not an image of their supreme deity but the deity himself incarnated – not a means, but an end in itself'.

- S. K. De : Vaisnava Faith & Movement

চৈতন্যাবির্ভাবে ও রবীন্দ্রাবির্ভাবে যুগধর্মপ্রসঙ্গ

উনবিংশ-বিংশ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের বিশেষ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবি ও দ্রষ্টার প্রকাশ নিশ্চয়ই আপনাদের মনে সবিস্ময় প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। আপনাদের প্রত্যাশা যেখানে ছিল যৎসামান্য এবং দাবি করার অধিকারও ছিল সীমিত সেখানে বিচিত্র দানের অজস্র বর্ষণ স্বভাবতই আপনাদের স্তম্ভিত করেছে। আপনারা তুলনা ক'রে দেখেছেন একাধারে এত ঐশ্বর্য পূর্বে বা বর্তমানে কোনো দেশে কোনো ভান্ডারীই উন্মুক্ত করেন নি, কোনো দাতাই দেন নি। বিষয়টির ব্যাখ্যার জন্য উৎসুক হয়ে আপনারা সমীক্ষকদের কাছ থেকে উনিশ শতকের রেনেসাঁসের মহিমা শুনেছেন, অথবা শুনেছেন উপনিষদ-কালিদাস-পদাবলীর প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের পল্লী-পরিক্রমা অথবা মহর্ষি পরিবারের সাংস্কৃতিক দান প্রভৃতিও মুহুর্মুহু আপনাদের কর্ণগোচর হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রাবির্ভাবের অনুকূলে এসব তথ্য শোনার পর এবং সম্মতি প্রকাশের পরও আপনাদের মৌল জিজ্ঞাসা বোধ হয় তেমনি অনির্বাণ থেকে গেছে। সে জিজ্ঞাসা হ'ল – এত বৈচিত্র্য এবং বৈপরীত্য সহ একাধারে এই শক্তির প্রকাশ ঘটল কিভাবে? একটা সমগ্র জাতির কল্পনা এবং বাস্তব, অতীত ও বর্তমান নিয়ে এবং ভাবীকালের ভূমিকা বহন ক'রে, আমরা প্রস্তুত নই এমন সময়ে এই শক্তি কী ক'রে প্রমূর্ত হ'ল? বোধ হয়, এ প্রশ্নের নিঃশেষ উত্তর সুকঠিন এবং আজকের প্রয়াসে আমাদেরই ভিন্ন একটি যুগের দৃষ্টান্ত একটা কার্য-কারণসূত্র ধ'রে যদিচ আমরা আভাসিত করছি, তবু সমগ্র রবীন্দ্র-রচনার পাঠকের কাছে একটা বিস্মিত মহিমাবোধের সঙ্গেই এই মহাজীবনপরিচায়কের স্বপ্ন চিন্তা ও কর্মের কালসংগতি চিরদিনই জিজ্ঞাসিত হতে থাকবে।

এদেশের প্রাচীন মনস্বীদের ধারণায় কাল, জীব এবং কর্ম এগুলি অনাদিসিদ্ধ তত্ত্ব। এগুলি পরস্পর-সাপেক্ষও বটে, কারণ, এদের প্রত্যেকটিই মূল সৃষ্টি-স্বরূপের অঙ্গীভূত, অনুগত এবং সহায়ক। এ তিনটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নানান্ অসঙ্গতির উদ্ভব অনিবার্য। এদের কোনও একটি মাত্র অংশকে চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করতে গেলে একদেশদর্শীতা

হয়ে পড়ে। কিন্তু কোনো ঘটনার ইতিহাসানুগত কার্যকরণ-পরম্পরার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ ঠিক সেকালের অনুবর্তীদের সাধ্যায়ত্ত হয় কিনা সন্দেহ। সাহিত্যকৃতির পর্যালোচনে তো বটেই, সমাজ-বিবর্তনের সূত্রে উদ্ভূত ঘটনাবলীর স্বরূপ অনুধাবনেও কিছুটা কালগত ব্যবধান আবশ্যক। যা ঘটে, তা মানুষের মধ্যবর্তীতাতেই ঘটে, আবার সেই সব ঘটনা-প্রভাবিত মানুষই যদি হয় বিচারক তাহলে সে বিচার অস্থায়ী হতে বাধ্য। মোগল শাসনের ইতিবৃত্তকার আবুল-ফজলের অসাধারণ সমাহরণ শক্তি এবং শৃঙ্খলাবোধের প্রশংসা করেও আধুনিক ঐতিহাসিক তা থেকে জনশ্রুতি এবং অতিরেক বর্জন করেই সত্যের সন্ধান করে থাকেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ব্যাখ্যা- বিচারে নিছক বর্তমানের উপর নির্ভরের নিন্দা করেছেন নানাভাবে। এই সত্যের সারবত্তা স্বীকার করেও অবশ্য আজ একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে আমরা আংশিকভাবে কালান্তরে পদক্ষেপ করছি। রবীন্দ্র-যুগের অবসান ঘটে নি, আত্যন্তিকভাবে তা কোনদিন ঘটতেও পারে না, তাঁর সামগ্রিক প্রভাবজাত নবচৈতন্যের জাগরণ হয়ত বা প্রারব্ধ হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে শিক্ষার বিকিরণ এবং মানুষের দায়িত্ববোধ ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রভাবের প্রথম পর্যায় চিহ্নিত হবে। এমন সময়ে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব, রবীন্দ্রকৃতি এবং যুগধর্ম নিয়ে ইতিহাস-সমীক্ষকদের আর একবার নোতুন ক'রে পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। এই সূত্রেই আমরা অগ্রসর হতে সাহসী হচ্ছি, যদিও মনে করছি আমাদের আজকের বক্তব্য ঐ সুবৃহৎ চিন্তাবৃত্তের স্পর্শক মাত্র হবে, তার বেশি কিছু নয়।

আমাদের প্রস্তাব এই যে, বাঙলার পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দ এবং ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দ বহুল পরিমাণে সদৃশ যুগলক্ষণ ধারণ করেছে এবং চৈতন্যাবির্ভাবের ফলে সমাজে ও সাহিত্যে যা ঘটেছে, রবীন্দ্রাবির্ভাবে তার সদৃশ পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বিংশ শতকের অনেকটা আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচিত, কিন্তু উনিশের অর্থাৎ রামমোহনের সংস্কারচিন্তার সময় থেকে মোটামুটি বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের কর্মসমাপ্তি ও তিরোধানের কাল পর্যন্ত সমাজ-মানসটা আমাদের প্রত্যক্ষের বাইরে, অনুমান-নির্ভর। তবে এ-কাল সম্বন্ধে এত উপাদান আমাদের হাতে আছে যে অনুমানে দোষের অবকাশ খুবই কম। ঠিক ঐ সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের নবকাব্যস্ফূর্তি এবং বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক অভ্যুদয়। অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দের প্রারম্ভ থেকেই আমরা একটি প্রবল ভাব বিপ্লবের সম্মুখীন হলাম। কিন্তু উনিশ শতকের কোষ্ঠীবিচারে আমাদের ভুল যে না ঘটেছে এমন নয়। পশ্চিমাদের উপনিবেশের গঠনের ফলে অযাচিতভাবে যা পাওয়া গেল এবং যা পাওয়া গেল না তার তুলনামূলক মূল্যায়ন এতদিন আমরা করি নি। পশ্চিমের সংস্পর্শে আমাদের গত দু'শতাব্দীর জড়তা এবং দৈন্যের কুহেলিকা অপসৃত হ'ল। আমাদের স্বাধীন বুদ্ধির জাগরণ

হল। আধুনিক শিক্ষায় দীপ্ত হয়ে আমরা প্রথানুগত্যকে সবেগে পরিহার করতে চাইলাম, কিন্তু এ উন্মাদনা আমাদের কতটুকু অংশে ঘটল? এবং আমাদের মুক্তিই বা কতটুকু অংশে প্রবেশ করলো? আমাদের মুক্তি কি সম্পূর্ণ হল? আরও পরিস্কার ভাবে বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সংস্কারধারা যে কোনও জাতির পক্ষে গৌরবের হলেও তাঁদের কর্মের প্রভাব দূর-প্রসারী হয়ে সারা বাংলাকে নিমজ্জিত করতে পারে নি। কলকাতা অঞ্চল এবং জিলা-শহরের মুষ্টিমেয় উদ্বোধিত চৈতন্য আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তির এই তরঙ্গস্পন্দন অনুভব করেছিলেন। সাধারণভাবে গ্রাম বাঙলা ছিল শতবর্ষপূর্বেকার ঈর্ষাদ্বেষময় জীবনধর্মরক্ষার তিমিরে এবং শহর বাঙলার, বিশেষ কলকাতা অঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশের স্বরূপ ফুটছিল দাশু রায়ের পাঁচালীতে, ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে, হুতোমের নকশায়, খেউড়-আখড়াই-বুলবুলির লড়াইয়ে আর মুৎসুদ্দি-বেনিয়ান-হাফসাহেব-বাবুতে। বাঙলার লক্ষাধিক গ্রাম রইল আঠারো শতকের নিষ্প্রাণ সমাজের কবলে আর ঔপনিবেশিকদের স্বস্তিমূলক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। অর্থাৎ নতুন পঞ্জিকার নতুনের মত নবযুগের নবটা উৎকটরূপে ফুটে উঠল যদিও, কালবেলা এবং যাত্রানাস্তি, পুণ্যাহ এবং সালতামামি, আধ ছটাক জমির জন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে কাজিয়া, আর সেই বাল্য-বিবাহ, সেই জীবন্ত পতিতে সতীদাহ, জাতি-বর্ণের সূক্ষ্মতম বিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং কৌলীন্যের স্পর্ধা, সেই ছিন্নকন্থা এবং নগ্নবেশ পল্লীবাসীকে সংকুচিত আড়ষ্ট ক'রে কোনো এক চৈত্রের অকাল-সন্ধ্যায় সর্বস্ব সমর্পনের জন্য প্রস্তুত করে তুলছিল। এদিকে শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের এবং ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের পার্থক্য বেড়েই চলতে লাগল। একে ঠিক 'রেনেসাঁস' বা 'জন্মান্তর' বলবেন? এই দুঃসহ বাস্তব পরিস্থিতির একক চিত্রকর এবং করুণ-বিলাপী হলেন এই জীবনের দ্রষ্টা লেখক, মানুষের মহাকবি। বাংলার গ্রামীন মানুষের বিশেষে কৃষকের জীবনের দুরবস্থা তত্ত্বাকারে কিছু সরকারি নথিপত্রে এবং ক্ষীণভাবে কোনো দেশচিন্তকের কণ্ঠে উচ্চারিত হলেও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত ও গভীর অনুশীলনের কাছে তা নিষ্প্রভ। একই ব্যাপার নিয়ে তিনি কাব্যে আনতে চেয়েছেন ভাবের জোয়ার এবং প্রবন্ধে বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন বারংবার। এরই জন্য তিনি মুখ্যভাবে সাহিত্যিক হয়েও সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি এমনকি রাজনীতির সঙ্গেও সংগ্রাম করেছেন, গঠনমূলক চিন্তা যখন স্বাদেশিকদের ত্রিসীমানাতেও নেই তখন আত্মশক্তিবিকাশের এবং স্বাবলম্বণের, পল্লী-সংগঠনের, কৃষি ও কৃষকের সমুন্নতির বিষয়ে চিন্তায় যে রীয়্যালিজম্-এর স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন, যে সব দিকে আজকের দিনে ঠেকে শিখেও আমরা সম্পূর্ণ শিখতে পারছি কিনা সন্দেহ, সেই প্রগতিশীলতার এবং পূর্ণাঙ্গ চিন্তার বিষয় বিবেচনা করে তাঁকেই আধুনিক রেনেসাঁসের প্রবর্তকরূপে

এবং যুগস্রষ্টা মহাপুরুষের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখলে তবেই যথার্থ দেখা হয়। সমকালে, এমন কি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার স্বল্প পূর্বেই বিবেকানন্দের বাণীতে এবং সংগঠনে নবজাতীয়তাবোধ এবং মানুষশ্রেষ্ঠতাবোধ অবশ্যই প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু এমন সমগ্রভাবে নয়। গ্রামসংগঠন, কৃষকজীবনের আর্থিক উন্নতি, উপনিবেশধর্মী শাসকের প্রাত্যহিক নীতি এবং দৃষ্টিকোণের সংকীর্ণতা, তৎকালীন দেশীর রাজনীতিকদের স্বাদেশিকতার দুর্বলতা, দেশব্যাপী দারিদ্র ও কুসংস্কার এই নিতান্ত আদর্শবাদী এই সন্ন্যাসীর দৃষ্টির বাইরে না থাকলেও, কার্যকরভাবে সামগ্রিক বিবেচনা লাভ করে নি। তাঁর প্রকাশ এবং প্রভাব ঋজু এবং তীব্র, বলিষ্ঠ এবং সব মিলিয়ে আশ্চর্য হলেও এতখানি বাস্তব ও পরিপূর্ণ ছিল না। দেশচিন্তায় অর্থাৎ তাঁর মনুষ্যত্বের ধ্যানে স্বামীজী অনেকটা আকাশচারী, রাজনীতি, সমাজসংস্কারক, অর্থনীতির সঙ্গে তিনি তাঁর আদর্শকে জড়িত করতে চান নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনার আকাশ থেকে কুৎসিত, দুঃখ, পাপ এবং যাবতীয় গ্লানি সহ দেশের ধূলায় অশান্তভাবে পদচারণ করেছেন। সমকালীন অধিকাংশ ব্যক্তির মতামতের সঙ্গে তাঁর মত মেলে নি, কারণ, রূঢ় বাস্তবকে তাঁরাই গ্রহণ করতে পরাঙ্খুখ ছিলেন। তাঁর দেশপ্রীতি এবং মানবানুরাগ যে কী পরিমাণ বাস্তব এবং আন্তরিক তা তাঁর অন্য অজস্র লেখা কেউ যদি নাও পড়েন, শুধু রাশিয়ার চিঠি ও পল্লীর উন্নয়ণ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি উলটে দেখেন তাহলেই অনুধাবন করতে পারবেন। দেখবেন, তিনি রুশ বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে যে পরিমাণ মুগ্ধ ও বিস্মিত হচ্ছেন, তার চতুর্গুণ চিন্তা করছেন এবং অশ্রু বিসর্জন করছেন দুর্ভাগা স্বদেশের জন্য। তবু কী আশ্চর্য, দেখুন, কেউ রবীন্দ্রনাথকে কল্পনাসৌধে আরাম-প্রয়াসী নীরো বলেছেন কেউ বা আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং উপনিষদবাদী ব'লে শুধু রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বকেই নয়, তাঁর আবির্ভাবকেও সীমিত করে দেখতে চেয়েছেন। নিঃসন্দেহে এঁরা অসম্যগ্‌দর্শী। রবীন্দ্রনাথ যেমন দূরের মানুষ, তেমনি কাছের মানুষ; তিনি জমিদার অথচ কিষাণ-জীবনের শরিক, যেমন অশ্রুত সঙ্গীতমন্ত্রের স্রষ্টা, তেমনি ক্ষুদ্রতম গ্লানি ও হীনতম চক্রান্তের দ্রষ্টা এবং স্বয়ং ভোক্তাও। উর্ধ্ব থেকে নিম্নে এবং পশ্চাৎ থেকে সম্মুখে অজ্ঞাত প্রয়োজনে অর্থাৎ যুগপ্রয়োজনে পরিভ্রমণশীল। সেখানে তিনি আত্মবশ নন, প্রকৃতির বশ, যুগপ্রয়োজন নির্বাহ করার জন্যই তাঁর জন্ম-মৃত্যু।

প্রায় প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছিলাম , এখন অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। সংক্ষেপে উনিশ-বিশ শতাব্দের সমাজ-পরিচয় চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছি, এখন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময়কার জীবন-পরিচয়ে দেখা যাক ধর্মের গ্লানি মানুষকে অভিভূত ক'রে যুগপরিবর্তনের কারণ কিভাবে হয়েছিল। কিন্তু তার পূর্বে একটি সন্ধিগ্ধ বিষয়ে আমাদের

বোঝাবুঝি পরিস্কার করে নেওয়া যাক। বিষয়টি হল ধর্ম এবং জীবন। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ধর্মের গ্লানি এবং জীবনের গ্লানি কি একই বস্তু। প্রশ্ন করতে পারেন শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ নবধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য , রবীন্দ্রনাথ তো ধর্মের জয়পতাকা তুলে ধরার জন্য আসেননি। এই প্রশ্নের জবাবের জন্য আমি শ্রোতৃবর্গকে একবার পঞ্চদশ-ষোড়ক শতকের ও পূর্বেকার জীবনের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ ক'রে সেকালে ধর্ম এবং জীবন পৃথক ছিল কি না তা ভেবে দেখতে বলি। আজকের দৃষ্টিতে প্রথাসিদ্ধ এবং শাস্ত্রানুগ ধর্মাচরণ মানুষের জীবন থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এবং ধর্মের নামে যা চলছে তা থেকে অধর্মাচরণের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর কারণ যে পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শ ঠিক তাও নয়। কারণ, পঞ্চদশ শতকের জীবনেই তা দেখা গিয়েছিল এবং আরব্ধ হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এর কারণ, বৈষয়িকতা, ভোগবাদ, মুষ্টিমেয় ব্যক্তিস্বার্থের উদ্ভব। কিন্তু একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শতকে, তন্ত্রের ও সহজমতের প্রভাব ও মঙ্গল-ধর্মের উদ্ভব ও বিস্তারের কালে জীবনাচরণের সঙ্গে ধর্মাচরণের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। আহারে-বিহারে, নিত্যকর্মে ভীতিমিশ্র দেবনির্ভরতা সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের স্বভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। স্বতন্ত্র হয়ে নিজ ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অবকাশ ছিল স্বল্প। বৌদ্ধতান্ত্রিক হোক, সহজিয়া হোক, শক্তিতন্ত্রের সাধক হোক বা মঙ্গলধর্মের সেবক হোক, এক ধরণের ধর্মবিশ্বাস সমস্তের জীবনকে জড়িত মিশ্রিত ক'রে এমনভাবে বিদ্যমান ছিল যে সে জীবন সম্পর্কে পৃথকভাবে চিন্তার অবকাশ প্রায় ছিল না বললেই চলে। ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিনির্ভর কোনও শ্রেণীস্বার্থ প্রবলভাবে গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। হোক অন্ধতা, তবু এই বিশ্বাস ধরে রেখেছিল। বলা যেতে পারে তখন ধর্মাচরণই জীবনাচরণ এবং জীবনাচরণই ধর্মাচরণ হয়ে পড়েছিল। এই স্থিতাবস্থা ভাঙতে আরম্ভ করেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে।

চৈতন্যভাগবতাকার বৃন্দাবনদাস বর্ণনা দিচ্ছেন –

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে।।

* * * *

বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান।।

* * * *

তারে বোলে সুকৃতি যে দোলা-ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগে পাছে লড়ে।।

* * * *

কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।
ভক্তি হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে।।

* * * *

নানা রূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।।
দেহ-গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফূরে।।

* * * *

বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার।।

- ইত্যাদি।

এই ধর্মের গ্লানি বা অন্য ভাষায় চারিত্রিক অবনতি, কেবল নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই নয়, বাঙলার বৃহৎ জনপদগুলিতে এবং অন্যান্য শহরেও ব্যপ্ত হয়েছিল। কৌলিন্যপ্রথার প্রসার, তুর্কী-পাঠান অস্থৈর্য, রাজদরবারে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কর্মচারি ও ভূম্যধিকারীর আধিক্য, নতুন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উদ্ভব এই বিপর্যয়ের কারণ ব'লে অনুমিত হতে পারে। বাঙলার সমাজ-ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি, হলে দেখা যেত, এই সব অঞ্চলে মুষ্টিমেয় লোকের এমন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল যা অর্থে এবং প্রতিপত্তিতে, জ্ঞানার্জনে এবং প্রতাপে বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর জীবনধারা থেকে পৃথক। অদ্বৈতের সিদ্ধতা, নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, নব্যস্মৃতির উদ্ভব এবং তন্ত্রের সংস্কার ও গবেষণামূলক জ্ঞানের প্রসারে একালের সমাজরঙ্গমঞ্চ একদিক দিয়ে যদিও গৌরবোজ্জ্বল দেখা গেল কিন্তু পটপরিবর্তনেই যে ছবি প্রকাশ পেলে তা আশ্রয়হীন, ভয়ার্ত এবং অবজ্ঞাত-হওয়ার ফলে দিশাহারা অগণিত মানুষের। ভাগীরথী তীরবর্তী জনপদগুলিতে শাস্ত্রঘাটা তর্কের অহমিকা এবং বিত্ত ও বর্ণের কৌলীন্যবোধ এমন উগ্র হয়ে উঠেছিল যে তা সহজ মানবিকতাকে আহত উৎপীড়িত এবং প্রায় বিধ্বস্ত করে তুলেছিল। শ্রীচৈতন্যও প্রথম তারুণ্যে শব্দার্থজ্ঞানের উন্নাসিকতা থেকে মুক্তি ছিলেন না। অস্পৃশ্যতা এবং হিন্দু-মুসলমান বিভেদবোধও যে উচ্চবর্ণে পরিস্ফীত হয়ে উঠেছিল তার প্রচুর প্রমাণ সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। বিত্ত-কৌলিন্যের জন্য সমাজে যে চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে তা বৃন্দাবনদাসের বহু বর্ণনায় স্পষ্ট। ভূম্যধিকারের জন্যই হোক, আর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে হোক, যাঁরা দোলা-ঘোড়া চড়তেন, বিবাহ-অন্নপ্রাশনে লোক ব্যবহারে ঐশ্বর্য দেখাতেন বা পুতুল প্রস্তুত করে নানাভাবে আত্মঘোষণা করতেন তাঁরা বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে কেবল পৃথক হয়েই পড়েন নি, সমাজকেও নিম্নে আকর্ষণ করেছিল। আড়ম্বর সহকারে মনসা-শীতলা পূজা, ধর্মকে উপলক্ষা ক'রে তাঁদের প্রবল আত্মঘোষণাই ধার্মিক ও চরিত্রবান সমাজ-জীবনের-

মানুষকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছিল। লোকধর্ম, হোক তা দেবতা-অপদেবতায় অন্ধবিশ্বাস – যা একদিন বর্ণনির্বিশেষে প্রায় সমস্ত মানুষের জীবনের আশ্রয়স্থল ছিল, তা পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠানমাত্র সম্বল হয়ে ব্যক্তি বিশেষের দাক্ষিণ্যের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। অরণ্য বা বৃক্ষতল থেকে উত্তোলিত হয়ে দেবতা যদ্যপি প্রশস্ত নাটমন্দিরের নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করলেন, তাঁকে নির্ভর করতে হ'ল অধিকতর প্রতাপবান ব্যক্তিবিশেষের রোষসন্তোষের উপর। আর পৃষ্ঠপোষিত মঙ্গলকাব্যের কবিগণ এঁদেরই কল্যাণকামনা করতে লাগলেন কাব্যারম্ভে – 'নায়েকের করহ কল্যাণ'। পাঠকবর্গের মধ্যে যারা ধর্মঠাকুরের গাজন-উৎসব প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন যে দ্বারী-প্রতিহারী-বেত্র-হস্ত 'ভক্ত্যা' আম্লায়িক ধর্মধিকরণিক, অশ্ব-ছত্র-চতুর্দোলা, কণ্ঠরোল এবং ঢক্কানিনাদ নিয়ে ধর্মপূজায় সামন্ত ভুঁইয়াদের আত্মপ্রতিষ্ঠা, যুদ্ধযাত্রা এবং যুদ্ধজয় এই সেদিনও বিঘোষিত হয়েছে। অথচ একদা এই ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল বল্লুকা-তীরে, আর ইনি রাঢ়ের নিম্নবর্ণের মানুষের দুঃখ ও আনন্দের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। ধর্ম বা ধর্মঠাকুর যেমন ধর্মরাজে পরিণত হয়েছেন, তেমনি চন্ডী রূপান্তরিত হয়েছেন মহিষাসুরমর্দিনী 'দুর্গা'তে। আর দশম-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জাগ্রত ও জীবন্ত বাশুলী-জিনাসিনী-রংকিনী, ভৈরব-পঞ্চানঁদ-মাদানা, যাঁরা অভিজাত প্রতিষ্ঠা এবং কাব্যপ্রচার লাভ করতে পারলেন না তাঁরা বৃক্ষতল সম্বল ক'রে এবং বাৎসরিক পূজা নিয়ে কথঞ্চিৎ দিন যাপন করতে করতে কালের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, কেউ বা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কোনও দেবতার প্রহরীরূপে পুরোহিত-অঙ্গুলি নিক্ষিপ্ত জলের ছিটা পেয়ে আজও জীবনধারণ করছেন। আসল কথা হ'ল এই যে, এই সব দেবতা এককালে অগণিত জনসাধারণের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তাদের নিজেদের ঠাকুর ছিল। উচ্চতর বর্ণের দ্বারাও এঁরা সমান বিশ্বাসে এবং সমাদরে গৃহীত হয়ে সেকালে সমাজজীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছিলেন নিঃসন্দেহে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেবতা ব্যক্তিবিশেষের কুক্ষিগত হয়ে পড়লে পর অগণিত মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল। কবি বৃন্দাবনদাস ধর্মের গ্লানি ব'লে এই ব্যাপারটিই সংকেতিত করতে চেয়েছেন। আর, এই ঘটনার মধ্যে মানুষ জীবনের যে বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল তা যুগান্তরে প্রবাহিত হয়ে আধুনিক মহাকবির কণ্ঠে ভাষা পেলো – 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'প্রথম পূজা' কবিতায়। ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির এবং দেবদর্শন-তৃষিত কিরাতের আত্মদানের ব্যাপারটি বোধ হয় আপনাদের মনে আছে।

শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক ভাবস্ফূর্তি থেকে প্রেরণালব্ধ নবলোকধর্ম ঐশ্বর্যমূলক মঙ্গলধর্মের বিনাশসাধন করেছিল এ বহিরঙ্গ কথা মাত্র। ধর্মহারা, প্রাণহীন, গানহীন, অবজ্ঞার তাপে বিশুষ্ক মানুষকে মানুষের অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করেছিল। প্রতাপসম্বল

মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অন্তঃসারশূন্যতা উদ্‌ঘাটিত ক'রে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ স্তিমিত ক'রে অন্তত দু' শতাব্দীর মত সাম্যশান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। সংসারজীবনে চৈতন্য সুদরিদ্র ছিলেন এবং যাঁরা নবদ্বীপে এই ধর্মকে বরণীয় প্রতিষ্ঠা দেন তাঁরাও কেউ বিত্তবান ছিলেন না। মনে করুন, চৈতন্যের অবতারত্ব বিষয়ে যেদিন নবদ্বীপবাসীর সন্দেহ ঘুচল এবং অদ্বৈত সর্বসমক্ষে তাঁর ভগবত্তা প্রতিষ্ঠা করলেন, সেদিন তিনি চৈতন্যকে দিয়ে কোন্ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন –

অদ্বৈত বোলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।।
বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে।।
সে সব পাপিষ্ঠ দেখি মরুক পুড়িয়া।
চন্ডাল নাচুক তোর নামগুণ গায়্যা।।
অদ্বৈত্যের বাক্য শুনি করিলা হুংকার।
প্রভু বোলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার।।
এ সব বাক্যের সাক্ষী সকল সংসার।
মূর্খ নীচ প্রতি কৃপা হইল তাঁহার।।
চন্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগ্রামে।
ভট্ট মিশ্র চক্রবর্তী সভে নিন্দা জানে।।

সমাজে পতিত এবং নিতান্ত অবজ্ঞাত মানুষই যে তাঁর স্নেহ সর্বাধিক পেয়েছিল এ বিষয়ে জীবনীকারেরা একমত। নিরপেক্ষভাবেই একথা বলা যায় যে, এই ঘটনায় 'হীন পতিতের ভগবান্' ধূলিস্পর্শের জন্য নেমে এসেছিলেন। 'তোমাকে স্পর্শি আপনা পবিত্র করিতে' – এ কথা সংকুচিত ভীত অর্ধ-মুসলমান সনাতনের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যের উক্তি। 'চন্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-প্রায়ণঃ 'ন মেহ ভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্‌ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ' – এই তত্ত্বের বাস্তবভূমিতে প্রতিষ্ঠা ঘটলে সেদিন চন্ডালে-দ্বিজে কোলাকুলি হ'ল, হিন্দু-মুসলমান-ঘৃণা-বোধ প্রায় বিলুপ্ত হ'ল। জীবন এবং ধর্ম পুনরায় একার্থক হয়ে পড়ল। তারপর শতাব্দী জুড়ে বাঙলা-আসাম-ওড়িষ্যায় সে কী প্রাণের উল্লাস। কত গান, কত সুর, কত ছন্দোবৈচিত্র্য, উন্নততর সাহিত্য নির্মাণের জন্য ঊষর ভাষাভূমির কী সযত্ন কর্ষণ, কেবল নগরে নয়, পল্লীতে পল্লীতে অবরুদ্ধ প্রাণধর্মের সে কী বিচিত্র মুক্তি! রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছেন –

"এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা

প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্ত বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলংকারশাস্ত্রের পাষাণবন্ধন সকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসন নহে – দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল।.....মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমন উচ্চারিত হইল অমনি দেশের যত পাখি সুপ্ত হইয়া ছিল সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল"।

এতক্ষণে বোধ হয় আমার আয়াস অনেকটা লঘু হয়ে আসছে, কারণ, আপনারা নিশ্চয়ই ধরেছেন যে এই জীবন্মুক্তি তো এই বিংশ শতকে নোতুন ক'রে আপনারাও অনুভব করেছেন, বুঝেছেন। অনুরূপ মানুষশ্রেষ্ঠতাবাদের বাণী, অনুরূপ জীবন ও ধর্মের নিত্যসম্বন্ধ নির্ধারণের প্রেরণা কোন্ সূত্র থেকে পাওয়া গেছে। পার্থক্য এই, সেক্ষেত্রে প্রেরণাদাতা একব্যক্তি, প্রকাশ বহুর মধ্যে। এক্ষেত্রে প্রেরণা এবং প্রকাশ মুখ্যভাবে একাধারেই ঘটেছে। কিন্তু আর একটু অগ্রসর হয়ে এ দুই ঘটনার সাম্যের দিক বিচার করা যাক।

বল্লালী দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের শাসনে শাস্ত্রীয় যান্ত্রিকতা এবং ভাবশূন্যতা পরিব্যাপ্ত হয়ে যে-মানুষ ভাবের, যে- মানুষ মনের, যে -মানুষ সহজ তাকে বিনাশ করতে চেয়েছিল। আঠারো উনিশে প্রকারান্তরে সেই ব্যাপারই ঘটেছে। উনিশ শতকে চেতনার জাগরণে একটা আলোড়ন ঘটেছিল মাত্র, তাও সমাজের উপর-মহলে। জনজীবনে তার ভাবুকতাময় সামগ্রিক প্রকাশ ঘটেনি। নাগরিক কর্মশালায় একদিকে যেমন সমাজ-সংস্কারের আকর্ষণ-বিকর্ষণে যুক্তিতর্কের সংঘাত ও স্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনি ইহসর্বস্ততা, বিত্তসঞ্চয় ও ভোগস্পৃহা বেড়ে উঠেছিল এবং ক্রমে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, বাবু ও বাঙালীতে, অফিসকর্মী কৃষকে জমিদার ও প্রজাতে ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠল। এরই মধ্যে আবার হিন্দু-মুসলমান বিরোধের উদ্ভব হ'ল অভিনব অভিশাপরূপে। উনিশ-বিশ শতকের বিদেশী রাজদন্ডের ক্রমবর্ধমান স্পর্ধা বারো-পনেরো-শতকের শাস্ত্রীয় অবস্থা থেকে বাহ্যত ভিন্ন, কার্যত একই। তখনকার বিদ্বান-ভূম্যধিকারী-বণিকদের জ্ঞান বিত্ত ধর্মাড়ম্বরের দম্ভ ও প্রতাপ একালের বৈদেশিক শাসনের মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে একই কার্যকারিতার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। পলাশীর যুদ্ধে বৃহৎ এবং

স্থায়ী কোনো সংঘর্ষই ঘটেনি এ আপনারা ভালো করেই জানেন। জন-সাধারণের অজ্ঞাতে 'সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে' যা এল তাকে সামাজিক দৈব ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বৈষ্ণবীয় ভাবের প্রসারের ফলে যে ভেদবুদ্ধি এবং বাহ্যধর্মসংঘাত লুপ্ত হয়েছিল, শাক্তধর্মমতের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে তা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, আর, পরে বিদেশীয় নিষ্ক্রিয় অপক্ষপাতে এবং সক্রিয় অভিলাষে তা প্রবলতর হয়েই চলল। গ্রামের সঙ্গে নগরের বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেল। ভাবুকতা এবং সাহিত্যস্বাদ থেকে কোটি কোটি মানুষ বঞ্চিত হয়ে পড়ল। এই জাতীয় দুর্দশার চিত্র প্রতিঘাত দিয়ে রবীন্দ্র-চিত্ত থেকে বহু কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ উৎসারিত করেছে। তাঁর রচানার ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যার প্রবর্তন যদি কোনও মনীষী করতেন তাহলে দেখা যেত তাঁর সৃষ্টিকার্যের অন্তত অর্ধেক সমাজ-কবিচিত্ত-সংঘাত থেকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসারিত। দেখা যেত আঘাত, প্রতিঘাত, ব্যাকুলতা, অশ্রুমোচন এবং পথনির্দেশে তাঁর গদ্য প্রবন্ধগুলি বিচিত্রভাবে আমাদের ভাবময় জাগৃতির সহায়ক হয়েছে। সমাজের অবক্ষয়িত অবস্থা সম্বন্ধে কবি কী পরিমাণ সচেতন সে বিষয়ে উৎসাহী পাঠক তাঁর প্রবন্ধের পাতা খুললেই ভুরি ভুরি দৃষ্টান্তের সম্মুখীন হবেন।

কৌলিন্য-বিষে জর্জর ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ এবং ঊনবিংশের যুদধর্মসাদৃশ্য আর একটি বিষয়েও প্রকট হয়েছে। নোতুন যখন আসে তখন বৈপ্লবিক রীতিতে এলেও ঐতিহাসিকেরা প্রচ্ছন্ন পূর্বসূত্র নির্দেশ করতে পারেন। শ্রীচৈতন্যের সহজ লোকধর্মপ্রীতির ভূমিকা হিসাবে জয়দেব-বিদ্যাপতি-চন্ডীদাসের গীতি এবং সূফীধর্মকে যেমন লক্ষ্য করা যায়, রবীন্দ্রাবির্ভাবের সূত্র হিসাবে তেমনি ঊনিশ শতকের সংস্কারকদের, মহর্ষির জীবন-ও-সৌন্দর্যের অনুকূল ধর্মমতের এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সর্বব্যাপী প্রতিভার উপাদান। বিবেকানন্দও কয়েকটি বিষয়ে তাঁর চিত্ত উদ্বোধিত করেছেন এমনও মনে করা যায়।

দুর্লভ ভাবের প্লাবন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবন্মুক্তি আনতে চেয়েছেন। বস্তুত প্রবল ভাবের আন্দোলন ছাড়া যুক্তিতর্কে তা সাধ্যও নয়। মধুসূদন প্রবর্তিত এবং হেমচন্দ্রাদির দ্বারা অনুসৃত অর্থবান্ কাব্যধারা আমাদের প্রত্যাশিত বাসনালোকে নিয়ে যেতে পারে নি। চেতনার যে অংশ গূঢ়, অথচ যার অন্তঃশীল প্রবর্তনার ফলে জীবনযাত্রা অহরহ গতিবেগমুখর হচ্ছে তার উদ্বোধন তথাকথিত রেনেসাঁসের কর্মী জ্ঞানী কবি কেউই সম্ভব করতে পারেন নি। সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই কতকটা জীবনের সমগ্রদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। এই বঙ্কিমচন্দ্রমন্ডিত ঊষার আকাশেই রবির রক্তরাগসঞ্চার সম্ভব হয়েছে। দ্রুত আবর্তনশীল কোনও ঘটনায় জীবনের মূল্যমানের সামূহিক পরিবর্তনকে যদি বিপ্লব আখ্যা দেওয়া যায় তাহলে বাঙলা দেশে এই বিপ্লব ষোড়শ শতাব্দীতে ঘটেছে এবং রবীন্দ্র-ভাবনায় পুনশ্চ তার ভিত্তি সংস্থাপিত হয়েছে। আশা

করা যাক, এখনকার দলীয়স্বার্থনিষ্ঠ কোলাহলের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্র-অভিপ্রেত পরিশুদ্ধ নবজীবন এবং মানুষের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ এদেশেই সম্ভব হবে। স্বপ্ন থেকে বাস্তবের মধ্যে এই বিপ্লবকে সার্থক করে তুলবে, রবীন্দ্রনাথেরই ধারণা অনুসারে, কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয় , 'মহামানব' বা সর্বমানবসত্তা, অর্থাৎ আচন্ডালদ্বিজ জনসাধারণ।

আমরা দেখেছি, চৈতন্য-প্রারব্ধ নবমানবধর্ম অন্ধ শাস্ত্র এবং লোকাচারের তীব্র বিরোধী হলেও এবং জাতীয় মানসে তার প্রভাব এখনও অন্তশ্চর অবস্থায় থাকলেও তার প্রবলতা মাত্র দুশ' বৎসরের কালসীমায় আবদ্ধ হয়ে থেকেছে, অথচ অনুরূপ নবীকরণ সহ উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম প্রায় হাজার বছর ধ'রে রাষ্ট্র, জীবন, সাহিত্য ও শিল্পকে স্বচ্ছন্দে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এর কারণ নির্ণয় করতে ধৈর্যশীল গবেষক ছাত্রদের অনুরোধ জানাই। আপাতত আমাদের মনে হয়, ক্ষমতার লড়াইয়ে প্রবৃত্ত তুর্কী-হাবসী-পাঠান শাসনের উপলক্ষে আমাদের জাতীয় চরিত্র যে-পরিমান বিপর্য্যস্ত হয়েছিল তাতে ব্রাহ্মণ্য প্রতাপের বিরোধী সাম্যভাবনাকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার শক্তি তার ছিল না। এদিকে বৈষ্ণবধর্ম ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে বৌদ্ধধর্ম থেকেও অধিকতর উদাসীন ছিল। তৃণাদপি সুনীচতা এবং তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতার আদর্শ পতিত এবং অবজ্ঞাত মানুষকে ভাবের দিক থেকে উচ্চে তুলে ধরলেও যে -মানুষ বাস্তব জীবন এবং ধর্ম দুইই একত্র চায়, অথবা জীবনের মধ্যেই ধর্মকে নিবিড়ভাবে অনুভব করতে চায় তার সহায়ক ছিল না। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের উগ্রবৈরাগ্যময় জীবনযাপনের প্রতিবাদ দেখা গেল পরবর্তীকালে শত শত ক্ষুদ্র গোস্বামীর জীবনাচরণে। শ্রীচৈতন্য বিষয়টি পূর্বাহ্নে অনুধাবন করেছিলেন বলেই কি নিত্যানন্দকে গৃহীর আদর্শ বজায় রেখে ধর্ম প্রচারে উপদেশ দিয়েছিলেন? বস্তুত তত্ত্ববাদীদের কল্পিত অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলা এবং বাস্তবস্পর্শহীন ফেনায়িত অনুরাগ-মদিরা এই শ্রীভ্রষ্ট, শাস্ত্রপদানত, বিদ্বেষ ও ঘৃণার সূত্রে জাতিবর্ণে বিভক্ত, বিকৃতবুদ্ধি জনতাকে পূর্ণভাবে সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। একথা ঠিক নয় যে বৈষ্ণবীয় দীনতার প্রচারে আমরা পৌরুষ হারিয়ে ফেলেছি, কারণ পাতিত্য পূর্বেই ঘটেছে, ঘটেছে সেন আমল থেকেই, আর ভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয়তার মধ্যে পৌরুষের স্থানও যথেষ্ট। শ্রীচৈতন্য বজ্রে মত কঠোরও ছিলেন। একথাও ঠিক নয় যে , বৈষ্ণবধর্মে সংগোপনে গোস্বামী আভিজাত্য পরিপুষ্ট করার চক্রান্তই নিহিত ছিল, কারণ, আভিজাত্যের বিরোধীতাতেই এই ধর্মের উদ্ভব। সে যাই হোক, জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিপ্লব, আজ আমরা যার বহুমান করছি, তা তখন সম্ভবপর হয়নি। এখন আমরা চাইছি জীবনকে পরিপূর্ণ ক'রে লাভ করতে, আঠারো শতক থেকে এখন পর্যন্ত ধর্মের সঙ্গে জীবনের যে বিচ্ছেদ ঘটেছে তা সমূলে দূর ক'রে উন্নত চারিত্র্য এবং জীবনাচর্যা নিয়ে আমরা আদর্শ সমাজবদ্ধতার

মধ্যে বাঁচতে চাই। বলা বাহুল্য, সেই প্রেরণা এবং সামগ্রিক সেই উপাদান আধুনিক মহাজীবনের কবিই রেখে গেছেন। আমরা আমাদের পূর্বসংস্কার-দুষ্ট ব্যাখ্যায় এবং বিতর্কে সেই অযাচিত সহজ দানকে যেন প্রাপ্তমাল্য অন্ধের মত অহিভ্রমে দূরে নিক্ষেপ না করি।

পরিশেষে কয়েকটি প্রসঙ্গ মাত্র উত্থাপন ক'রে এই বিপ্লবনিষ্ঠ মহাকবি যে সবক্ষেত্রেই নোতুন কথা বলতে চেয়েছেন, গতানুগতিকভাবে পূর্বেকার কোনও অভিমতেরই অনুবর্তন করেন নি তা দেখাতে চাই। সুবিদ্বৎ পাঠকবর্গ যদ্যপি এগুলি পূর্বাহ্নেই জানেন এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দেরও কিছু কিছু অবহিত থাকার কথাই, তবু আজকের এই বিশেষ প্রসঙ্গে এগুলির নতুন অর্থসংকেত তাঁদের চিত্তে জাগতে পারে।

প্রথম, কাব্যগীতাদির বিষয়বস্তু এবং রীতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অব্যবহিত পূর্বসূরীদের চলিত মার্গ পরিহার করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গতি যতটা বৈষ্ণব কবিকুলের সঙ্গে, তেমন মধুসূদন হেমচন্দ্রাদির এমন কি বিহারীলালের সঙ্গেও নয়। দ্বিতীয়, পুরাতনের দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে নূতনকে বরণের নির্দেশ তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যরচনাগুলির প্রধানতম সংকেত। কালজীর্ণ সংস্কার থেকে মুক্তির বিষয় এবং স্থবিরতার উপর তীব্র বিতৃষ্ণা প্রকাশে তিনি অনন্য-সদৃশ। তৃতীয়, যান্ত্রিকতা, শাস্ত্রকলুষিত প্রথা এবং আচারসর্বস্বতা থেকে মানুষকে উদ্ধার ক'রে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখার আগ্রহ তাঁর কাব্যে, প্রবন্ধে নাটকে শতবাক্যে উৎসারিত। চতুর্থ, যে জাতীয়তাবোধ অন্ধভাবে অর্থাৎ বহু ত্রুটি সহ আত্মরক্ষা করতে চায় এবং মানুষকে আঘাত করতে দ্বিধা করে না, তিনি তার বিরোধী, কিন্তু বিশুদ্ধ এবং মানবিকতাপূর্ণ জাতীয়তা তিনি নিতান্ত পক্ষপাতী। এই সূত্রে একদিকে স্বার্থকলুষিত বিদেশী শাসন এবং অন্যদিকে স্বদেশীয় সংকীর্ণত্যার বিপক্ষে তিনি অবিরাম লেখনী চালনা করেছেন। পঞ্চম, প্রচলিত রাজনীতির নরম এবং গরম কোনও পদ্ধতিতেই সম্পূর্ণ মান্য না ক'রে তিনি জাতিকে গ্রামভিত্তিক সংগঠনের সাহায্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। গঠনমূলক আত্মশক্তির অভাবে যে কী দুর্বিপাক ঘটে তা বোধ হয় আজ আমরা বুঝেছি। রাজনীতিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে, একদিকে আপোষহীন সংগ্রাম এবং অন্যদিকে গ্রামসহ, শ্রমিক-কৃষক সহ সংগঠনের তখনকার উদ্‌যোগী শ্রীঅরবিন্দের উপরেই তাঁর আস্থা বোধ হয় সমধিক ছিল। গান্ধীজীর আত্মত্যাগময় ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় জনজাগরণ সাধনের শক্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু তাঁর অনুসৃত সব নীতিই এই তটস্থ দ্রষ্টার অভ্যর্থনা পায় নি। ষষ্ঠতঃ কৃষকদের দুর্দশার কথা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পূর্ববর্তী কেউ কেউ যদিচ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করেন, সমাজ সংগঠনের মূলীভূত ব্যাপারকে সমগ্রভাবে গ্রহণ ক'রে পথনির্দেশ করা রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

এক্ষেত্রে কৃষিসমবায় প্রতিষ্ঠা, যৌথ ভান্ডার স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর নির্দেশ নিতান্ত প্রগতিশীলতার পরিচায়ক। দেখতে হবে, ভারতবর্ষে তখন শিল্পায়ন এবং শ্রমিক জীবন সংকট প্রবল ছিল না। তবু পশ্চিমের বণিকবৃত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ও যান্ত্রিকতার ক্রমশ ব্যাপ্তি লক্ষ্য ক'রে এর ভাবী পরিণাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই প্রথম সাবধান করে দিয়েছেন। সপ্তমতঃ শিক্ষা, যা জাতীয় অগ্রগতির প্রথমতম ব্যাপার সে সম্পর্কে কার্যকরভাবে আমূল পরিবর্তনের প্রসঙ্গ এবং মাতৃভাষার মধ্যস্থতায় শিক্ষা-দানের গুরুত্ব বিষয়ে তিনিই পুনঃপুন বিদ্বৎসমাজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চৈতন্য সম্পাদনের প্রয়াস করেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ ও শিক্ষণ পদ্ধতিকে মেলাবার রীতিতেও তিনি স্বকীয়। লোকশিক্ষার উদ্‌যোগেও তিনি অগ্রগামী। অষ্টমতঃ শাস্ত্রীয় সংকীর্ণতা থেকে সংগীতের মুক্তিসাধন তাঁর অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক কীর্তি। সাধারণের আনন্দের সঙ্গী কাব্যসঙ্গীতকে উচ্চতম রাগসঙ্গীতের সমকক্ষ ক'রে তোলা তাঁর অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচায়ক। নবমতঃ যেমন লোকসাহিত্যের তেমনি প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন, তদ্ভব বাঙলার ভাষাতত্ত্ব সমীক্ষা ও স্বাধীন ব্যাকরণ রচনার পথপ্রদর্শন। দশমতঃ লোককল্যাণে আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ, ভারতবর্ষের ইতিহাসের যথার্থ দিঙনির্ণয়, সাহিত্যরস গ্রহণের নোতুন পথ নির্মাণ প্রভৃতি আরও কিছু ছোট-খাটো বিষয়ের উল্লেখ না করলেও চলে।

এ সমস্ত বিবেচনা ক'রে রবীন্দ্রনাথকে শুধু আত্মমগ্ন কবি ও রূপদক্ষ হিসাবে গ্রহণ না ক'রে যুগমানব এবং জীবনপথ পরিচায়ক হিসাবে বরণ করাই সমীচীন। তিনি অবতার নন, কিন্তু তাঁর প্রকাশকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে অবতারের কার্যের সঙ্গে তাঁর কার্যের পার্থক্যও তেমন দেখা যাবে না। অতএব আর কালবিলম্ব না ঘটিয়ে তাঁর পথনির্দেশকে আরও সক্রিয়ভাবে মান্য করার সদবুদ্ধি আমাদের জাগরিত হোক এই আশা বহন করে আজকের প্রসঙ্গ শেষ করছি।

শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি - পুরাতন নবদ্বীপ বা নদীয়া

বাঙলার ও বাঙালীর সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে চঞ্চল ও পরিবর্তন-প্রবণতার দেশ। এর মানবসমাজের মধ্যে কালে কালে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রজাতি বিমিশ্রিত হয়ে পড়েছে, কী দেহে কী ভাবে। ফলে জীবনচর্যায়, সাহিত্যে ও দর্শনে এই ভূখন্ড নানান মত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত আবর্তিত হয়েছে। যেমন মানসিক উপাদানে, তেমনি এর ভূ-প্রকৃতিতেও পুনঃপুন পরিবর্তন ঘটেছে এবং আজও ঘটছে। নৈসর্গিক পরিবর্তনের মুখ্য কারণ এর নদীগুলির গতিপথের পরিবর্তন, গতি-অবরোধ, নূতনতর স্রোত-পথের আবির্ভাব প্রভৃতি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীনে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রসহ করতোয়া, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, ইচ্ছামতী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাগীরথী, দামোদর, তিস্তার পথ-পরিবর্তন, শাখা-প্রশাখার বিলোপ ও ভিন্নমুখে বিস্তার মানুষের আর্থনীতিক জীবনযাত্রার রুচিতে স্বাস্থ্যে, সুতরাং চিন্তাভাবনায় রূপান্তরের সৃষ্টি করেই চলেছে।

এমনই এক নৈসর্গিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে চালিত হয়েছে ভাগীরথী-তীরবর্তী নবদ্বীপ বা নদীয়া – একদা বাঙলার সংস্কৃতির কেন্দ্র ও গৌরবস্থল এবং শ্রীচৈতন্যের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের লীলাভূমি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম প্রকাশ ও বিস্তারের কেন্দ্র। পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে, দেশ ও জাতির পক্ষে এত বড় একটা ঘটনা পরবর্তী ইতিহাস লেখকদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নি। বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনের মধ্যে অবশ্য তা হওয়ার কথা নয়। ফলে জাতীয় চেতনার বিকাশের পর থেকে জাতীয় মানবিক ইতিহাস নোতুন ক'রে গঠনের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে মুখ্যত সাহিত্যিক উপাদানের উপর, আর গৌণভাবে তথাকথিত ইতিহাসের বিবরণের উপর অনুমান প্রয়োগ ক'রে, ভূতাত্ত্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে এবং কিছু কিছু জনশ্রুতির উপরও। অথচ আজকের স্বল্পশিক্ষিত মানুষেরও শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে খুঁটিনাটি ইতিবৃত্ত জানবার আগ্রহ খুবই প্রবল হয়েছে। মধ্যযুগের নদীয়াই বা কোথায় ছিল আর শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ সেই নবদ্বীপের কোন্ অঞ্চলে হওয়া সম্ভব এটা জানার ঔৎসুক্য কেবল বৈষ্ণব ভক্তদের পক্ষেই নয়,

ছাত্রদের ও সাধারণের পক্ষেও সমান স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের ইতিহাসের এত বড় ব্যাপার সম্পর্কে আমরা সচেতন হলেও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসাবে উদ্‌যোগী হতে পারিনি আজও। এখনকার নবদ্বীপ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের মঠনির্মাতা ও সম্প্রদায়বাদীরা নির্ধারিত ইতিহাস-ভূগোলের অভাবে তাঁদের স্ব স্ব মঠমন্দির প্রতিষ্ঠার ভূমিকেই শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলার বিভিন্ন অঞ্চল ব'লে চিহ্নিত ক'রে চলেছেন, যার ফলে ধর্ম নিয়েও দলীয়তার প্রসার ঘটছে কম নয়।

এরকম অবস্থায় দেশের প্রকৃত ইতিহাস-ভূগোলকে উদ্ধার ক'রে বাস্তব পরিস্থিতি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা শিক্ষিত গবেষকদের ও স্বদেশী রাষ্ট্রের একটি জাতীয় কর্তব্য বলেই মনে করি। সেকালের দুই-নদী-বেষ্টিত এই দ্বীপ অঞ্চলটির উপর নৈসর্গিক পরিবর্তনের লীলাতরঙ্গ যেভাবে বারংবার আঘাত হেনেছে তাতে শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন প্রভৃতি কোন্ কোন্ স্থানে ছিল আজ আর তা সঠিক নির্ধারণ করা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু গঙ্গাতীরবর্তী সেই এলাকাগুলি মোটামুটি চিহ্নিত করা দুরূহ হবে না, যদি ভূতত্ত্ববিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে অভিজ্ঞ সুধীবৃন্দ একযোগে আন্তরিকভাবে প্রয়াস করেন। এ বিষয়ে ভাগীরথীর পুরাতন প্রবাহপথ নির্ধারণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মহাপ্রভুর নিতান্ত প্রিয়, তাঁর বেগবতী ব্যাকুলতার সমানধর্মা স্নেহময়ী ভাগীরথী মহাপ্রভুর অদর্শনের পর থেকে চঞ্চলা হতে হতে "আর নবদ্বীপের প্রয়োজন কী" এই ব'লেই কি পরিশেষে পুরাতন নদীয়া নগরীর সেই সব লীলাক্ষেত্রগুলি ধুয়ে মুছে অপসারিত করে দিলেন, অথবা পরবর্তী বৈষ্ণব সমাজের সাম্প্রদায়িক কলহ ও ক্রম-অবক্ষয় দৃষ্টে ক্ষোভে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিপরীতগতি হলেন? মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত সে নদীয়া আর নেই, যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী! সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক প্রয়াসে নবদ্বীপ অধ্যয়ণ প্রারব্ধ হবে কি না জানি না। আজকের এই সীমায়িত অবকাশে স্বকীয় পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মধ্যযুগের সাহিত্যে এ বিষয়ে কী প্রমাণ মিলে তা দেখা যেতে পারে।

সাহিত্য বলতে মুখ্যত বৈষ্ণব জীবনীকাব্যগুলিই এ বিষয়ে আমাদের অবলম্বন। জীবনীকাব্যগুলিতেই বর্ণনা প্রসঙ্গে নবদ্বীপের পথঘাট, শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত ভক্তদের বাসস্থান, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ এবং ভাগীরথীর প্রবাহপথ প্রভৃতি বিষয়ে বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যজীবনী বিষয়ক পদাবলী ইতিবৃত্ত বিষয়ে নিতান্তই কৃপণ, জীবনীগ্রন্থগুলির লক্ষ্যও ইতিবৃত্ত সঞ্চয়ন নয়, লীলাশ্রবণোৎসুক ভক্তচিত্তের তৃপ্তিসাধন। তবু ইতিহাস-ভূগোলকে জীবনীকারেরা বর্জন করতে পারেন নি, প্রাসঙ্গিকভাবে গ্রন্থমধ্যে স্থান তাঁদের দিতেই হয়েছে। প্রদত্ত প্রমাণের উপর তাঁরা পাঠকদের যথাযথ অনুমানের অবকাশ রেখেছেন; কেউ কেউ একটু বেশী, কেউ বা অপেক্ষাকৃত কম। অবশ্য এমন চরিতকাব্যও মিলে যার মধ্যে ঐতিহাসিক বর্ণনের মায়া আছে

মাত্র, প্রকৃত তথ্য কিছু নেই বললেই চলে। যাই হোক, আমাদের অভিপ্রেত নবদ্বীপ-পরিচয়ের ব্যাপারে চরিত-গ্রন্থগুলিকে এইভাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে –

(১) মুরারিগুপ্তের সংস্কৃত চৈতন্যচরিত গ্রন্থ। এটির প্রমাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই গ্রন্থটি লিখিত ও সমাপ্ত হয়। আর মুরারিগুপ্ত শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠ সহপাঠী এবং একান্ত প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-জীবনীর সঙ্গে নদীয়ার ইতিহাস-ভূগোল নির্ধারিত ক'রে যাবেন এমন অভিপ্রায় মুরারির ছিল না। তিনি নিতান্ত ধার্মিক, বিশেষত ভক্তের মতই গ্রন্থ লিখে গেছেন। তবু প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যের পারিবারিক অবস্থা, প্রথম জীবন ও বিবাহ এবং নবদ্বীপ বিষয়ে ছিটেফোঁটা যেটুকু পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন তারই মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (২) কবি-কর্ণপূরের লেখা সংস্কৃত চৈতন্যচরিত মহাকাব্য এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। নবদ্বীপ প্রসঙ্গে এতে একটি স্মরণীয় সংবাদ পাওয়া যায়, যা চৈতন্যভাগবতেও মিলছে। তা হ'ল নবদ্বীপ নগরীর সন্নিহিত গঙ্গার পশ্চিম পারে কুলিয়া গ্রাম। (৩) চৈতন্য-ভাগবত নামে বাঙলা গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অন্তত কুড়ি বছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়। এটিতেই তুলনামূলকভাবে নবদ্বীপের ইতিহাস ভূগোলের বিশেষ পরিচয় যা কিছু গ্রথিত দেখা যায়। রচনা হিসাবেও এটি খুবই প্রামাণিক। (৪) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল – এর বাস্তব ঐতিহাসিক মূল্য নগন্য। (৫) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল – এই কাব্যটির প্রারম্ভে নবদ্বীপের পীরালিয়া নামক মুসলমান-প্রধান একটি গ্রামকে নবদ্বীপের সন্নিকটবর্তী বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা ঐতিহাসিক নয়, বিশ্বাসযোগ্যও মনে হয় না, যেমন জয়ানন্দ পরিবেশিত অন্য বহু তথ্যও বিশ্বাসযোগ্য নয়। (৬) কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত। চৈতন্য-জীবনী এবং বৈষ্ণব ধর্মের দিক থেকে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও নবদ্বীপ-পরিচিতির দিক দিয়ে চৈতন্যভাগবত থেকে নূতনতর কোনো সংবাদ এতে পাওয়া যায় না। (৭) শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বিরচিত ভক্তিরত্নাকর। এটি শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের আনুমানিক দুশ' বছর পরে লেখা গ্রন্থ। দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈষ্ণব আন্দোলনে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে নোতুন করে বৈষ্ণব সংগঠন প্রারব্ধ হয়। এই সময় নিগূঢ় বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতি ও কীর্তনাদির সূক্ষ্মতা গড়ে উঠতে থাকে। বহু বৈষ্ণব তন্ত্রগ্রন্থও রচিত হয়। এরই উপর নির্ভর ক'রে নিছক ধর্মতন্ত্রের বিস্তারই এই গ্রন্থটির লক্ষ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবমন্ডলী ও কেন্দ্রগুলির সাধারণ পরিচয় এ থেকে পাওয়া গেলেও প্রকৃত ইতিহাসের দিক দিয়ে গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য নয়, সে দৃষ্টি থেকে এটি লেখাও হয়নি। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, দুশ' বছর আগেকার নবদ্বীপ অঞ্চলের একটি বর্ণনা তিনি তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন। যার মধ্যে নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির পুরানো লৌকিক নাম-পরিচয় বর্জন ক'রে তিনি কাল্পনিক নোতুন নামকরণের প্রয়াস নিয়েছেন এবং প্রতিটি অঞ্চলের সঙ্গে একটি ক'রে উদ্ভট অলৌকিক কাহিনী যোগ ক'রে দিয়েছেন। এ বিষয়ে আমরা পরে বলছি।

এখন দেখা যাক, নবদ্বীপ ভাগীরথী ও নবদ্বীপ-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কী পরিচয় মুরারি, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস এবং নরহরি চক্রবর্তী তাঁদের গ্রন্থে গ্রথিত করেছেন।

শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ এবং নবদ্বীপ অঞ্চলের পরিচয় যদি মুরারি দিতেন তাহলে তা-ই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য হ'ত। কিন্তু মুরারী ইতিবৃত্তে অনুরাগী ছিলেন না। দু'-একটি ঘটনার বর্ণনায় তাঁর অজ্ঞাতসারে অবশ্য ভাগীরথীর অবস্থান সূচিত হয়েছে। যেমন, (১) গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ গঙ্গা পার হয়ে সন্নাস গ্রহণ ছিলেন, "ত্যক্ত্বা গৃহং স্বর্গনদীং প্রতীর্য জগ্রাহ সন্ন্যাসম্ অশক্যমন্যৈঃ" (১ম প্রক্রম, ৭ম অঃ)। (২) বাস্তব সন্ন্যাস গ্রহণের কিছু পূর্বেই একদিন শ্রীচৈতন্য মাতার উপর বিরক্ত হয়ে গঙ্গা পার হয়ে উত্তর কূলে গিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে কিছুদূর চলে গিয়েছিলেন। মুরারি ও অন্যান্য সহচরেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন –

ততো ব্যাট্যাং মুরারে স্তে ঝটিত্যাগত্য সেশ্বরাঃ।
উপবিশ্য ক্ষণং স্থিত্বা বিজয়স্যাশ্রমং যযুঃ।।
উষিত্বা রজনীং তত্র প্রভাতে ভগবান্ পরঃ।
জগামোত্তরকং কূলং জাহ্নব্যা অভ্রমৎ দ্রুতম্।। (২ প্রঃ ১২ অঃ)

(২) নবদ্বীপের বিপরীত কূলে কুলিয়া (=কূলদ্বীপ) নামে গ্রাম ছিল। অবশ্য মুরারির চৈতন্যচরিত গ্রন্থের শেষের দিকে যে অংশে এই সংবাদ রয়েছে সেই অংশে কাহিনীটি প্রক্ষিপ্ত ব'লে পন্ডিতেরা মনে করেন। কিন্তু নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে গঙ্গাপারে যে কুলিয়া গ্রাম ছিল সে সংবাদের নিঃসংশয় প্রমাণ দিচ্ছেন বৃন্দাবনদাস ও কবিকর্ণপুর। সুতরাং মুরারিত ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত হলেও নবদ্বীপের পশ্চিমে যে গঙ্গা ছিল (এবং মুরারিত অন্য বর্ণনায় উত্তরেও ছিল) এ সুনিশ্চিত। নবদ্বীপের পশ্চিমে গঙ্গা এবং প্রায় বিপরীত কূলে 'কুলিয়া' এ সংবাদ কবিকর্ণপুরও দিচ্ছেন। তাঁর মহাকাব্যে তিনি কুলিয়ার নাম করেন নি, শুধু বলেছেন গঙ্গাপারে পশ্চিমে কোনো দেশে গিয়ে শ্রীচৈতন্য উপস্থিত হলেন (নীলাচল থেকে গৌড়ভ্রমণের মধ্যে)। চৈতন্যচরিত মহাকাব্য তাঁর একেবারে প্রথম বয়সের লেখা, কিন্তু শেষ বয়সে তিনি যে নাটক লেখেন (চৈতন্যচন্দ্রোদয়, আনুঃ ১৫৬০-৭০) তাতে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে গঙ্গাপারে নবদ্বীপের পশ্চিমের এই গ্রাম হ'ল 'কুলিয়া'। যেমন –

প্রতাপরুদ্রঃ। কথয় মে কিয়দ্দূরং ভগোবন্তো গতাঃ।
পুরুষাঃ। কুলিয়াগ্রামং যাবৎ।।
রাজা। (সার্বভৌমমুখং নিরীক্ষতে)।
সার্বভৌমঃ। দেব, নবদ্বীপপারে পারেগঙ্গং
কশ্চন তন্নামা গ্রামোহস্তি।
পুরুষাঃ। ততোহদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য

হরিদাসেনাভিবন্দিতঃ তথৈব
তরণি-বর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া
নাম গ্রামে মাধবদাসবাট্যাম্ উত্তীর্ণাবান্। (নবম অঙ্ক)

এ হ'ল শ্রীচৈতন্যের নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাবার অভিলাষী হয়ে যাত্রাকালে গৌড়ের পথমধ্যবর্তী ঘটনার বর্ণনা। কবিকর্ণপুর আরও সংবাদ দিচ্ছেন যে, শ্রীচৈতন্যকে দেখার জন্য নবদ্বীপ অঞ্চল থেকে লোকের ভিড় এত বেশি হয়েছিল এ খেয়া-নৌকার ভাড়া এক কাক থেকে এক কাহন পর্যন্ত উঠেছিল, আর জলপথে মাঝে মাঝে যে সব বাঁশের সেতু করা হয়েছিল তা প্রত্যহই ভেঙে যেতে লাগল। শ্রীচৈতন্য সাতদিন কুলিয়ায় থেকে নবদ্বীপের লোকের মনস্কামনা পূর্ণ ক'রে রামকেলি গ্রামে যান।

উক্ত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লেখার বিশপঁচিশ বছর আগেই বাঙলায় লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত বিরচিত হয়। এই গ্রন্থটিও মধ্যলীলা পর্যন্ত অত্যন্ত প্রামাণিক আর নবদ্বীপ অঞ্চলের এবং সেই সঙ্গে ঐ অঞ্চলের সমাজস্থিতির ও শ্রীচৈতন্যের পারিবারিক অবস্থার যা কিছু বিশদ বিবরণ এতেই পাওয়া যায়। যদিও শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ কেমন ছিল, কোন মুখে, গঙ্গা থেকে ঠিক কত দূরে এ সব খুচরো খবর তিনি দেননি। বৃন্দাবনের গ্রন্থের মধ্যখন্ডের শ্রীচৈতন্যের নবধর্ম প্রকাশের বর্ণনার মধ্যে কাজীর বিরুদ্ধতা প্রশমন বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যে-যে অঞ্চল ও পথ দিয়ে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে সংকীর্তনের দল কাজীর বাড়ি গিয়ে পৌঁছেছিল এবং চক্রাকারে নবদ্বীপ পরিক্রমা ক'রে ফিরে এসেছিল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তখনকার নবদ্বীপের পরিচয় হিসাবে এই বিবরণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবরণ অনুসরণে দেখা যায়, নবদ্বীপে গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধ'রে (পশ্চিম থেকে পূর্বে) একটি পথ চলে গিয়েছিল। এই পথটি তীরবর্তী বসতিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। এ ছাড়া গঙ্গার উপর বেশ কয়েকটি স্নানের ঘাটও ছিল। শ্রীচৈতন্য নিজে যে ঘাটে স্নান করতে ও সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত ছিলেন (সম্ভবত তাঁর গৃহের সব থেকে কাছের কোনো ঘাট) সেখান থেকে সংকীর্তনের প্রারম্ভ হয়। তারপর মাধাইয়ের ঘাট এবং বারোকোণা ঘাট প্রভৃতি অতিক্রম ক'রে ঐ পথ ধ'রে তাঁরা 'গঙ্গানগর' অঞ্চলে এসে পৌঁছালেন। গঙ্গার নগরের মধ্য দিয়ে নগরিয়াদের ঘাট অতিক্রম ক'রে এলেন শিমুলিয়া। ঐ শিমুলিয়া গ্রাম এখনও রয়েছে। এর অবস্থিতি বর্তমান নবদ্বীপ শহরের উত্তর-পূর্বে এবং 'মায়াপুর' নামে বর্তমানে কথিত অঞ্চলের ঠিক উত্তরাংশে। শিমুলিয়াতে এসে ঐ পথ ছেড়ে দিয়ে "কাজীর বাড়ির পথ ধরিলা ঠাকুর"। শিমুলিয়া সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে এটি নবদ্বীপ শহরের প্রত্যন্ত পল্লী "নদীয়ার একান্ত নগর শিমুলিয়া"। বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায় যে শিমুলিয়া এবং সেখান থেকে কাজীর বাড়ী (যে অঞ্চলকে কাজীপাড়া বলা হ'ত), সংকীর্তনের প্রারম্ভ স্থান থেকে

বেশ কিছু দূরের রাস্তা। আর এ অঞ্চলে গঙ্গাও নেই, কোনো ঘাটও নেই। আরও লক্ষণীয় এই যে, নবদ্বীপ থেকে শিমুলিয়া আসতে এবং কাজীর প্রত্যয় উৎপাদনের পর গাদিগাছা, পারডাঙ্গা এবং সম্ভবত 'মাজিদা' (মধ্যদহ) প্রভৃতি দিয়ে অর্থাৎ বর্তমান নবদ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল বেষ্টন ক'রে উত্তর-পশ্চিমে ফিরে আসতে গিয়ে সংকীর্তনের দলকে পথে কোনো নদী বা জলপথ অতিক্রম করতে হয়নি। গাদিগাছা অঞ্চল হ'ল এখানকার গঙ্গা এবং জলঙ্গী নদীর মিলনস্থলের নিকটবর্তী তখনকার গ্রাম। আর পারডাঙ্গা হ'ল এখানকার নবদ্বীপ শহরের মধ্য পূর্ব ভাগ। নবদ্বীপ অর্থে জলপথের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ন'টি দ্বীপ নয়। নব উদ্ভূত দ্বীপ, ভাগীরথী এবং জলঙ্গীর প্রবাহ দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপাকৃতি অঞ্চল। পুরাতন মানচিত্রাদি এবং ডাচ ইংরেজ বণিক ও পর্যটকদের বিবরণ থেকে দেখা যায় জলঙ্গী মুহুর্মুহু তার স্রোতপথ পরিবর্তন করেছে। এখন যেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে বহু আগে তার উত্তরে মিলিত ছিল। পরে ঐ পথ ত্যাগ ক'রে কিছুদূর আগে থেকেই দক্ষিণমুখী হয়ে বর্তমান নবদ্বীপের ৪/৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রগড়ের কাছে মিলিত হয়েছিল। আর ষোড়শ শতাব্দীর প্রামাণিক বর্ণনা থেকে দেখছি যে, নবদ্বীপের গঙ্গাপারে পশ্চিমকূল যেমন ছিল, তেমনি উত্তরকূলও ছিল অর্থাৎ গঙ্গা উত্তরে ও পশ্চিমে নবদ্বীপকে বেষ্টন করে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ছিল। এখনকার নবদ্বীপের পূর্ববাহিনী বর্তমানের গঙ্গা বেশ পরেই আবির্ভূতা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে জলঙ্গীর প্রবাহের নাম পাওয়া যায় না। অনুমান, জলঙ্গী তখন বেশ কিছু দূর দিয়ে প্রবাহিত হ'ত। তবু কিছু দূরের ঐ জলঙ্গী এবং উত্তর-পশ্চিম গঙ্গা মিলিয়ে দ্বীপাকৃতিই হয়ে দাঁড়ায়।

নগর-সংকীর্তনের বর্ণনায় মুরারি বিস্তারিত ব্যাপারে যান নি। তিনি বলেছেন –

হরি-সংকীর্তনং কৃত্বা নগরে নগরে প্রভুঃ।
ম্লেচ্ছাদীনুদ্দধারাসৌ জগতামীশ্বরো হরিঃ।।

এ থেকে বোঝা যায় নবদ্বীপের পূর্বপ্রান্তের মুসলমান পল্লীগুলিকেও তিনি স্পর্শ করেছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলেছেন,

"সর্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন-রায়।"

পরে তিনি বলেছেন শূদ্রপ্রধান নগর-অঞ্চলের নাগরিয়াদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এ যাত্রায় শঙ্খবণিক ও তন্তুবায়দের সঙ্গে নৃত্যকীর্তন ক'রে "খোলাবেচা শ্রীধরের" গৃহে কিছুক্ষণ কাটিয়ে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমকালীন পদকর্তা উদ্ধবদাসের ভণিতায় একটি পদ পাওয়া গেছে। ঐ পদটিতেও ঐ নগরসংকীর্তনের স্থানগুলির নাম ও পর্যটনের ক্রম উল্লেখিত আছে। বৃন্দাবন্দাস থেকে বিশেষ এই যে, শ্রীচৈতন্য রাজপন্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহ অর্থাৎ তাঁর শ্বশুরালয় হয়ে তবে নিজালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

আর রয়েছে গঙ্গার ও শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহের অবস্থান সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তথ্য –

বায়ুকোণে কিছু দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে
নিজ গৃহে গেলা গৌরহরি।।

এ পদটি যদি অকৃত্রিম হয় তাহলে তৎকালীন গঙ্গার প্রবাহ এবং নবদ্বীপ মধ্যে শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহের অবস্থিতির অন্বেষণ অনেকটা সহজ হয়ে আসে। অবশ্য মুরারি এবং বৃন্দাবনদাস যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও গঙ্গার দক্ষিণ কূলেই যে শ্রীচৈতন্যের 'নিজঘাট' 'মাধাইয়ের ঘাট' 'বারকোণা ঘাট' এবং 'নগরিয়া ঘাট' ছিল এই তথ্য অনুমিত হয়। সন্ন্যাসের সংকল্প নিয়ে গৃহত্যাগ ক'রে শ্রীচৈতন্য যে-ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে উত্তরকূলে পৌঁছে কাটোয়ার পথ ধরেছিলেন জনশ্রুতিতে তাকে 'নিদয়ার ঘাট' বলে । আমাদের অনুমান এটি তখনকার খেয়াঘাটও ছিল এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতে নবদ্বীপের মধ্যবর্তী অথচ শ্রীচৈতন্য-শ্রীবাসের গৃহ থেকে দূরবর্তী যে-রাজপথের বিবরণ রয়েছে তা ঐ খেয়াঘাট অতিক্রম ক'রে গঙ্গার তীর ধ'রে কাটোয়া পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। এখন নবদ্বীপতথেকে কাটোয়া যেতে গলে গঙ্গা অতিক্রম করতে হয়না, তখন হ'ত। নবদ্বীপের আর একটি খেয়াঘাটের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে, যা পার হয়ে জনতা চৈতন্যকে দেখার জন্য বিদ্যাবাভস্পতির গ্রাম বর্তমান বিদ্যানগরে সমবেত হয়েছিল। হুসেন শাহের শাসনকালে 'অম্বুয়া' অর্থাৎ বর্তমান কালনার সংলগ্ন "অম্বিকা"* গ্রাম এই অঞ্চলের বা মুল্লুকের প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টার ছিল। ঐখানে মুল্লুকপতির নিবাস ছিল। নবদ্বীপের মধ্যবর্তী যে রাজপথের উল্লেখ রয়েছে তা নিশ্চয়ই অম্বুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত এবং বিদ্যানগরের খেয়াঘাট পার হয়ে নবদ্বীপের মধ্য দিয়ে ও কাজীর বাড়ির সন্নিকট হয়ে কাটোয়া যাবার খেয়াঘাট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এ অনুমান অসঙ্গত হবে না। রাজপথ যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবাসের গৃহ থেকে কিছু দূরবর্তী ছিল এ প্রমাণ পাওয়া যায় চৈতন্য-ভাগবত থেকেই। অথচ তা শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ও সুগায়ক মুকুন্দ দত্তের গৃহের নিকটেই ছিল, কারণ–

রাজপথ দিয়া প্রভু আইসে একদিন।

* * *

মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা স্নান করিবারে। (আদি – সপ্তম)

শ্রীবাস কার্যব্যপদেশে একদিন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, অকস্মাৎ কিশোর গৌরাঙ্গকে সে পথে দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন – "কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি?" (আদি – অষ্টম)। আনুমানিক ১৬৬০ খ্রীঃ প্রস্তুত ফ্যান্‌ডেন্‌ ব্রোকের নকশায় দেখছি তখনকার একটি প্রশস্ত রাজপথ ও বাণিজ্যপথ মেদিনীপুর থেকে বর্ধমান ও কাটোয়া হয়ে গঙ্গার ওপার থেকে সোজা কাশিমবাজার পর্যন্ত চলে গেছে। আম্বুয়া-নবদ্বীপের এই রাজপথ কাটোয়ায় গিয়ে উক্ত পথের সঙ্গে সম্মিলিত ছিল

এই অনুমান হয়। নদীর প্রবাহে বা অন্যভাবে বিনষ্ট না হলে যাতায়াতের পথ কখনও বিলুপ্ত হয় না। ঐ পথের পাশেই শহর গঞ্জ গড়ে ওঠে। আমাদের মনে হয় বর্তমান পোড়োমা-তলার (পড়ুয়া = পোড়ো+মা) পাশ দিয়ে যে পথটি দক্ষিণে উত্তরে বহুদূর প্রসারিত ঐটিই তখনকার রাজপথ।

গৌড়ে আগমনকালে শ্রীচৈতন্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতির বিষয়ে কবিকর্ণপুরের সঙ্গে বৃন্দাবনদাসের কোথাও কোথাও মতানৈক্য থাকলেও শ্রীচৈতন্য বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ থেকে এবং প্রবল জনতার চাপ থেকে বিদ্যাবাচস্পতিকে রক্ষা করতে গিয়ে যে মাঝারাতে লুকিয়ে কুলিয়া গ্রামে চলে আসেন এ তথ্যে কোন বিরোধ দেখা যায় না। বস্তুত কুলিয়া বা 'পাড়পুর—কুলিয়া' যে নবদ্বীপের প্রায় সংলগ্ন এবং গঙ্গার অপর পারে পশ্চিম তীরে ছিল এটি একটি অবিসংবাদিত সত্য। ফলত এও বোঝা যায় যে গঙ্গা নবদ্বীপকে উত্তরে ও পশ্চিমে বেষ্টন করে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ছিল। এ বিষয়ে অন্য নিঃসংশয় প্রমাণও মিলেছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চন্ডীমন্ডলকাব্যে ষোড়শ শতাব্দীর গঙ্গার এই অঞ্চলের প্রবাহপথ নির্দিষ্ট হয়েছে। ধনপতির সিংহল যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে মুকুন্দ অজয় ও ভাগীরথীর সংযোগস্থল থেকে চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত গঙ্গার পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রাম নগর ও ঘাটের উল্লেখ করেছেন। উত্তর থেকে দক্ষিণে বর্ণনার ক্রম হচ্ছে এইঃ অজয় ভাগীরথীর সংযোগস্থলে ইন্দ্রানী, ডাইনে ভাওসিংহের ঘাট, বামে মাটিয়ারি, চন্ডীগাছা, বেলনপুর। দিনে ও রাত্রে বাহিয়া "পুরধলী", (পূর্বস্থলী = বর্তমান পূর্বস্থলী) তারপর নবদ্বীপ। সেখানে চৈতন্য বন্দনা ও রন্ধন ভোজন সেরে নিয়ে রাত্রিযাপন করে পরের দিন যাত্রা ক'রে পাড়পুর, সমুদ্রগড়, মির্জাপুর, ডাইনে অম্বুয়া, বামে শান্তিপুর, ডাইনে গুপ্তিপাড়া। পরে উলা, খিসিমা ঘুরে ফুলিয়ার ঘাট ইত্যাদি। এই বর্ণনক্রম মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। অধিকাংশ অঞ্চল এখনও বর্তমান আছে। কয়েকটি নাম পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। আর গঙ্গার প্রবাহ গত চারশ' বছর ধরে এ-পাশ ও-পাশ করেছে ব'লে কয়েকটি গ্রাম বর্তমানে একটু দূরে প'ড়ে গেছে। যেমন মাটিয়ারি গঙ্গা থেকে এখন মাইল তিনেক পূর্বে। বেলনপুরের বর্তমান সংস্কৃতায়িত নাম হ'ল বিল্বগ্রাম – মদনমোহন তর্কালংকারের নিবাস। চন্ডীগাছা গ্রামটি সম্ভবত ভিন্ন নাম ধারণ করেছে। মুড়াগাছার নিকটবর্তী কোনো গ্রাম হতে পারে। পুরধলী আর কিছুই নয়, বর্তমান পূর্বস্থলী, যার পুরস্থলীনাম প্রাচীনতম পুঁথিতে পাওয়া যায়। লক্ষণীয় পূর্বস্থলীর পরই নবদ্বীপ, নবদ্বীপের পরেই পাড়পুরের উল্লেখ। পাড়পুর হ'ল পূর্বোক্ত কুলিয়ার সংলগ্ন গ্রাম। কৃত্রিম শুদ্ধরূপে কদাচিৎ পাহাড়পুর। দু'টি গ্রামকে একসঙ্গে চিহ্নিত করা হয় পাড়পুর-কুলিয়া ব'লে। পূর্বেকার নবদ্বীপ শহরের প্রায় বিপরীত কূলে স্বল্প দক্ষিণের ঐ কুলিয়া অধুনা বিলুপ্ত। সমুদ্রগড় বর্তমান রেল স্টেশনের দক্ষিণের গ্রাম। ঐ সমুদ্রগড়ের সন্নিকটে একদা গঙ্গার সঙ্গে জলঙ্গী এবং দামোদরের পূর্ব প্রবাহ "খড়ী" নদী মিলিত ছিল এবং ঐ মিলনস্থলের নাম ছিল "তেমোহানী"। গঙ্গা তখন ফুলিয়ার পাশ দিয়ে প্রায় উত্তর মুখে বাঁক নিয়ে উলা অর্থাৎ বর্তমান বীরনগর এবং উলার পূর্বদিকের খিস্‌মা গ্রাম হয়ে আবার দক্ষিণ

দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। গঙ্গার সেই পুরাতন খাতের নিদর্শন আজও স্পষ্ট আর পূর্বতন গঙ্গা (মড়িগঙ্গা) যে বর্তমান নবদ্বীপ শহরের মাইল খানেক পশ্চিমে ও মাইল দুই উত্তরে প্রবাহিত ছিল তারও ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ যথেষ্ট। জলঙ্গী নদী যে মুহুর্মুহু পার্শ্বপরিবর্তন করেছে এবং সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে তা নবদ্বীপ থেকে পূর্বে বেশ কিছু দূরে ছিল তারও প্রমাণ এ অঞ্চলে যাতায়াতের ফলে নিত্যই দেখছি। বৃন্দাবনদাস জলঙ্গীর বর্ণনা দেননি। কিন্তু তাঁর চৈতন্যভাগবতের অন্ত্য খন্ডে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস নিয়ে উত্তরে পশ্চিমে রাঢ় অঞ্চলে তিন দিন ভ্রমণের পর যখন শান্তিপুরে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁকে দেখার জন্য নবদ্বীপ থেকে ভক্ত ও পার্ষদেরা নৌকায় জলপথ অতিক্রম ক'রে তবে শান্তিপুরে পৌঁছেছিলেন। নবদ্বীপ গঙ্গার যে দিকে শান্তিপুরও সেই দিকে এবং ফুলিয়া শান্তিপুর থেকে গঙ্গার তীর হয়ে নবদ্বীপ পর্যন্ত পথও ছিল। ফলে অনুমান হয়, যে জলপথ তাঁরা নৌকায় অতিক্রম করেছিলেন, তা এই জলঙ্গী নদীর, যা শান্তিপুরের কিছু উত্তরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হ'ত। জলঙ্গীর এই পুরাতন প্রবাহপথ ১৯১৭ খ্রীঃ প্রস্তুত বঙ্গীয় সার্ভে মানচিত্রে রয়েছে, তা ছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত ফ্যানডেন ব্রোক এবং থর্‌ন্টনের মানচিত্রে পাওয়া যাচ্ছে। খ্রীঃ ১৭৯০-৫৫ মধ্যে লেখা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের সীমা বর্ণনাকল্পে বলা হয়েছে – "রাজ্যের উত্তর সীমা মুর্শিদাবাদ। পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভগীরথীখাদ।" ঐ সীমানা এখনও নদীয়া জেলার সীমানা। বর্তমান প্রবাহিত নবদ্বীপপূর্ব গঙ্গা অন্তত ভারতচন্দ্রের কাব্যরচনার সময় পর্যন্ত ছিল না।

এখন অপর বিখ্যাত গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা দেখা যাক। একমাত্র 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বিশেষ উদ্‌যোগ আয়োজন সহকারে নবদ্বীপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর আঠারো শতাব্দীর রচনা। গ্রন্থটি সার্থকনামা এবং সাধনপথের পথিক বৈষ্ণব ভক্তের কাছে মূল্যবান নিঃসন্দেহে। কিন্তু গ্রন্থটি যে পরিমাণে ভক্ত-ভক্তির উৎকর্ষ-বিধায়ক ঠিক সেই পরিমাণেই ইতিবৃত্ত ও বাস্তবের উপর নিষ্ঠুর অবজ্ঞার পরিচায়ক। যেমন বলা যায়, শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরবর্তী তিন বৈষ্ণব মহাপুরুষ শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের কীর্তিকলাপ বর্ণনা ভক্তিরত্নাকর রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। অথচ তাঁদের আবির্ভাব তিরোভাব বা তাঁদের বৃন্দাবন গমন, দীক্ষা, প্রত্যাবর্তন, বিখ্যাত খেতুড়ীর মহোৎসব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোন সন-তারিখই নরহর চক্রবর্তী দেননি। কেবল তিথিনক্ষত্র জানিয়েছেন। একমাত্র দেখা যায়, সনাতন গোস্বামীকৃত বৈষ্ণব-তোষণী এবং জীব গোস্বামীকৃত লঘুতোষণীর সমাপ্তির তারিখ তিনি দিয়েছেন। এটি দিতে পেরেছেন, কারণ, লঘুতোষণী' টীকায় পূর্বেই তা দেওয়া রয়েছে। আসলে ভঃ রঃ পুরোপুরি বৈষ্ণব-সাধন গ্রন্থ। ষোড়শ শতান্দীতে লেখা বৈষ্ণবতন্ত্রের থেকে আদর্শ গ্রহণ ক'রে লেখা। এর ঐতিহাসিক মূল্য কিছুমাত্র নেই, তবে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর গোবিন্দদাসাদির রচিত

কিছু পদের উদ্ধৃতি এর মধ্যে দেখা যায়, আর দেখা যায় সংস্কৃতে লেখা জীবগোস্বামীর কয়েকটি পত্র। ঐতিহাসিকের কাছে ঐটুকুই এর আকর্ষণীয় বস্তু। শ্রীনিবাসাদির জীবন ও কার্যাবলীর যে বর্ণনা এতে পাওয়া যায়, তাও বহুল পরিমাণে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেই তাঁকে গঠন করতে হয়েছে। যাই হোক, শ্রীল নরহরির নবদ্বীপ-পরিকল্পনা দেখা যাক।

শ্রীনিবাসকে নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিদর্শন করাচ্ছেন শচীদেবীর পরিচারক ঈশান। আনুমানিক কাল ১৫৭৫-৮০ খ্রীঃ। তখন ঈশানের বয়ঃক্রম আশি-নব্বই বৎসরের কম হবে না। ভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে এই বর্ণনা রয়েছে। এর পূর্বে পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনরহরি অনুরূপভাবে বৃন্দাবনের বর্ণনাও দিয়েছেন। বর্ণনার প্রারম্ভে তিনি নবদ্বীপকে ন'টি পৃথক দ্বীপের সমহার মনে করেছেন, যা কেউ কোথাও নির্দেশ করেননি। আবার তিনি এমন ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে, শ্রবণাদি নবধা ভক্তির উদ্দীপন হয় ব'লে নবদ্বীপ নাম! ঐ ন'টি দ্বীপের তিনি নিম্নলিখিত নাম দিয়েছেন – অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, পর্বতাখ্য কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ। আসলে এগুলি হ'ল বাঙ্‌লা নামের কৃত্রিম তৎসমকরণ। মর্যাদা বাড়াবার জন্য কেউ কেউ এরকম হাস্যকর কৃত্রিম শুদ্ধতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। যেমন কোলকাতাকে কালীক্ষেত্র*, বেলেঘাটাকে বিল্বঘৃষ্ট এবং মির্জাপুরকে মৌর্যপুরম ব'লে আভিজাত্যের ছদ্মবেশ পরানো যায়। উক্ত নামকরণের মধ্যে সীমন্তদ্বীপ হ'ল শিমুলিয়ার ছদ্মনাম, গোদ্রুমদ্বীপ, গাদিগাছার, মধ্যদ্বীপ মাজিদার, পার্বতাখ্য-কোলদ্বীপ পাড়পুর-কুলিয়ার, জহ্নুদ্বীপ জাননগর বা জাহাননগরের। এই বাঙ্‌লা নামগুলি ঐ সময়কার সাহিত্যে পাচ্ছি। কিন্তু অন্তর্দ্বীপ = আতোপুর, ঋতু = রাতুপুর, আবার মহতপুর = মাতাপুর, ভরদ্বাজটিকা = ভারুইডাঙা, এগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। পুরাতন নবদ্বীপের বিলীন হওয়ার পর সম্ভবত চর অঞ্চলগুলি এইসব বাঙলা নামে চলিত হয়। আদর্শ ভক্ত নরহরি কেবল ঐ অঞ্চলগুলির সংস্কৃত নামকরণ করেই ক্ষান্ত হন নি। প্রত্যেকটি অঞ্চলের একটি ক'রে কল্পিত অলৌকিক কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন। যেমন সীমান্তদ্বীপ নামের কারণ –পার্বতী শ্রীচৈতন্যের পদধূলি সীমন্তে ধারণ করেছিলেন। গোদ্রুমদ্বীপের কারণ – ঐখানে অশ্বত্থবৃক্ষের নিচে সুরভি গাভী থাকতেন এবং সুরভি গৌরদর্শনে গৌরমহিমা কীর্তন করেছিলেন। তেমনি গৌরাঙ্গ সপ্তর্ষির কাছে মহ্যাহ্নে দর্শন দিয়েছিলেন, তাই মধ্যদ্বীপ, তারপর ব্রহ্মা হরিদাস হয়ে জন্মাবেন এই কথা ব'লে কৃষ্ণ অন্তর্ধান করেছিলেন ব'লে নাম হয়েছিল অন্তর্দ্বীপ। এই রকম সর্বত্র, এবং নিতান্ত বিশ্বাসী ভক্তের কাছে এইসব অলৌকিক কল্পিত কাহিনীর মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাস-ভূগোলের দিক থেকে এসব কাল্পনিক ও বিভ্রান্তিকর। নরহরি চক্রবর্তী ভাগীরথী ও জলঙ্গীর অবস্থান বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত কোথাও দেন নি।

এইরকম অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গির চরমতা পাওয়া যাবে তাঁর "মায়াপুর" নাম কল্পনায়। শ্রীল নরহরির বিবরণমতে নবদ্বীপের মধ্যেবর্তী অন্তর্দ্বীপের অভ্যন্তরে "মায়াপুর" অবস্থিত এবং ঐ 'মায়াপুর"ই হ'ল গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার লীলানিকেতন। বস্তুত এই "মায়াপুর" বাস্তবে কোথাও ছিল না। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কোনও জীবনীকার বা পদকর্তা মহাজন মায়াপুরের উল্লেখ করেন নি। শ্রীল নরহরি কোথায় পেলেন তাও স্পষ্ট নয়, "তথাহি" ব'লে তিনটি-সংস্কৃত অনুষ্টুপ অবশ্য তিনি যোজনা করেছেন, যা তাঁর নিজস্ব রচনা হওয়াই সম্ভব। আসলে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনে ও অন্যান্য অঞ্চলে নিগূঢ় সাধনসংকেতময় বহু বৈষ্ণবশাস্ত্র ও কড়চা লিখিত হয়, যার কয়েকটি থেকে তিনি "তথাহি" ব'লে বহু শ্লোক তুলেছেন। এরকম কয়েকটির নাম হ'ল সাধনদীপিকা, ঊর্ধ্বাম্নায়তন্ত্র, বরাহতন্ত্র। এগুলির কোন কোনটিতে বৃন্দাবনের গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, মদনগোপালের মন্দিরাঞ্চলকে "যোগপীঠ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর কামবীজ মন্ত্রে শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে যোগসাধনার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তীও বৃন্দাবন-পরিক্রমায় বৃন্দাবনকে বারংবার যোগপীঠ আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এবং তিনি ভক্তদের, যেমন বৃন্দাবন-যোগপীঠের তেমনি নবদ্বীপের মায়াপুরের ধ্যান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিখ্যাত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও বৃন্দাবনের মন্দিরকে যোগপীঠ বলা হয়েছে। তিনি এইভাবে উক্ত যোগপীঠের বর্ণনা দিচ্ছেন –

বৃন্দাবনের কল্পদ্রুমে সুবর্ণসদন।
মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্নসিংহাসন।।
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন। (আদি – অষ্টম)

"মায়াপুর" নাম উক্ত যোগপীঠের অনুসরণেই কল্পিত। সম্ভবত বৈষ্ণবশাস্ত্র ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শনের "যোগমায়া" শব্দটি ধরেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দুই অঞ্চলে কল্পিত দুই নাম। বৃন্দাবনে যদি যোগপীঠ ধরা হয় তাহ'লে নবদ্বীপে তা হওয়া উচিত মায়াপীঠ, এরকম ধারণা থেকেই মায়াপুর নামের কল্পনা। শ্রীপাদ নরহরি বলছেন –

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নাম স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।।
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর।।
মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধেয়ায়।
মায়াপুর মহিমা কে বা নাহি গায়।।

অন্যত্র তিনি বলেছেন –

দ্বারকার ঐশ্বর্য দেখ রে নদীয়ায়ে।
রত্ন-সিংহাসনে গৌরচন্দ্র বিলসয়ে।।
ভুবনমোহন প্রভু শ্রীগৌরবিগ্রহ।
বিলসয়ে রত্নসিংহানে লক্ষ্মীসহ।।

অতএব মায়াপুর ভক্তের কল্পনা মাত্র এবং সেই অর্থে সত্য, বাস্তব ইতিহাস ভুগোলের সত্য নয়। ভক্তের দৃষ্টিতে গৌরবিগ্রহ যেমন চিন্ময়, শ্রীধাম নবদ্বীপও তেমনি চিন্ময়। আর সেই চিন্ময়ত্বের প্রতীক শব্দই হ'ল মায়াপুর। এ নিয়ে ভক্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধের অবকাশ নেই। কিন্তু বর্তমান নবদ্বীপ শহরই মায়াপুর অথবা মায়াপুরই যথার্থ নবদ্বীপ এমন কথা বললে ইতিহাস-ভূগোলের বাস্তব সত্যকে নিতান্ত তাচ্ছিল্য করা হয়, সেই জন্যই নবদ্বীপের বাস্তব অবস্থিতি নিয়ে এই আলোচনা করা গেল। মাত্র কিছুদিন পূর্বে বর্তমান নবদ্বীপেরই উত্তরে প্রাচীন গঙ্গা ও সেই দিকেই মহাপ্রভুর বাড়ী ছিল এই সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে, অথচ ঐ কাল্পনিক 'মায়াপুর' নামের দ্বারা চালিত হয়ে বর্তমান নবদ্বীপের উত্তরের ঐ অঞ্চলকে কেউ কেউ "প্রাচীন মায়াপুর" আখ্যায় অভিহিত করেছেন। আসলে কোনো মায়াপুরই যখন ছিল না এবং বর্তমানে চালু-করা নাম মায়াপুর যখন মৌজা-মানচিত্রে ছিল মেঞাপুর-মিঞাপাড়া (কাজীপাড়ার দক্ষিণ), তখন ঐ "প্রাচীন মায়াপুর" আখ্যাও সমানভাবে বিভ্রান্তিকর, সুতরাং পরিত্যাজ্য।

মধ্যযুগের সাহিত্যে নবদ্বীপের অবস্থানের যে পরিচয় ফুটেছে, তাতে দেখা গেল নবদ্বীপ গঙ্গার দক্ষিণে ও পূর্ব তীর সংলগ্ন নগর এবং পার্শ্ববর্তী বহু 'পাড়া' অঞ্চলে সমৃদ্ধ। বর্তমান নবদ্বীপ শহর পুরাতন নবদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। ভাগীরথীর নবদ্বীপ-পূর্ববাহিনী গতি তখন ছিল না। আর জলঙ্গীও বহুদূরে ছিল। এই হিসাবে বর্তমান নবদ্বীপ রেলস্টেশনের ও পূর্বস্থলী গ্রামের প্রায় সমদূরবর্তী স্থানে তখনকার গঙ্গা (বর্তমান মড়িগঙ্গা)। আর তারই দক্ষিণ ও পূর্বতীরে নবদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র ছিল। বর্তমান বাব্‌লারি এলাকায় বড় রেলসেতুর সন্নিকটে শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ হতেও বা পারে। কিছুকাল পূর্বে বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক ৺নলিনীকান্ত ভট্টশালীও একই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

চৈতন্যভাগবত ও অন্যান্য দু'একটি গ্রন্থের বর্ণনা থেকে অনুমানে শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহের একটি বিবরণও প্রস্তুত করা যায়। ছোট রাস্তা বা গলির উপর পূর্বমুখ বাড়ি। একদিকে পূর্বমুখী পূজার ঘর, অন্যদিকে শয়নগৃহ ও সংলগ্ন রন্ধনস্থল। শয়নগৃহ দুই-কুঠরি। পূজার ঘর ও বাসের ঘরের মধ্যে প্রশস্ত উঠান। উঠানে নিমগাছ ও পাশে তুলসী ও ফুলের গাছ। পিছনে পশ্চিম দিকে খিড়কী। গৃহের অবস্থান গঙ্গা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে কিছু দূরে। শ্রীবাস ও শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী গঙ্গার একবারে উপরেই। ইটের পাকাবাড়ি কারোরই ছিল না।

রসশাস্ত্র - বৈষ্ণব ও লোকিক

সাহিত্য-বিচার ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ। এর আরম্ভ খ্রীস্টপূর্ব কাল থেকেই। কী ভারতবর্ষ, কী ইয়োরোপ, তখনকার সমীক্ষকদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তাঁরা ধর্ম অথবা সমাজনীতির সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পকৃতিকে মিশ্রিত ক'রে দেখতে চাইতেন না, সাহিত্যিক আনন্দকে তার শুদ্ধরূপেই দেখতেন, তার মধ্যে ধর্ম তত্ত্ব ও জীবন যে পরিমাণেই স্থান পাক না কেন। ধর্মে আসক্তির কথা যত উন্নত ব্যাপারই হোক, তা নিয়ে যত পুঁথিই লেখা হোক, সাহিত্য ব'লে তা গণ্য হয়নি। সাহিত্য এক বিশেষ ধরণের মানসিক আনন্দের ব্যাপার। কারো মতে শব্দার্থের গুণ ও আলংকারিক সৌন্দর্য সেই আনন্দ সৃষ্ট করে, কারো মতে তা নয়, আমাদের মনের মধ্যে আস্বাদের আনন্দবোধ লুকিয়ে রয়েছে, তার উদ্বোধন বা জাগরণই সাহিত্যের কাজ। দেবতাদের যেসব অলৌকিক লীলাখেলা তা থেকে এধরণের আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। ধর্মের কথা শুনলে বৈরাগ্য আসতে পারে, কৈবল্য নির্বাণ মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ আনন্দ নয়।

বিদ্রোহ ঘটালেন বৈষ্ণব কবিরা। অলৌকিক দৈবী ব্যাপার বিসর্জন না দিয়েও এক আশ্চর্য উপায়ে তাকে সম্পূর্ণ মানবিক করে তুললেন। দেখালেন, দেবতা হ'লে হবে কী, মানুষরূপই তার রূপ, প্রেমস্নেহই তার ভিতরের ব্যাপার, মূলকথা। এর নায়কের দু'খানা হাত, সে সখাদের সঙ্গে গোরু চরায়, অপূর্ব বাঁশি বাজাতে পারে, আর রাধা ও গোপীদের সঙ্গে নাচগান প্রণয়-কলাতেও ওস্তাদ। এর ফলে ধর্মের স্বরূপটাই গেল বদলে। এ ধর্ম যেন ধর্মই নয়, মানবিক হৃদয়ভাবের অজস্রতা, রূপ মাধুর্য শোভা বিলাসের একশেষ। ধর্মের সঙ্গে কাব্য হয়ে পড়ল দৃশ্যতঃ অপৃথক্। শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হয়ে নিজ জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে এ ধর্ম হৃদয়ভাবের, এ ধর্ম রাগাত্মিক প্রেমানুভবের। এর প্রেরণা থেকে যে ছন্দোময় রচনার উদ্‌ভব তা আস্বাদনেরই শ্রেষ্ঠ বস্তু।

পুরানো রীতির কাব্য-বিচারকেরা তবু সাহিত্যিকতার শুদ্ধ ট্র্যাডিশান ধরেই রইলেন। বৈষ্ণবীয় সাহিত্য-বিচারের পথ নির্ধারণ করতে হ'ল অসামান্য প্রতিভাধর কবি রূপ গোস্বামীকে। ব্যাপারটি যেহেতু মূলে লৌকিক নয়, আধ্যাত্মিক, অথচ লৌকিকের যাবতীয় বৈচিত্র্যের সূক্ষ্মতা-যুক্ত, সেইহেতু শ্রীরূপ প্রথমে বৈষ্ণব সাহিত্যের ধর্মীয় ভিত্তি অর্থাৎ অলৌকিকতার বিষয়টি পরিষ্কার করে নিয়ে তদনুযায়ী গঠিত বিশিষ্ট সাহিত্যিকতাকে তুলে ধরলেন। আর সে বিষয়ে যেসব সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য উদ্ঘাটন করে দেখালেন তা পূর্বেকার লৌকিক রসশাস্ত্রীদের ধারণাতেও আসে নি। অবশ্য, শ্রীরূপ পূর্বতন রসবাদ বা রসধ্বনিবাদের মধ্যস্থতাতেই তাঁর বিচার বিশ্লেষণ নিষ্পন্ন করেছেন। রসবাদের মুখ্য উপাদান, যেমন বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী, সাত্ত্বিক ভাব প্রভৃতি শিরোধার্য করেছেন, স্থায়ী ভাবগুলির রসপরিণাম প্রদর্শনে অভিব্যক্তিবাদকে সম্পূর্ণ মান্য করেছেন। বিভাবাদির ঔচিত্য, সাধারণীকরণের নীতিও তিনি সম্পূর্ন রক্ষা করেছেন। অথচ বিভাগ-বৈচিত্র্যে পার্থক্যও সৃষ্টি করেছেন লক্ষণীয়ভাবে। রস-প্রমাতা হিসাবে সাধারণ সামাজিকের স্থানে ভক্তকে স্থাপন করেছেন। যা করেছেন সেসব বিষয়ের এখন ঠিকমত বিন্যাস করতে গেলে তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অথবা উজ্জ্বলনীলমণির মত সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনাই আবশ্যক হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, আমাদের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত স্বল্প অবকাশে তা সম্ভবপর নয়, দিগ্‌দর্শন সমাধা করেই আমাদের ক্ষান্ত থাকতে হবে। গভীরভাবে মনস্তত্ত্ববিৎ ও তীক্ষ্ণধী শ্রীরূপের বিচারশক্তির দৃষ্টান্ত ভক্তিশাস্ত্রকে ছাড়িয়ে সাধারণ রসশাস্ত্রকেও যথেষ্ট সূক্ষ্ম ও ব্যাপক করে তুলেছে। আমরাও শ্রীরূপের অনুসরণে ভক্তিভাব ও রসের সাধারণ পরিচয় উপস্থাপিত ক'রে ভাবশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসের মধ্যে অনুপ্রবেশ করব।

প্রারম্ভে শ্রীরূপ ভক্তি ও ভক্তিরসের অলৌকিকতা সংকীর্ণতা ও বিভিন্ন ক্রম বর্ণনা ক'রে এবং ভক্তির রাগাত্মতার পরিচয় দিয়ে ঐ বিশিষ্ট রসের বিভাবাদির পর্যালোচনা করেছেন। বিভাবের আলম্বন-উদ্দীপন এ দুই প্রাচীন বিভাগ ধ'রে নিয়ে ভক্তিরতির সপক্ষে যা যা বিশেষ নিরূপণ করেছেন তা এইঃ

ক) আলম্বন-বিভাব। পূর্বতন আলংকারিকদের উদার মতানুযায়ী প্রাণী, অপ্রাণ, সুন্দর, কুৎসিত, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পৃথিবীতে এমনকি কাল্পনিক বিশ্বেও এমন কোনো জীব বা পদার্থ নেই যা কবির প্রতিভায় গৃহীত হয়ে কাব্যের বিষয় না হতে পারে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রী তাঁদের বিভাবকে সীমিত করেছেন রাধা, কৃষ্ণ, মহিষী, গোপী, সখী, সখা, কৃষ্ণের পরিজন গুরুজনের মধ্যে। অনুমানে বলা যেতে পারে, গৌরাঙ্গপক্ষেও অনুরূপ বিভাগ সমূহ (অবশ্য দাম্পত্য সম্পর্ক ছাড়া) কল্পনীয়। নায়কের চরিত্রগুণ বর্ণনায় আগেকার আলংকারিকেরা

ধীরোদাত্ত, ধীরললিত ক্রমে দশ পনেরোটি মাত্র উল্লেখ করেছেন। শ্রীরূপ গণনা করেছেন ষাটের উপর এবং তার মধ্যে এমন কয়েকটি যা কৃষ্ণেই পাওয়া যায়, আর কোনো নায়কেই নয়। লৌকিক কোনো নায়ক বা নায়িকার বৈষ্ণব রসপরিমন্ডলে স্থান নেই। বিভাবগুলির বিভাবত্বগুণ আছে মাত্র, ব্যক্তিত্ব সীমিত, স্বতন্ত্র। আর ভক্তি-স্থায়ী-যুক্ত সামাজিকদের শ্রেণীবিন্যাসও প্রয়োজন সাপেক্ষে ভিন্নরীতির, যেমন, সাধক, সিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ ভক্ত। ভক্তের স্থায়ী-ভাব অনুসারে আলম্বনের পার্থক্যও দেখানো হয়েছে।

খ) উদ্দীপনা-বিভাগ। বিষয়টিকে লৌকিক আলংকারিকেরা সংক্ষেপে সেরেছেন – চন্দ্র-চন্দন-কোকিলালাপ-ভ্রমরঝংকারাদি ব'লে। অর্থাৎ মোটামুটি নিসর্গ অথবা এমন কোনো বস্তু বা বিষয় যা ভাবুকতা উদ্দীপ্ত করে। বৈষ্ণব আলংকারিক কৃষ্ণপক্ষে উদ্দীপনের বহু বৈচিত্র্য গণনা করেছেন, যেমন কৃষ্ণের কৌমার, পৌগন্ড, কিশোর বয়স, বিশিষ্ট রূপগুণ, মুরলীবাদন, নটবরভঙ্গিমা, চাঁচরকেশ, পীতধটী, ময়ূরপুচ্ছযুক্ত চূড়া, তিলক, বনমালা, নূপুর, কুন্তল আর এর সঙ্গে ক্ষেত্র অর্থাৎ স্থান, তুলসী, ভক্ত, একাদশ্যাদি বাসর প্রভৃতি হ'ল ভক্তিরস-উদ্দীপন বিভাবের বৈশিষ্ট্য। এসবের মধ্যে রসশাস্ত্রী শ্রীরূপ শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন বংশীধ্বনিকে –

কৃষ্ণবক্তেন্দু-নিষ্ঠ্যুতং মুরলী-নিনদামৃতম্।
উদ্দীপনানাং সর্বেষাং মধ্যে প্রবরমীর্যতে।।

কৃষ্ণ রাধা উভয় পক্ষের কায়িক-বাচিক-মানসিক গুণাবলী, নাম, চরিত্র, মন্ডন এবং রাসলীলাকে ভক্তপক্ষে উদ্দীপন বিভাবের অন্তর্গত করা হয়েছে।

গ) অনুভাব। অর্থাৎ চেষ্টা, যা থেকে আলম্বন বিভাবের অন্তঃকরণে ভাবের উদ্‌ভব অনুমান করা যায়। লৌকিক অলংকারশাস্ত্রের বর্ণনামতে কটাক্ষ, অশ্রু, চক্ষুর রক্তিমা বা সংকোচ, মুষ্টি আস্ফালন, দ্রুতগমন, আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতি – এক এক ভাবের এক এক রীতির বহিঃপ্রকাশ। এসবের উপর ভক্তিভাবের পক্ষে শ্রীরূপনির্দিষ্ট আরও বিশেষ হ'ল – নৃত্য, বিলুন্ঠিত, গীত, হুঙ্কার, জৃম্ভা (হাই তোলা), লোক-উপেক্ষা, লালাস্রাব, উদ্‌ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতি। এই বিশেষ বাহ্য ব্যাপারগুলি একমাত্র ভক্তিরই বিষয় ব'লে এদের নাম দেওয়া হয়েছে – উদ্‌ভাস্কর। এছাড়া আলাপ, বিলাপ, সংবাদ-কথন প্রভৃতিকে বলা হয়েছে বাচিক অনুভাব। শৃঙ্গাররস বিবেচনে অনুভাবগুলির – অঙ্গজ (ভাব, হাব, হেলা), অযত্নজ (শোভা, কান্তি, দীপ্তি, প্রঃ), এবং স্বভাবজ (লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি প্রঃ) যে সব বিভাগ প্রাচীন আলংকারিকেরা করেছিলেন, শ্রীরূপ সেগুলিকে সমাদারের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

ঘ) সাত্ত্বিক। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্পন, বিবর্ণতা, অশ্রু ও মূর্ছা। আসলে এগুলি অনুভাব বা বহিরঙ্গ বিক্রিয়ারই প্রকারবিশেষ, তবু লৌকিক-অতিরিক্ত সত্ত্বে স্থিত চিত্তের বিক্রিয়া ব'লে পৃথকভাবে এগুলিকে দেখা হয়েছে। অলংকারশাস্ত্রে শ্রীরূপের পূর্বেই এগুলি উল্লিখিত হয়েছে। তবু বিশেষ এই যে, শ্রীরূপকৃত স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষরূপে এগুলির নূতন বর্গীকরণ। এবং সেইসঙ্গে প্রবলতার ক্রম অনুযায়ী এই সাত্ত্বিকগুলির ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত এবং উদ্দীপ্ত এই চার প্রকারের গুণ-নির্দেশ। লৌকিক অলংকারশাস্ত্রে বিশ্লেষণের এই সূক্ষ্মতা দেখা যায় না।

স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত হ'লে বলা হবে 'মুখ্য', কিঞ্চিৎ ব্যবধানে হ'লে হবে 'গৌণ'। প্রত্যক্ষ রতিভাব জন্মে রতির অনুগামী কোনো ভাবে চিত্ত আবিষ্ট হলে। তাকে বলা যাবে দিগ্ধ, আর রতিশূন্য জনে সাময়িক ভাব উদয়ের ক্ষেত্রে হবে রুক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ হ'ল ধূমায়িত জ্বলিতাদি বিভাগ। কেবল একটি সাত্ত্বিকের উদয়ে 'ধূমায়িত', দু'তিনটি সাত্ত্বিকের একত্র উদয়ে 'জ্বলিত', চার-পাঁচটির একসঙ্গে আবির্ভাব 'দীপ্ত' এবং আটটি সাত্ত্বিকের একসঙ্গে প্রকাশ ঘটলে 'উদ্দীপ্ত' বলা হয়েছে। এ ছাড়া সাত্ত্বিকের আভাস-ভেদ গণনাও শ্রীরূপের চিন্তায় স্থান পেয়েছে।

ঙ) ব্যভিচারী বা সঞ্চারী। অর্থাৎ মূলভাবের সহায়ক ছোটখাট ভাব-কল্পগুলি, যেমন, হর্ষ, বিষাদ, শঙ্কা, ত্রাস প্রভৃতি। পূর্বেকার অলংকারশাস্ত্রে এরকম তেত্রিশটি সঞ্চারীর উল্লেখ ছিল। রূপ গোস্বামী সংখ্যা বাড়ান কমান নি। ভাবের উৎপত্তি,, ভাবশান্তি, ভাবসন্ধি প্রভৃতিও লৌকিক শাস্ত্র অনুসারেই বর্ণনা করেছেন। সঞ্চারীগুলির ঔচিত্য-অনৌচিত্য নির্ধারণের প্রচলিত অভিমত বিহিত রেখেছেন। কিন্তু উদ্‌ভবের সূত্র ধরে সঞ্চারীগুলির এক একটির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন, যেমন, বিষাদপক্ষে – ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত বিষাদ, প্রারব্ধ কার্যের অসিদ্ধি জনিত বিষাদ, বিপদ জনিত বিষাদ এবং অপরাধ জনিত বিষাদ। দৈন্যপক্ষে – ত্রাসহেতু দৈন্য, অপরাধ হেতু দৈন্য, লজ্জাজনিত দৈন্য। গর্বপক্ষে – সৌভাগ্য নিমিত্ত গর্ব, রূপতারুণ্য হেতু গর্ব, গুণ হেতু গর্ব, কৃষ্ণের আশ্রয়প্রাপ্তি জনিত গর্ব। এই ভাবে সর্বত্র। অধিকন্তু সঞ্চারীগুলির বর, অবর, স্বতন্ত্র, পরতন্ত্র প্রভৃতি শ্রেণীবিন্যাসেও রূপের সূক্ষ্ম অধ্যয়ন লক্ষণীয়। বস্তুত রসবাদী আলংকারিকদের বিন্যাসের উপর সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য আনাতেও রূপ গোস্বামীর কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

চ) স্থায়ী-ভাব ও স্থায়ীর রসপরিণাম। কৃষ্ণসম্বন্ধীয় রতি, বৈষ্ণব আলংকারিকের মতে

লৌকিক বাস্তব রতি নয়। এ ভক্তচিত্তের শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ, এ দিব্য। সাধুসঙ্গ, ভজন, শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি থেকে ক্রেমে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আসে, আসক্তি জন্মে, রুচি হয় এবং এইভাবে অন্তঃকরণ মসৃণিত হলে উদিত হয় ভাব বা রতি। অবশ্য কৃষ্ণকৃপায় কারো কারো ক্ষেত্র একেবারেই ভাব এমনকি প্রেমের অবস্থাও এসে যেতে পারে। সুতরাং ব্যাপারটি আগাগোড়াই আধ্যাত্মিক অলৌকিক এবং কেবল স্থায়ীভাবই নয়, এর আলম্বন বিভাগ, যা মূলে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অন্তর্ভূত, এর উদ্দীপন, অনুভাব এবং সঞ্চারীও দৃশ্যত লৌকিক, মূলে অলৌকিক। পূর্বেকার অলংকার-শাস্ত্রে বলা হয়েছে ভাবাদি লৌকিক, কিন্তু রসপরিণাম অ-লৌকিক। এ অ-লৌকিক ও আবার আধ্যাত্মিক অলৌকিক নয়। লৌকিক বিচারে পাওয়া যায় না ব'লে অ-লৌকিক অর্থাৎ লৌকিক বাস্তব থেকে ভিন্ন কিছু। বৈষ্ণব অলৌকিকই খাঁটি অলৌকিক অর্থাৎ অধ্যাত্মরাজ্যের। লৌকিক সব ব্যাপারের একটা মায়া এতে আছে মাত্র। দেখতে লৌকিকের মত, কার্যতঃ নয়। দৃশ্যত আছে, কার্যত নেই – এমন একটা অবস্থার মধ্য দিয়েই যে ব্যাপারটাকে অনুধাবন করতে হবে তার যৌক্তিকতা নির্ভর করছে ভক্তির হৃদয়-ভাবুকতা এবং স্বাদাত্মক গুণশীলতার উপর। অতএব লৌকিক রসশাস্ত্রের সঙ্গে বৈষ্ণব অধ্যয়নের মৌলিক প্রভেদ মনে রেখেই বৈষ্ণব রসবিবেচনার অনুসরণ করতে হবে।

স্থায়ী ভাব বা রতির বিশ্লেষণে, শ্রীরূপ, লৌকিক অলংকার-শাস্ত্রে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এমন তিনটি ভাব এবং লৌকিক শাস্ত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এমন দু'টি ভাব বেছে নিয়ে মোট পাঁচটিকে মুখ্য স্থায়ী ব'লে এবং অলংকারশাস্ত্রের বাকি সাতটিকে গৌণ স্থায়ী ব'লে বিভাগ ধরলেন এবং সেই সঙ্গে এক একটি মুখ্য স্থায়ীর সঙ্গে সাত সাতটি গৌণ স্থায়ীর যোগ দেখিয়ে স্থায়ীর পঁয়ত্রিশটি বৈচিত্র্য দৃষ্টান্ত সহযোগে উপস্থাপিত করলেন। মুখ্য ভক্তিভাব ধরলেন – শুদ্ধ (অর্থাৎ শান্ত), প্রীতি (অর্থাৎ দাস্য), সখ্য, বাৎসল্য এবং প্রিয়তা (অর্থাৎ মধুরতা বা শৃঙ্গার রতি)। আর গৌণ ভক্তিভাব ধরলেন অলংকারশাস্ত্রোক্ত রতি ও শম বাদে হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, বিস্ময় এবং জুগুপ্সাকে। এই বিচ্যুতি এবং নূতনত্ব গুরুতর। মুখ্য পাঁচটি ভক্তিভাবের রসপরিণামকে বলা হ'ত শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বাৎসল্য ও মধুর। হাস, বিস্ময় ও বীরের কয়েকটি অবান্তর বিভাগ ও শ্রীরূপ দেখালেন পুরাতন অলংকারশাস্ত্রের উপর নির্ভর ক'রে, আবার স্বাধীনভাবেও, যেমন প্রীত অর্থাৎ দাস্যের সম্ভ্রম-প্রীত ও গৌরব-প্রীত। মুখ্য ভক্তি রতিগুলি একেরই উত্তরোত্তর গুণ যোগে পৃথক ব'লে পাঁচটিকে একক ধ'রে তার সঙ্গে সাতটি গৌণ, তেত্রিশটি ব্যভিচারী এবং আটটি সাত্ত্বিক মিলিয়ে ভাবের সংখ্যা ৪৯ গণনা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে হর্ষ,

লজ্জা, গর্ব,, হাস্য প্রভৃতি প্রায় সুখকর হওয়ায় এবং নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, শঙ্কা প্রভৃতি দুঃখকর হওয়ায় রতিগুলির শীত এবং উষ্ণ বিভাগও শ্রীরূপ করেছেন এবং বলেছেন যে উষ্ণরতি অর্থাৎ দুঃখময় ভাব লৌকিকে কাম্য না হলেও কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ে উষ্ণা রতিই পরম আনন্দদায়ক। স্পষ্টতই শ্রীরূপ এখানে দুঃখবিষাদের বা tragedy-র আনন্দদায়কত্বের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। আমরা পরে দেখব শৃঙ্গারের বা মধুরের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ এ দুই বিভাগের মধ্যে বিপ্রলম্ভই বৈষ্ণব সাহিত্যকে প্রায় আদ্যন্ত ঘিরে রয়েছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রেমের অলৌকিক স্বভাবই এই যে এতে মিলন হয় না বললেই চলে, আদি থেকে অন্তে বিরহই এর সর্বস্ব। তা ছাড়া দেখা যায় এতে অদর্শনে যেমন দুঃখ, দর্শনেও তেমনি। কারণ, "অনুদিন বাঢ়ল, অবধি ন গেল"। চিত্তের তৃপ্তি কোনোমতেই ঘটবার নয়। কিন্তু কৃষ্ণসেবানন্দের ক্ষেত্রে দুঃখের অবকাশ কোথায়? তার উত্তরে শ্রীরূপ বলছেন –

কৃষ্ণানন্দগুণাতীতা প্রৌঢ়ানন্দময়া অপি।
ভান্ত্যমী ত্রিগুণোৎপন্না সুখদুঃখময়া ইব।।

অর্থাৎ মূলে অলৌকিক হয়েও কার্যত লৌকিক। এই জন্যই দুঃখের আধিক্য, এই জন্যই লৌকিক ট্র্যাজেডির আভাস-সংযোগ।

কৃষ্ণরতির এই মুখ্য গৌণ বিভাগ নির্দেশ ক'রে রূপগোস্বামী পূর্বতন অলংকারশাস্ত্রের দৃষ্টান্তেই এগুলির প্রত্যেকটির আলম্বণ, উদ্দীপন, অনুভাব, সঞ্চারী প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবেশ করেছেন।

।। উজ্জ্বল বা মধুররস – বৈচিত্র্য ।।

দেবাদি বিষয়ক রতি রসশাস্ত্রের বিষয় হতে পারে না – প্রাচীন শাস্ত্রীদের এই অভিমত খন্ডন করার জন্যই যেন শ্রীরূপ উঠে পড়ে লাগলেন, এই দেখাতে যে ভক্তিরস সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্যে লৌকিক ভাবরসকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে যায়।

(ক) পরকীয়া রতি। প্রথমেই আলম্বণ-বিভাব ও নায়ক-নায়িকা। কৃষ্ণ এবং দ্বারকার মহিষীবৃন্দ ও বৃন্দাবনের রাধা ও গোপীবৃন্দ। অতএব নায়কের যেমন পতিত্ব এবং উপপতিত্ব দুই-ই, নায়িকাদেরও তেমনি পত্নীত্ব এবং পরকীয়াত্ব। নায়িকার পরোঢ়াত্ব পূর্বতন অলংকারশাস্ত্রে নামতঃ উল্লেখিত হয়েছে মাত্র, কার্যতঃ নিষিদ্ধ হয়েছে। উপপতিতে, মুনিগুরুপত্নীগত রতিতে এবং বহুনায়কগত প্রণয়ে রতিভাবের অনৌচিত্য বলা হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণ এবং তাঁর বৃন্দাবনলীলাই যেহেতু ভক্তির মুখ্য তাত্ত্বিক আশ্রয়, সেইহেতু

শ্রীরূপ পরকীয়া রতিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানালেন এবং কৃষ্ণগোপী প্রণয়ে নির্দ্বিধায় পরকীয়ার উৎকর্ষ কীর্তন করলেন। পরকীয়ার লক্ষণ নির্ণয়ে শ্রীরূপ বলছেন – ইহকাল পরকাল সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে কেবল প্রেমের বশেই যারা আত্মসমর্পণ করে, ধর্ম এবং সমাজ যাদের স্বীকৃতি দিতে চায় না, তারাই পরকীয়া। এই ধরণের রাগেই যে প্রেমের উৎকর্ষ ও প্রবলতা তার প্রমাণ দিতে তিনি অলংকারশাস্ত্রগুরু ভরতকে সাক্ষ্য করেছেন –

বহু বার্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ।
যা চ মিথো দুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমা গতিঃ।।

প্রণয়ের গোপনতা, বাইরের প্রবল বাধা এবং মিলনের দুর্লভতা – এরই মধ্যে কন্দর্পের শ্রেষ্ঠ লীলা। এ ছাড়া নিষিদ্ধ প্রণয়ের উৎকর্ষ সম্পর্কে শ্রীরূপ রুদ্র এবং বিষ্ণুগুপ্ত থেকেও সমর্থন সংগ্রহ করেছেন। বৃন্দাবনে একমাত্র পরকীয়া রতিরই উল্লাস শ্রীরূপ এইভাবে নির্ধারণ করলেও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উজ্জ্বল-নীলমণির টীকাকার শ্রীজীব এ বিষয়ে বিরুদ্ধ অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে বৃন্দাবনের গোপীরা আভাসে পরকীয়া মাত্র। অন্তরঙ্গে অর্থাৎ নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে অপ্রকট লীলায় তাঁরা স্বকীয়া। শ্রীজীব বলেছেন, নিত্য ধামেই আসল ব্যাপার, বৃন্দাবনের লীলা মায়িক মাত্র। ভক্তি ও ভক্ত সম্পর্কে এ অতি গুরুতর বিরুদ্ধতা ক'রে ফেলেছেন শ্রীজীব। উজ্জ্বলনীলমণির অন্য টিকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী জীবগোস্বামীর এরকম অভিমত বিস্তৃত-ভাবে খন্ডন ক'রে বলেছেন যে বৃন্দাবন-লীলাকে অবাস্তব মায়িক বললে ভক্তি ধর্মের ভিত্তিটাই ভেঙে পড়ে। রাসলীলা মিথ্যা হয়ে পড়ে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারণা এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও অপ্রতিপন্ন হয়ে পড়েন। বৈকুণ্ঠের নারায়ণাদি থেকে মানবিক কৃষ্ণের ও ব্রজপ্রেমের উৎকর্ষ বোঝাতে গিয়ে শ্রীরূপ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন –

ভুজচতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্মণা দর্শয়ন্নপি।
বৃন্দাবনেশ্বরী-প্রেম্না দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ।।

বস্তুত পরকীয়া রতিসহ বৃন্দাবনলীলার বাস্তবতা কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না। কৃষ্ণ যদি কদাচিৎ খেলাচ্ছলেও গোলোক-বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য-মূর্তি চতুর্ভূজসহ দেখান তাহ'লে ব্রজগোপীরা চক্ষের ইঙ্গিতে 'এই, আবার!' ব'লে ভর্ৎসনা করতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্বিভূজ হয়ে পড়েন। চরিতামৃত ও রূপগোস্বামীর অনুসরণে বৃন্দাবনলীলার বাস্তবতা ও একান্ত কাম্যতা বর্ণনা করেছেন –

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।

পরকীয়া রতিকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেছেন –

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।

(খ) নায়ক-নায়িকা। নায়কের ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত এবং ধীরপ্রশান্ত বিভাগ এবং অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট উপবিভাগ শ্রীরূপ পূর্বতন অলংকারশাস্ত্রের অনুসরণেই গ্রথিত করেছেন। কিন্তু এগুলির উত্তম-মধ্যম-অধম বিভেদ তাঁরই। নায়কসহায় চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দও পূর্বরীতি অনুসারে। এমনকি দৌত্যকার্যে আপ্তদূতীর নিসৃষ্টার্থা, মিতার্থা এবং সন্দেশহারী বিভাগও সেইমত। কিন্তু নায়কপক্ষে স্বয়ংদৌত্যের পরিকল্পনা রূপের স্বকীয়। কৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য হচ্ছে কটাক্ষ ও বংশধ্বনির দ্বারা। নায়ক হিসাবে কৃষ্ণের গুণের যে তালিকা শ্রীরূপ দিয়েছেন (৬৪) – তা লৌকিক শাস্ত্রকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। লৌকিকে বর্ণিত নায়কের সত্ত্বগুণ অর্থাৎ শোভা, বিলাস, মাধুর্য প্রভৃতি আটটি গ্রহণ ক'রেও শ্রীরূপ জোর দিয়েছেন রূপমাধুর্য, বেণুমাধুর্য, লীলার আধিক্য এবং প্রেমপ্রিয়তার আধিক্যের উপর। অন্য কোনো নায়কে পাওয়া যায় না, একমাত্র কৃষ্ণেই পাওয়া যায় এমন চারটি বিশেষ গুণের বর্ণনায় রূপ বলছেন -

সর্বাদ্ভূতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ
অতুল্যমধুরপ্রেমমন্ডিতপ্রিয়মন্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমূরলীকলকূজিতঃ
অসমানোর্ধ্বরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ।।

অর্থাৎ অতি বিস্ময়কর লীলাকল্লোলের বারিধিস্বরূপ, অতুলনীয় মধুর রসাত্মক প্রণয়ের দ্বারা মন্ডিত প্রিয়াগণ পরিবৃত, ত্রিভূবনের লোকের মন হরণ করতে পারে এমনতর বংশীধ্বনি-পরায়ণ এবং যার বেশী এমন কি সমানও দেখা যায় না এমন শ্রীসৌন্দর্যে যিনি চরাচরের বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। নায়কের মতো নায়িকাপক্ষে স্বকীয়া এবং পরকীয়া (কন্যাকা ও পরোঢ়া) বিভেদ দেখিয়ে শ্রীরূপ প্রেমসাধনায় আত্মসমর্পিত ও দলসহ সাধনায় নিরত যূথেশ্বরীদের ভেদ দেখিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা এই আটটি কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়ার পরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, লৌকিক অলংকার শাস্ত্রে এসবের থাকার কথাও নয়, আর নেইও। এছাড়া কৃষ্ণের মতন রাধারও সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা, ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা, নববয়া, উজ্জ্বলস্মিতা, নর্মপন্ডিতা, করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা প্রভৃতি সাতাশটি আদর্শ গুণের বর্ণনাও নায়িকাপক্ষে লৌকিক রসশাস্ত্রীরা দেন নি।

নায়িকার মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা এবং প্রত্যেকটির আবার ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা বিভাগ শ্রীরূপ লৌকিক অলংকার শাস্ত্রের রীতিতেই নিবদ্ধ করেছেন এবং

তাঁর নায়িকার আটপ্রকার অবস্থা-বিভাগ – অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খন্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা – প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র থেকেই গৃহীত। নায়কের আটটি সাত্ত্বিক গুণের মতই নায়িকাদের অলংকার, যেমন – ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, ঔদার্য, ধৈর্য্য, প্রগল্‌ভতা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, ললিত, কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত প্রভৃতি যদিচ লৌকিক অলংকারশাস্ত্রের থেকে সমাহৃত, কিন্তু যুথেশ্বরীভেদ, দূতীবৈচিত্র্য, নায়িকার স্বয়ংদৌত্যের বিভিন্নরূপ এবং বিশেষে সখীর চরিত্র ও কার্যের বিচিত্র বিবরণ শ্রীরূপের প্রতিভার অসামান্য নিদর্শন। নায়িকাদের মুগ্ধা মধ্যা প্রগলভা বিভাগ প্রাচীনোচিত হলেও তাদের মধ্যেকার উত্তমা এবং জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা ভেদ শ্রীরূপের স্বকীয়। ললিতা, বিশাখা, পদ্মা ও শৈব্যা এই চারজন বাদে রাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি আটজন নায়িকা যুথেশ্বরী অর্থাৎ নিজ নিজ গণসহ প্রেম-সাধনায় নিরত। নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে চন্দ্রাবলী এবং তার উপর রাধাই মুখ্যা। কৃষ্ণের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এঁরা অধিকা, সমা, প্রখরা, মৃদু, লঘু, অধিকমধ্যা, লঘুমধ্যা, সমপ্রখরা, সমমৃদু, অধিকমৃদু প্রভৃতি। যূথেশ্বরী বৈষ্ণব ধর্মীয় ব্যাপারের অন্তর্গত। কিন্তু সখী এবং দূতী সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত। প্রচলিত অলংকারগ্রন্থের বর্ণনা থেকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে এদের সূক্ষ্মতর কার্যকারীতা ও শ্রেণীবৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় হয়েছে।

(খ) দূতী ও সখী। লৌকিক অলংকার শাস্ত্রে দূত ও দূতীর তিনটি মাত্র বিভাগ – নিসৃষ্টার্থ মিতার্থ ও সন্দেশহারক। উভয়ের মনোভাব বুঝে নিয়ে যে আপনা থেকে যোগাযোগ করে সে নিসৃষ্টার্থ, মিতার্থভাষী ও কার্যসিদ্ধিকারী হ'ল মিতার্থ এবং যেমন বলা হয় সেই মতো কাজ করে এমন হ'ল সন্দেশহারী। শ্রীরূপ এর উপর নির্ভর ক'রে নামে ও কার্যকারীতায় ভিন্নত্ব এই ভাবে দেখিয়েছেন – (১) অমিতার্থ, ইঙ্গিতের দ্বারা একের মনোভাব বুঝে নিয়ে যে দু'পক্ষকে মেলাতে পারে। (২) নিসৃষ্টার্থ, নায়ক-নায়িকার মধ্যে একজনের কাছে কার্যভার পেয়ে নিজ যুক্তি দ্বারা যে দু'পক্ষকে মেলায়। (৩) যে কোনো পক্ষের সংবাদ মাত্র বহন করে, নিজে কোনো চেষ্টা করে না তাকে পত্রহারী বা সন্দেশহারী বলা হয়েছে। এ ছাড়া নায়িকার আপ্তদূতীত্ব এবং স্বয়ংদূতীত্বের বিষয়ও পর্যালোচনা করেছেন শ্রীরূপ। আপ্তদূতী বলেছেন তাকেই যে দূতী কদাচিৎ বিশ্বাসভঙ্গ করে না, নায়িকার উপর স্নেহবর্তী থাকে এবং বাক্য প্রয়োগে নিপুণা হয়। নায়িকার স্বয়ং দৌতের বিষয়টি তিনি নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। বস্তুত এগুলি হ'ল নায়কের প্রতি নায়িকার ইঙ্গিত। যেমন, আঙুল মটকানো, সহসা অঙ্গ আবৃত করা, পায়ের আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে লেখা, প্রসাধন করা, সখীকে আলিঙ্গন, সখীকে তাড়না, অধরদংশন,

অলংকারের শব্দ করা, বাহুমূল দেখানো, তরুতে লতিকা জড়িয়ে দেওয়া, চক্ষু ও দৃষ্টির নানা প্রকারের বিকৃতি এবং কটাক্ষ। প্রাচীনদের রসশাস্ত্রে কোথাও কোথাও এগুলির দু'একটির বিবরণ মাত্র প্রাপ্তব্য। শ্রীরূপ সাহিত্যের বর্ণনা এবং নিজ অভিজ্ঞতা থেকে এসব দৃষ্টান্ত সমাহরণ করেছেন। উল্লেখ্য গোপীরা ছাড়া দূতীর কাজ অন্য কারা নিয়ে থাকেন তার একটা তালিকা ও বিবরণ রূপ গোস্বামী দিয়েছেন – শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, দেয়াসিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী। সখীর প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন সাহিত্যে তথা শাস্ত্রে বৈষ্ণবদের মত এত ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়নি। 'প্রেমলীলা-বিহারাণাং সম্যক্ বিস্তারিকা সখী'। পরকীয়া প্রীতিকে কেন্দ্রে স্থান দেওয়াতেই সখীর গুরুত্ব বৈষ্ণব সাহিত্যে সমধিক হয়েছে। শ্রীরূপের অভিপ্রায় ধ'রে চরিতামৃতকার বলেছেন –

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদিভাবের না হয় গোচর।।
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।।
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী-লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।। ইত্যাদি

(মধ্যলীলা – ৮ম)

পরোঢ়া-পরকীয়াত্বে রাধাকৃষ্ণের মিলনে, বিশেষে বিরহিত অবস্থায়, সখীদের কার্যকারীতা ছাড়া প্রেমনির্বাহের কোনো পথই পাওয়া যায় না, এজন্য গুরুত্ব বাস্তব। গুণ ও চরিত্রের দিক দিয়ে সখীদের নানা বিভাগ কল্পনা করা হয়েছে, যেমন – প্রখরা, মধ্যা, মৃদু; লঘুপ্রখরা, লখুমধ্যা, লঘুমৃদু; সমপ্রখরা, সমমধ্যা, সমমৃদু; অধিকপ্রখরা, অধিকমধ্যা, অধিকমৃদু। এদের মধ্যে আবার কেউ বামা, কেউ দক্ষিণা, কেউ নায়কের প্রতি ক্রুরা, কেউ নায়কে যুক্তিবাদিনী, কেউ নায়িকার মানে অসমর্থকা, কেউ আবার মানশৈথিল্যে কোপনা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, লৌকিক অলংকার শাস্ত্রে যেখানে দাম্পত্য অথবা ভাবী দাম্পত্যের ভূমিকা ছাড়া কিছু বলা হয়নি সেখানে এত বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়নি। সখীদের আবার দূতীর ভূমিকার বিবরণও রয়েছে। তাও বহুবিধ এবং সেখানেও প্রখরা, মধ্যা, মৃদুর বৈচিত্র্য। তাদের নানান্ উপায়ে দৌত্যের বিবরণ শ্রীরূপ সন্নিবেশিত করেছেন। দৌত্য ছাড়া সখীদের প্রচুর কার্যধারার বিবরণও দেওয়া হয়েছে। এসব দেখে মনে হয় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাকে যে রকম মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে বৈষ্ণব আলংকারিক দেখেছেন তা পূর্বে সম্ভবপর ছিল না। সখীদের কার্যের রূপোল্লেখিত তালিকায় দেখা যাচ্ছে – পরস্পরের প্রেমগুণাদির কথন, পরস্পরকে আসক্ত করানো, পরস্পরকে অভিসার করানো, পরিহাস,

আশ্বাস দেওয়া, নেপথ্যবিধান, নায়িকার বা নায়কের দোষ গোপন, নায়িকার পতি ও গুরুজনদের বঞ্চনা, উচিত সময়ে মিলিত করা, নায়ক-নায়িকাকে তিরস্কার – এরকম সতেরোটি কাজ। নায়ক-নায়িকা সম্পর্কে এঁদের কেউ সপক্ষ, কেউ প্রতিপক্ষ, , কেউ সুহৃৎ, কেউ বা তটস্থ। রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার বিরোধী পক্ষের চারিত্র্য ও ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দেওয়ার যৌক্তিকতাও রূপের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। নাটকাদি সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের ভূমিকা থাকা প্রয়োজনীয়। 'জটিলা কুটিলা না থাকলে রসের পোষ্টাই হয় না' এও শ্রীরূপকে বিবেচনা করতে হয়েছে।

(গ) মধুর রতির বৈচিত্র্য। এই অংশের বিন্যাসেই বৈষ্ণব অলংকারশাস্ত্রের মৌলিকতা সবচেয়ে বেশী পরিস্ফূট হয়েছে। ব্রজগোপরমণীদের কৃষ্ণে অনুরক্তি স্বভাবত ঘটে অর্থাৎ তা বহিরঙ্গ কোনো কারণের অপেক্ষা রাখে না, এই বিষয়টি উপস্থাপন ক'রে শ্রীরূপ নায়িকাপক্ষে মধুররতির তিন প্রকারবিশেষ উল্লেখ করেছেন। সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কৃষ্ণের তিন শ্রেণীর নায়িকাকে সামনে রেখে এই বিন্যাস। ভাগবতোক্ত কুব্জা ও পিঙ্গলা কৃষ্ণকে চেয়েছিলেন কামনা বা স্বার্থের বশভূত হয়ে, তাই তাঁদের রতি 'সাধারণী'। দ্বারকার মহিষীদের অনুরক্তির মধ্যে যেমন স্বার্থ কামনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে নিঃস্বার্থতা। তাই তাঁদের রতি 'সমঞ্জসা'। আর পরকীয়া গোপীদের প্রেমে রয়েছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা, তাই তার আখ্যা 'সমর্থা'। ব্রজগোপীদের যাবতীয় উদ্যম কৃষ্ণসুখার্থেই নিয়োজিত হয়।
এই সমর্থা রতির উত্তরোত্তর বিকাশের স্তর নির্ণয়ের মৌলিক কৃতিত্বও শ্রীরূপের। কোনো প্রতিকূল ভাব সমর্থা রতিকে বিচলিত করতে না পারলে বলা যায় 'প্রেম' উদিত হয়েছে। এই 'প্রেম' শব্দটি অবশ্য যাবতীয় বিকাশস্তরের জন্যই আজ জনসাধারণ্যে প্রচলিত একটি সাধারণ শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রূপ আরও বলছেন যে বিনাশের বহু কারণ থাকা সত্ত্বেও যুবক-যুবতীর যে ভাববন্ধন বিনষ্ট হয় না, তাকেই 'প্রেম' বলে। এই প্রেমের প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ বিভাগ ধ'রে আলংকারিক বলছেন, নায়িকার চিত্তবৃত্তি নানা বাধায় অজ্ঞাত থাকার জন্য নায়কের যে ক্লেশদায়ক অবস্থা তাকে 'প্রৌঢ়' বলা যায়। যে প্রেম অন্য নায়িকার অস্তিত্ব সহ্য ক'রে চলে তা 'মধ্য', আর যে প্রেম অন্য প্রেমিকাকে উপেক্ষা অথবা অপেক্ষা কিছুই করে না, আবার কোনো কোনো সময়ে বিস্মৃত হয়ে পড়ে, তা 'মন্দ'।

এই প্রেম বিশেষভাবে উৎকর্ষ লাভ ক'রে যদি চিৎপ্রকর্ষ লাভ করে, সেই সঙ্গে হৃদয়কেও দ্রবীভূত করে এবং সেই সঙ্গে কেবল দর্শন-স্পর্শে তৃপ্তিদায়ক না হয়ে ব্যাকুলতার বৃদ্ধি

ঘটায় তাহলে বলতে হবে যে 'স্নেহ' উদিত হয়েছে। যেমন – চরিতামৃতের বর্ণনায় –

কোটি নেত্র নাহি দিল, সভে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কী দেখিব মুই।।

অথবা গোবিন্দদাসের উপলব্ধিতে –

আধক-আধ -আধদিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শতকোটি -কুসুমশর-জরজর
রহত কি যাত পরাণ।।

অথবা, জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন ন তিরপিত ভেল।

এই 'স্নেহ' পর্যায়ের কৃষ্ণরতির দুই বিভাগ ধরা হয়েছে – ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ। ঘৃতবৎ স্নেহ থেকে মধুবৎ স্নেহই উৎকৃষ্ট। ঘৃতস্নেহ গাঢ় আদরময়, ঘনীভূত। আর স্বভাবে ও তদীয়তাময়, অর্থাৎ 'আমি তোমার' এই বোধযুক্ত। অপরপক্ষে মধুস্নেহ মদীয়তাময় অর্থাৎ 'তুমি আমারই' এই নিশ্চয়বোধযুক্ত, আর সেই সঙ্গে মধুর মত মাদকতাযুক্ত। ঘৃতস্নেহ শৈত্য। মধুস্নেহ উষ্ণতা। প্রথমটি চন্দ্রাবলীর, দ্বিতীয়টি রাধার। ভরতাদির লৌকিক শাস্ত্র থেকে ইঙ্গিত মাত্র নিয়ে রূপ গোস্বামী এগুলি আরও সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত ক'রে তুলেছেন।

স্নেহের উপরের স্তরে 'মান'। পূর্বরাগ স্তরে দেখা যাবে মান নায়িকার অবস্থা বিশেষ মাত্র, এখানকার 'মান' নিগূঢ় প্রেমরসের ব্যাপার। স্নেহের আরও ঘনীভূত ও কুটিলতাময় উৎকর্ষই 'মান'। এর উদাত্ত এবং ললিত এ দুই পার্থক্য দেখানো হয়েছে। উদাত্ত হ'ল দাক্ষিণ্যযুক্ত, ঘৃতস্নেহের সঙ্গে এর সম্বন্ধ, আর বাইরে দাক্ষিণ্য থাকলেও অভ্যন্তরে কুটিল হয়ে একান্ত মধুর হয় যা, তা-ই ললিত। ললিত মান শ্রীরাধার, পান থেকে চূণ খসে যাওয়ার মত হলেও তিনি প্রতিকূল ভাব ধারণ করেন।

মানের উপরে স্থান 'প্রণয়ে'র, কিন্তু কদাচিৎ মানের পূর্বেই 'প্রণয়' নিজ স্থান করে নিতে পারে। প্রণয়ের স্বভাবে রয়েছে বিশ্রব্ধতা, অর্থাৎ একান্ত নির্ভরতা, আর মানের সঙ্গে সম্বন্ধ হ'ল গর্বের। এ দুয়ের একটুতেই এদিক ওদিক হতে পারেন, এজন্য একত্র বলা হয় প্রণয়-মান। প্রণয়ের নির্ভরতা-গুণের জন্য দুই বিভাগ ধরা হয়েছে – মৈত্র ও সখা, সখ্যেই পূর্ণতা। প্রণয়ের উপর স্থিতি 'রাগে'র। যে প্রণয়ে প্রবল দুঃখও মনে সুখরূপে অনুভূত হয় তাকে বলা যেতে পারে 'রাগ'। বিরহে যে দুঃখানুভব হয় তার মধ্যেও

সুখস্পর্শ থাকে ব'লেই গোপীদের কাছে কৃষ্ণপ্রেম অত্যাজ্য। অভিসারের দৈহিক ক্লেশ শ্রীমতীর ক্লেশ ব'লে অনুভবই হয় না। লৌকিক অলংকার শাস্ত্রে পূর্বরাগের বর্ণনায় রাগের নীলিমা ও রক্তিমা ভেদ নির্দেশ ক'রে রক্তিমান কুসুম্ভ এবং মঞ্জিষ্ঠা (অর্থাৎ কাঁচা ও পাকা) বিভেদ দেখানো হয়েছে। শ্রীরূপ এক্ষেত্রে পূর্বতন ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। মঞ্জিষ্ঠা রাগ যা নষ্ট তো হয়ই না, বরং দিনে দিনে উজ্জ্বল হয়, তা-ই রাধার। পদাবলীতে এর উদাহরণ –

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি ন গেল।।

রাগের পর 'অনুরাগ'। যা নিত্যনূতন ভাব ধারণ করে এবং প্রিয়াকে নব নব ভাবে অনুভব করায় সেই রাগ হ'ল অনুরাগ। এই অনুরাগের বাইরের প্রকাশে পরস্পর বশীভূত অবস্থা, মিলনের মধ্যেকার বিচ্ছেদবোধ, তৃণধুলির মধ্যেও জন্মলাভের অভিলাষ প্রভৃতি বিক্রিয়া দেখা যায়। পদাবলীতে যেমন –

নব রে নব নিতুই নব, যখনি হেরি তখনি নব।

অথবা কী পুছসি অনুভব মোয়।
সৌই পিরিতি- অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নৌতন হোয়।।

আলংকারিক বলছেন যে দ্বারকার মহিষীগণের এই অনুরাগ পর্যন্ত প্রণয়-সীমা। এর উপরের অধিকার গোপীদের এবং বিশেষে শ্রীরাধার।

অনুরাগের উপরে 'ভাব'। অনুরাগ যদি যাবতীয় সাত্ত্বিক ও দশ দশা সহ প্রকাশিত হয় এবং রাগের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছায় অর্থাৎ যতদূর আশ্রয় সব একসঙ্গে অনুভব করায়, তাহ'লে 'ভাব' অবস্থা, সমুদিত হয়েছেন মনে করতে হবে। এ ভাব সাধারণ 'ভাব' বা emotion থেকে এবং ভাব-হাব-হেলার ভাব থেকে পৃথক বস্তু। এই পরিণাম একমাত্র ব্রজগোপীর মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

মহাভাব। ঐ 'ভাব'ই শ্রীরাধার ক্ষেত্রে আরও উৎকর্ষ পেয়ে দাঁড়ায় মহাভাবে। মহাভাব অনির্বচনীয় প্রেমবিকার। এতে অমৃততুল্য প্রেমানন্দময়তা এবং নিজ প্রেমঘন স্বরূপের উপলব্ধি। রাধার হলাদময় অলৌকিক সত্তায় পরিণাম। এই মহাভাব রূঢ় এবং অধিরূঢ় ভেদে দুইপ্রকার। অধিরূঢ়ের আবার দুই বিভাগ – মোদন ও মোহন, আর যুগল মিলিতের শেষাবস্থার ভাব 'মাদন'।

রূঢ় মহাভাবে স্তম্ভাদি সব সাত্ত্বিক উদ্দীপ্ত হয়। নিমেষ-অসহিষ্ণুতা দেখা দেয়, অতিদীর্ঘকালকে ক্ষণকাল ব'লে ভ্রম হয়, মিলিত সখ্যেও আর্তি ও আশঙ্কা দেখা দেয় এবং সব কিছু বিস্মরণ হয়ে যায়। এই ভাবাবস্থা দেখে আসন্ন জনতার হৃদয়ও ব্যাকুলিত হয়। বর্ণিত অবস্থা আরও প্রবল হয়ে প্রায় মূর্ছার অবস্থা প্রাপ্ত হ'লে বলা হয় 'অধিরূঢ়'। বলা বাহুল্য, শ্রীরূপ এইসব কল্পনা করেছেন মহাপ্রভুর ভাবাবস্থা থেকে। রাধার অধিরূঢ় মহাভাবের মোদনাবস্থায় যাবতীয় গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের ভয় বিক্ষোভ ঘটে, কান্তাভাবের অত্যন্ত আতিশয্য দেখা দেয়। শ্রীরাধা হ্লাদিনীসারস্বরূপা হয়ে পড়েন। বিচ্ছেদ-দশায় এই মোদনই 'মোহন' আখ্যা লাভ করে। এতে সাত্ত্বিক-সমূহ সু-উদ্দীপ্ত হয়, নায়িকার ঘনঘন ভ্রম হতে থাকে, দিব্যোন্মাদের অবস্থা ঘটে, এর ফলে সকলেই ব্যাকুলিত হয়, পশুপাখীরাও কাঁদে এবং কৃষ্ণ নিজেও মূর্ছা যান। দিব্যোন্মাদের লক্ষণ নির্ণয়ে শ্রীরূপ বলেছেন –

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রামাভা ক্বাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে।।

নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের এই ভাবাবস্থার বিবরণ লিখেছিলেন স্বরূপ দামোদর। কবিরাজ গোস্বামী তার বিষয় শুনে লিখছেন –

উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণস্মরণ
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান।
সোল্লুণ্ঠ বচনরীতি মান গর্ব ব্যাজস্তুতি
কভু নিন্দা, কভু বা সম্মান।।

এই অবস্থায় শ্রীমতী অহরহ মৃত্যু কামনা করতে থাকেন, কারণ মৃত্যুতে দেহ পঞ্চভূতে লীন হ'লে কৃষ্ণসঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অবশ্য পাবেন এই ধারণায়। চিত্রকল্প, প্রজল্প, পরিকল্প ইত্যাদিক্রমে অলংকারশাস্ত্রের রীতি অনুসরণে রূপগোস্বামী রাধার উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপের বিস্তৃত বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে দিয়েছেন।

'মাদন' হ'ল হলাদিনীসার অবস্থা, এই অবস্থায় শ্রীমতীর কৃষ্ণপ্রেম স্নেহ, মান, প্রণয়াদির অবস্থা একসঙ্গে স্পর্শ ক'রে ও সঙ্গে সঙ্গে অতিক্রম ক'রে মহাভাবে গিয়ে পৌঁছায়। এতে মিলিতাবস্থাতেও অন্যের প্রতি ঈর্ষা। মাদনের অদ্ভূতে অবস্থা পূর্ণ মিলনেই অনুভূত হয়। মাদনের সূক্ষ্মগতি স্বয়ং মদনদেবও জানেন না। বস্তুত এরকম দিব্যাবস্থা তর্কের অগোচর এবং অনির্বচনীয়।

(ঘ) শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল স্থায়ীর বিভাগবৈচিত্রঃ পূর্বতন অলংকারশাস্ত্র অনুসরণে শৃঙ্গার মধুরের দুই মূল বিভাগ শ্রীরূপকে গ্রহণ করতে হয়েছে – বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। পূর্বশাস্ত্রে বিপ্রলম্ভের চার বিভাগের মধ্যে তিনটিকে রূপগোস্বামী গ্রহণ করেছেন, আর চতুর্থটির স্থানে

ভিন্ন বিভাগ নির্ধারণ করেছেন। যেমন, লৌকিক অলংকারশাস্ত্রে পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, করুণ। উজ্জ্বলনীলমণির পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, প্রেমবৈচিত্ত্য। করুণ বলতে মৃত্যু ও পুনর্জীবনের অবাস্তবতা রূপ রাখলেন না, তার জায়গায় নিয়ে এলেন মিলনের মধ্যে বিরহবোধের অবস্থাকে। এই রোম্যান্টিক অথচ বাস্তব মর্মানুভবের বিষয়টির উপস্থাপন শ্রীরূপের অসামান্য রসজ্ঞতা ও বিচারবোধের প্রকাশক। এই অনুভবের বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর আক্ষেপানুরাগ এই অহেতুক বিরহবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। নতুবা বৃন্দাবন লীলার মূল তত্ত্বে –

বৃন্দারণ্যে বিরহতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ।
হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোস্তি ন কর্হিচিৎ।।

শ্রীরূপ-কৃত পূর্বরাগ, মান প্রভৃতির বিভাগ-বৈচিত্র্য মোটামুটি লৌকিক শাস্ত্রকে অনুসরণ করেছে। দশটি দশাবিভাগও প্রাচীন রীতির। সম্ভোগ শৃঙ্গারের অর্থাৎ মিলন -পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান্ - এই শব্দগুলি যেমন পূর্বেকার, তেমনি সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা প্রভৃতি শব্দও শ্রীরূপ লৌকিক অলংকার শাস্ত্রের নানা স্থান থেকে সমাহরণ ক'রে নিজ সুবিধা অনুসারে প্রয়োগ করেছেন।

মিলনের সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্ বিভাগ যৌক্তিক ও সংগত নিঃসন্দেহে। শ্রীরূপের বর্ণনা মতে পূর্বরাগাবস্থা শেষে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, রাগান্তে সংকীর্ণ সম্ভোগ, নিকট প্রবাসের পর সম্পন্ন সম্ভোগ এবং সুদূর প্রবাসের পর যাবতীয় উপাচারসহ পূর্ণ সংগম। সংক্ষিপ্তে চকিত দেহস্পর্শ অধরস্পর্শ মাত্র, মানান্তে মানের স্মৃতি থাকায় বিক্ষুব্ধতা-মিশ্রিত মিলন সংকীর্ণ, লজ্জা ভয় সংযুক্ত পূর্ণ মিলন সম্পন্ন, আর দ্বিধা সংকোচ বিমুক্ত অবস্থায় নির্ভর আত্মসমর্পণমূলক মিলন সমৃদ্ধিমান্। দানলীলা, নৌকা-লীলা, বাঁশীচুরি, রহস্যপূর্ণ বিতর্ক প্রভৃতির মধ্যে সংক্ষিপ্ত ও ক্বচিৎ সংকীর্ণ মিলন; কৃষ্ণ কর্তৃক পথরোধ, রাসক্রীড়া, জলকেলি প্রভৃতিতেও তাই।

প্রকৃত মিলন নয় এমন স্বপ্নে এবং ভাবে মিলনকেও বৈষ্ণব রসিক প্রকৃত মিলনের মূল্যে গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁদের উপলব্ধিতে এও বাস্তব মিলনের তুল্যমূল্য। এ দুয়ের আশ্রয়েও উক্ত সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণাদি প্রভেদ দেখা যাবে। এ দুয়ের মধ্যে জাগরিত অবস্থায় ভাবসম্মিলনই অদ্ভূত। যেমন বিদ্যাপতির বর্ণনায় –

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ

পেখলুঁ পিয়-মুখ-চন্দা। ইত্যাদি

সাধারণভাবে অলংকার-গ্রন্থে শব্দ অর্থ ধ্বনি ব্যঞ্জনা রস অলংকার প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা থাকে, যাতে সামগ্রিকভাবে সব দিকই বিচার করা হয়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিক মানদন্ড যাঁরা স্থির করতে চেয়েছেন, অর্থাৎ প্রস্থান প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, তাঁরা নিজ নিজ বক্তব্যই যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহকারে উপস্থাপিত করেছেন, পঠন-পাঠনের যোগ্য টেক্স্ট্ বই লিখতে যান নি। রূপ গোস্বামীকেও এইভাবে ভক্তিরস-প্রস্তানের প্রবর্তক বলেই গ্রহণ করতে হবে। তিনি দেখিয়েছেন যে ভক্তি ধর্মীয় ব্যাপার হ'লেও ভক্তিরস লৌকিক রসধ্বনির আশ্রয়েই বিবেচিত হবার যোগ্য, অথচ ভক্তিরসের সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা লৌকিক ভাবরসের ব্যাপার থেকে অনেক বেশি, এমন কি অনন্তও বলা চলে।

ডঃ দাসের জন্ম বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে, বঙ্গীয় সন ১৩২৩-এর ২৩ আশ্বিন (খ্রীঃ ১৯১৬, ৯ অক্টোবর)। তিনি প্রয়াত হন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ২০০২ সালের ২৮ এপ্রিল। পিতা সতীশচন্দ্র, মাতা কামিনীবালা। গ্রামের মধ্য-ইং বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে বাঁকুড়া জিলা স্কুলে চার বৎসর অধ্যয়ন করেন। ঐ সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যের আদ্য, ও পুরাণ পরিষদের মধ্য পাস করেন। সেখান থেকে ১৯৩৩ খ্রীঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে বাঁকুড়া মিশনারী কলেজে ইন্টার ও বি এ পড়েন। ১৯৩৭-এ সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় হন ও কাব্য-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষা পাস করেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্লা প'ড়ে ১৯৩৯ খ্রীঃ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্ণপদক সহ পাঁচটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক পান।বাংলা এম এ ডিগ্রী অর্জনের পাশাপাশি সংস্কৃতে কাব্যতীর্থ ও কাব্যরত্ন পরীক্ষায় পাস। অপরিসীম দারিদ্রোর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে এঁকে ছাত্রজীবন কাটাতে হয়।

এম-এ পাস করার পর বি-টি পাস ক'রে ইনি প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শকের কাজ নিয়ে কাল্না ও খানাকুলে বৎসর খানেক কাটিয়ে এবং ক'লকাতায় দু' একটি স্কুলে শিক্ষকতা ক'রে স্কটিশ চার্চ কলেজে দু' মাস, সিটি কমার্সে চার-পাঁচ মাস এবং উইমেন্স্ কলেজে তিন বৎসর মত অধ্যাপনা করেন। এরপর শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রথম -নমিনেশন পেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন ১৯৪৫-এর জুলাইয়ে। প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর সহকারী হয়ে দশ বৎসর কাজ ক'রে (মাঝে দেড় মাস কোচবিহার কলেজ) ১৯৫৫ আগষ্ট মাসে প্রধান অধ্যাপক হিসাবে কৃষ্ণনগর কলেজে বদ্লি হন ।সেখান থেকে ১৯৫৯-১৯৭৩ পর্যন্ত মৌলানা আজাদ কলেজে এবং ছ'মাসের জন্য হুগলী কলেজে কাজ করেন।তারপর ১৯৭৩ ১লা সেপ্টেম্বর ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে ।সেই পদে প্রায় সাড়ে সাত বৎসর কাজ করার পর অবসর নেন। অবসর নেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ তাঁকে তুলনামূলক অভিধান রচনার দায়িত্ব দেয়।কঠিন পরিশ্রম করে ও বয়সের বাধা অতিক্রম করে ১৯৯৬ সালে তিনি সেই অভিধান রচনা সমাপ্ত করেন।কেন সেই অভিধান আজও আলোর মুখ দেখল না সেটাই প্রশ্ন রয়ে গেল। আজ ডঃ দাস নেই। কিন্তু তাঁর অভিধানের কাজ সেই পান্ডুলিপি নিশ্চয়ই সরকারি কোনও স্থানে হেফাজৎ আছে।আমরা আশাবাদী। আগামী দিনে হয়তো কোনও উদার, মহানুভব, চিন্তাশীল, ডঃ দাসের কাজটা যাতে আলোর মুখ দেখতে পায় তার ব্যবস্থা করতে পারবেন। ইনি

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট সদস্য, বাংলা আকাদেমির কার্যনির্বাহী সদস্য, সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ও অনেক কলেজ ও স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ।এ'র লেখা গ্রন্থসমূহ হ'ল,যথাক্রমে (১)রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় (২)বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি (৩)চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী (৪) বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ (৫)সমাজঃ প্রগতিঃ রবীন্দ্রনাথ (৬) সম্পাদনা- কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (৭)রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার। (৮)বানান বানানোর বন্দরে (৯)১৪০০ সাল ও চলমান রবি (১০)দেশ কাল সাহিত্য (১১)বাঙলা সাহিত্যের আদ্য মধ্য (১২) ব্যাকরণ (তিন খণ্ড) (১৩) সাঁওতালী বাঙলা সম শব্দ অভিধান (১৪)বাছাই প্রবন্ধ এ-ছাড়া রয়েছে নানান্ পত্রিকায় ছড়ানো অগণিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ।'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থের জন্য ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক দাসকে বাঙ্লা সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রদত্ত ডি-লিট্ উপাধি দ্বারা (১৯৬২) সম্মানিত করেছেন। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত বৈষ্ণব রস প্রকাশ গ্রন্থটির জন্য 'প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার' (শ্রেষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থের জন্য ১৯৭৩ সালে),গদ্য সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮৪ সালে 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার', ১৯৮৭ সালে হওড়া পণ্ডিত সমাজ প্রদত্ত 'সাহিত্য রত্ন' উপাধি, ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী বসু' স্বর্ণপদক, ১৯৯১ সালে কলকাতা টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রদত্ত 'রবীন্দ্র তত্ত্বচার্য' উপাধি, চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি গ্রন্থটির জন্য তিনি 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' পান ১৯৯৪ সালে, ১৯৯৫ সালে পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার', ১৯৯৮ সালে পান সংস্কৃত কলেজ প্রদত্ত 'রবিতীর্থংকর' উপাধি।

Initiative By

All the content here is the property of Professor Khudiram Das' Family and hence any use of the contents without the prior permission, shall and will be of legal consequences.

Designed By

azways

http://azways.in/

Email: info@professorkhudiraamdas.com

Call: 9831895614

Web: http://professorkhudiramdas.com/